সাধক কুঞ্জলাল।

(ছাত্রগণ কর্তৃক গৃহীত ফটো হইতে)

মধুকৃপা

বা

জীবন-যজ্ঞ।

৺কুঞ্জলাল গুপ্ত প্রণীত

(রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান সংস্কৃত-শিক্ষক
ও রাজসাহী কলেজের সংস্কৃত-অধ্যাপক)

প্রকাশক—

চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং

১৫ কলেজস্কয়ার,

কলিকাতা।

১৩১৯

~~মূল্য এক টাকা বার আনা।~~

মা

নিবেদন

প্রায় তিন বৎসর পর মধু-কৃপা প্রকাশিত হইল। এই দীর্ঘকাল বিলম্ব হওয়ায় অনেকেই এই গ্রন্থ প্রকাশ হওয়া সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছেন; কেহ কেহ হয় ত অন্য প্রকার জল্পনা কল্পনা করিতেছেন। কিন্তু ভরসা করি কাহারও ধৈর্য্যচ্যুতি হয় নাই; আশা করি পণ্ডিতমহাশয়ের পুণ্যবাণী—"মায়ের নাম প্রচারিত হউক"—এখনও তাঁহাদের হৃদয়তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠে এবং মাঝে মাঝে তাঁহাদের নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিয়া দেয়। আজ মধু-কৃপা তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল; আশা করি সকলেই সরল মনে পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন ও ইহার প্রচারকার্য্যে যত্নবান থাকিবেন।

গ্রন্থে যে সকল ভ্রম পরিদৃষ্ট হইবে, তাহা প্রধানতঃ মুদ্রাঙ্কণ-প্রমাদ-জনিত ও স্থানে স্থানে পাণ্ডুলিপির অস্পষ্টতাহেতু। পাঠকবর্গের নিকট আমরা এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

পরিশেষে রাজসাহী কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রায় কুমুদিনী-কান্ত বন্দোপাধ্যায় বাহাদুর, এম্, এ, মহোদয়কে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহার উৎসাহেই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। পাবনা, রাজসাহী, রংপুর, কলিকাতা, মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থান হইতে বালক বালিকাগণ, ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণের এবং পণ্ডিতমহাশয়ের ছাত্রগণের এই গ্রন্থপ্রকাশ-কার্য্যে আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া আমরা

সবিশেষ উৎসাহিত হইয়াছি। আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বাগছী, বি, এ, বি, টি মহাশয় গ্রন্থের প্রথমাংশের প্রুফ্ সংশোধন করিয়াছেন; তাঁহাকেও আমাদের ধন্যবাদ জানাইতেছি। আজীবন সাহিত্যসেবী, কর্ম্মবীর, মনস্বী, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চৌধুরী, বি, এ মহাশয় তাঁহার দুর্ব্বহ বার্দ্ধক্যদশাতেও আনন্দের সহিত ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন; তাঁহার নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিলাম।

আশা করি মধু-কৃপা হিন্দুর গৌরবের সামগ্রী হইবে। দেশবাসী মাতৃসাধনায় সঞ্জীবিত হইলে ও "মধু-কুঞ্জে" আনন্দানুভব করিলে গ্রন্থ-প্রকাশ সার্থক বোধ করিব। বিনীত নিবেদন ইতি।

ঢাকা—

৭ই কার্ত্তিক, ত্রয়োদশী।

বঙ্গাব্দ ১৩১৯।

ভূমিকা।

পুস্তকে ভূমিকা লিখিবার প্রথা এদেশে আধুনিক, পাশ্চাত্য প্রণালী হইতে গৃহীত। সংস্কৃত কোন কোন গ্রন্থে "বস্তু-নির্দ্দেশ" আছে; কিন্তু তাহা মূলগ্রন্থ হইতে বিচ্ছিন্ন নহে, তাহা লইয়াই গ্রন্থের আরম্ভ। বঙ্গভাষার প্রাণ সংস্কৃতে প্রতিষ্ঠিত হইলেও বাঙ্গালী-সাহেবের মত তাহার বাহ্য পরিচ্ছদ অনেকটা প্রতীচ্য জাতিদের অনুকরণেই গঠিত; তাই বাঙ্গালা গ্রন্থের ভূমিকা লেখা একটা রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যে স্বর্গীয় মহাত্মা "মধু-কৃপা" লিখিয়াছেন, তাঁহার অনেক অনুরক্ত ভক্তের ইচ্ছা, আমি এই অপূর্ব্ব-গ্রন্থের একটি ভূমিকা লিখি। আমি তাঁহাদের অনুরোধ জানিয়া, আমার লেখনীকে পবিত্র করিবার এই সুযোগ পাইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিলাম, এবং ভূমিকা লিখিব বলিয়া তাঁহাদিগকে সম্মতিও জানাইলাম; কিন্তু লেখনী লইয়া ভূমিকা লিখিতে বসিয়াই চক্ষু-স্থির! যে গ্রন্থের আদ্যন্ত মনোযোগ সহকারে দুই চারি বার পাঠ করা যায়, তাহারই যথাযথরূপ একটা ভূমিকা লেখা সম্ভবপর; কিন্তু যাহার কিছুই জানিলাম না, তাহার ভূমিকা লিখি কিরূপে? যখন অঙ্গীকার করিয়াছি, তখন একটা কিছু হাতে লইয়া দাঁড়াইতেই হইবে; কিন্তু এখন দেখিতেছি, কুঞ্জবাবুর শেষ জীবন এবং তাঁহার লিখিত "মধু-কৃপা" এক দিকে যেমন অপূর্ব্ব, অন্য দিকে তাঁহার গ্রন্থ না দেখিয়া তাহার ভূমিকা লেখা, ইহাও একরূপ অপূর্ব্বই বটে।

পণ্ডিত কুঞ্জলাল গুপ্ত সাধারণতঃ "কুঞ্জ পণ্ডিত" বলিয়াই অভিহিত হইতেন। তিনি শিক্ষা-কার্য্যে সুদক্ষ, কর্ত্তৃপক্ষের মনঃপূত, ছাত্র-মহলে সমাদৃত, বুদ্ধিমান, কর্ত্তব্য-পরায়ণ, নিরপেক্ষ, অনলস, নিরীহ, সুরসিক, ব্যঙ্গোক্তিপটু এবং ধর্ম্মভীরু বলিয়া পরিচিত ছিলেন। আর দশ জন পরিচিত ভদ্রলোককে যে ভাবে জানি, তাঁহাকেও সেই ভাবেই জানিতাম; তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকা যে আমাকেই লিখিতে হইবে, ইহা স্বপ্নেও ভাবি নাই; সুতরাং তাঁহার জীবনের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ জানিবার একটা চেষ্টাও করি নাই। যদি তাহা করিতাম, তাহা হইলে আজ তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকা লিখিতে বসিয়া এ বিপদে পড়িতে হইত না।

বাঙ্গালা ১৩১১ সালের আষাঢ় মাসে একদিন বৈকালে বারান্দায় বসিয়া সংবাদ পত্র পড়িতেছি, এমন সময়ে হঠাৎ দেখি কুঞ্জবাবু উপস্থিত। আর কখনও তিনি আমার নিকট এভাবে যান নাই; সুতরাং ব্যস্তভাবে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হাসিয়া বলিলেন, "আপনার সঙ্গে একটুকু আলাপ করিতে আসিয়াছি। কাহারও সঙ্গে আলাপ করিয়া সুখ পাইনা, তাই আপনার কাছে আসিলাম।"

নির্জ্জনতার জন্য উভয়ে ঘরে যাইয়া বসিলে তিনি কথা আরম্ভ করিলেন। প্রথমেই মধুর কথা। তাঁহার গ্রামে মধু নামে ইতর জাতীয় একটি লোক ছিল; লোকে তাহাকে পাগল বলিয়াই জানিত। সে যেখানে সেখানে থাকিত, যাহার তাহার ঘরে খাইত। মধু অত্যন্ত মিতভাষী ছিল; যে দুই চারিটা কথা সে বলিত, তাহা হেঁয়ালীর মত বোধ হইত; সকলে সহজে তাহার অর্থ বুঝিতে পারিত না। কুঞ্জ বাবুর সঙ্গে তাহার একটুকু বিশেষ ভালবাসা ছিল। তিনি বাড়ী

গেলে প্রায়ই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিত, আলাপ করিত; তিনিও তাহার কথার অর্থ সহজে বুঝিতে পারিতেন। তিনি প্রায়ই মধুকে যত্ন করিয়া খাইতে দিতেন; মধুও তাঁহার বাড়ীতে খাইয়া যেন বিলক্ষণ তৃপ্তি লাভ করিত। এই ভাবে উভয়ের মধ্যে ক্রমে একটা আকর্ষণ, একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যেন জন্মিয়া যায়।

কিছুদিন হইল মধু দেহত্যাগ করিয়াছে; কিন্তু কুঞ্জবাবুকে ত্যাগ করে নাই। তিনি নানা ভাবে তাহার সত্তা অনুভব করেন,—কখনও তাহাকে দেখেন, কখনও তাহার কথা শুনেন। এখন তিনি তাহার উপদেশ মতেই চলিতেছেন, প্রতি পদে তাহার কথার সত্যতা অনুভব করিতেছেন।

এ পর্য্যন্ত তিনি সাধন-ভজন কিছুই করেন নাই। ধর্ম্ম শাস্ত্রের মধ্যে গীতাখানিই পড়িয়াছেন, এবং হরিনামটিই তাঁহার কাছে ভাল লাগিত। তাঁহার পিতা মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে বলিতেন যে, শক্তি-উপাসনাই তাঁহাদের কৌলিক ধর্ম্ম, উহা ত্যাগ করা উচিত নহে, এই মাত্র; কিন্তু তিনি সেই এক ভাবেই চলিতেছিলেন; পিতার কথাতে ও তাঁহার ব্যবহারে কোন পার্থক্য ঘটে নাই।

বাঙ্গালা ১৩১৪ সালের শেষ ভাগে, বোধ হয় মধুর উপদেশ ক্রমেই, তিনি নির্জ্জনে উপবেশন করিয়া ধ্যান ধারণা প্রভৃতি অভ্যাস করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া তিনি বহির্ব্বাটীতে আশ্রয় লইলেন,—যেখানে আসন, সেইখানেই শয্যা। চিরবিচ্ছেদের এই আরম্ভে পতিগতপ্রাণা সহধর্ম্মিনীর প্রেম-রজ্জু ছিন্ন করিতে তাঁহাকে বড়ই বেগ পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি নির্দ্দয় ব্যবহার করেন নাই; মধুর সান্ত্বনাবাক্যে পত্নীকে প্রবোধ দিয়া, সংসারের অসারতা এবং আত্মার চিরস্থায়িত্ব ও আত্মোন্নতির শ্রেষ্ঠতা তাঁহাকে বুঝাইয়া,

এবং তাঁহার ভরণ পোষণ ও সন্তানদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তিনি দৈহিক সম্বন্ধ ত্যাগ করিলেন ; কিন্তু পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর ন্যায় নির্লিপ্ত থাকিয়া সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্যই করিতে লাগিলেন।

সাধন-রাজ্যে প্রবেশ করিয়াই প্রত্যহ তিনি নূতন নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিতে লাগিলেন ; প্রত্যহ যোগ-শাস্ত্রোক্ত দুর্ব্বোধ্য নূতন নূতন সত্য তাঁহার নিকট প্রত্যক্ষ হইতে লাগিল। একদিকে মধুর কৃপা, অন্যদিকে বোধ হয় জন্মান্তর-সঞ্চিত যোগ-সম্পদ্, উভয়ের সম্মিলিত প্রভাবে তাঁহার সৌভাগ্যের দ্বার খুলিয়া গেল ; তিনি তিন মাসের মধ্যে যতদূর অগ্রসর হইলেন, যাহা লাভ করিলেন, এবং যাহা আর একটি জন্মের অপেক্ষায় অবশিষ্ট রহিল বলিয়া জানিতে পারিলেন, তাহার জন্য সাধকদিগকে জন্মজন্মান্তর ব্যাপিয়া কত খাটিতে হয়! সাধনের আরম্ভ হইতে বোধ হয় জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের সমস্ত ঘটনা তিনি তাঁহার "মধু-কৃপায়" দৈনন্দিন আকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; এবং প্রত্যেক ঘটনা, প্রত্যেক অভিজ্ঞতার প্রমাণ, বেদও উপনিষদ হইতে সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি এক একটি ঘটনার গল্প করিয়া আমাকে বলিয়াছেন, "এ সমস্তই আমি লিপিবদ্ধ করিয়াছি" ; সুতরাং পাঠক মূলগ্রন্থেই সে সমস্ত অবগত হইবেন।

একদিন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, মধু কৌল কি না? "জড়োন্মত্তপিশাচবৎ", "নানারূপধরাঃ কৌলা বিচরন্তি মহীতলে", ইত্যাদি কৌলের যে সকল লক্ষণ বর্ণিত আছে, তাহাতে মধুকে কৌল ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? সে যে প্রকৃত—সিদ্ধ কৌল, কুঞ্জবাবুর জীবনে সে তাহার প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছে। গুপ্ত কৌল কৃপা করিয়া ব্যক্তিবিশেষকে ধরা না দিলে তাঁহাকে ধরা ত অসম্ভব

বটেই, ব্যক্ত কৌলকে ধরাও সহজ নহে। জড়, কি উন্মত্ত, কি কৌল, কৌলসম্বন্ধে প্রাকৃত লোকের মনে, এরূপ একটা সন্দেহ চিরদিন থাকিয়াই যায়। আর এক দিন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কুণ্ডলিনী শক্তি কি, এবং ঐ শক্তির জাগরণেরই বা অর্থ কি? আমি তাঁহাকে বলিলাম, "সূক্ষ্মাং" "কোটিসৌদামিনীভাসাং" প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত বর্ণনাই বলা যাইতে পারে; কিন্তু যাহার দেহে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগিয়াছেন, কেবল সেই এ বর্ণনা বুঝিতে সমর্থ, অন্যে নহে। তিনি যে জ্যোতিঃ চক্ষুঃ মুদিয়া দর্শন করিতেছেন, অথচ অন্যের নিকট তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না; যাহার প্রভাবে তাঁহার সমস্ত অন্তর-রাজ্য আলোকিত হইয়াছে; যাহার দীপ্তি-সাহায্যে তিনি আপনার হৃদয়ে শ্রীশ্রীকালীমাতার চরণ-পদ্ম এবং কৃপাকারী মধুর মূর্ত্তি নিয়ত দর্শন করিতেছেন, তাহাই কুণ্ডলিনী শক্তি; আর এই শক্তির প্রত্যক্ষী-ভাবই তাহার জাগরণ।

কুঞ্জবাবুর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের সঙ্গে এইরূপ বালকোচিত সরলতা সম্মিলিত হইয়া তাঁহার চরিত্রকে বড়ই মধুর করিয়াছিল। প্রথমে তিনি কিছুই গোপন করেন নাই; যখন যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তখনই তাহা অবাধে সকলের নিকট বলিয়া বেড়াইয়াছেন। অবশেষে যখন মধুর কাছে শুনিলেন যে শীঘ্রই তাঁহাকে দেহ ত্যাগ করিতে হইবে, তখন তিনি একেবারে চাকুরী পরিত্যাগ করিতেই প্রস্তুত হইলেন। কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রায় কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন; তাঁহার পরামর্শে আপাততঃ তিন মাসের বিদায় গ্রহণ করাই স্থির হইল। বলা বাহুল্য, এই বিদায়ই তাঁহার চির বিদায় হইল।

কুঞ্জবাবুর এসকল কথা সহরের সকলেই শুনিয়াছিল; কিন্তু যখন

শুনা গেল তিনি চাকুরী ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তখন লোকে অবাক্ হইয়া গেল। কি সর্ব্বনাশ! বাঙ্গালী জীবনের চাকুরী! মস্তিষ্ক বিকৃত না হইলে ইহা কেহ ইচ্ছা করিয়া ছাড়ে? একজন বিশিষ্ট ভদ্র লোক একদিন কুঞ্জবাবুকে রাস্তায় পাইয়া বলিলেন, "মহাশয়, আপনাকে একজন ভাল লোক বলিয়া জানিতাম; কিন্তু আপনার বর্ত্তমান অবস্থা জানিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম।" তিনি এ কথার কি উত্তর দিবেন, খুঁজিয়া পাইলেন না।

হাসিতে হাসিতে আমার নিকট এই গল্পটি করিলে আমি তাঁহাকে বলিলাম, সাধন-ভজনের কথা গোপন রাখিবার উপদেশ তন্ত্রে এবং যোগ-শাস্ত্রে প্রায় প্রত্যেক কথায় রহিয়াছে। বৈষ্ণব-শাস্ত্রেও বলে, "আপন ভজন কথা, না বলিবে যথা তথা।" ইহার আর যে কারণই থাকুক, প্রকাশে যে বিঘ্ন ঘটে এবং মনে অশান্তি আনয়ন করে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। তন্ত্র-শাস্ত্রের অনেক স্থানেই আছে, "প্রকাশে সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ বিঘ্নস্তস্য পদে পদে।" ইহার পর তিনি আর এ সকল কথা পূর্ব্বের ন্যায় সকলের কাছে গল্প করিতেন না, কিন্তু পুস্তকে সমস্ত কথা লিখিয়া রাখিতেন।

মায়া-বন্ধনের ভয়ে স্ত্রীপুত্রকে চরম কালে নিকটে রাখিবেন না, ইহা তিনি আগেই স্থির করিয়াছিলেন। পূজার পূর্ব্বে তিনি পরিবার লইয়া বাড়ীতে গেলেন, এবং তথায় জন্মশোধ মাতৃ দর্শন করিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। কলিকাতায় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডাকবিভাগে চাকুরী করিতেন, তাঁহার কাছে অল্পদিন মাত্র থাকিয়া কাশীধাম গমন করেন; তথায় স্বপ্নোপদেশ পাইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসেন এবং বাড়ীতেই কুঞ্জবাবু মায়িক দেহ পরিত্যাগ করেন। শুনিয়াছি, তাঁহার জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

এক দিন তিনি সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন; পরে তাঁহার উপদেশমত নির্দ্দিষ্ট সময়ে দ্বার ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখা গেল, কুঞ্জবাবুর দেহ যোগাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছে, কিন্তু দেহের মালিক চলিয়া গিয়াছে।

মোক্ষলাভের পূর্ব্বে তাঁহাকে আর একবার গর্ভবাস সহ্য করিয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। সে জন্ম কোথায় কি অবস্থায় হইবে, তাহাও বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু অতি গোপনে; সুতরাং তাহা বলিবার অধিকার আমার নাই। তিনি যদি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন, এ কথা সকলেই জানিবেন; আর যদি এ কথা লিপিবদ্ধ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহা সাধারণের অপরিজ্ঞাতই রহিবে।

"মধু-কৃপা" পড়ি নাই, তথাপি ইহাকে "অপূর্ব্ব" বলিয়াছি, সুতরাং এরূপ বলিবার কারণ প্রদর্শন করিতে আমি বাধ্য।

আধ্যাত্মিক সম্পদ বা যোগ-সম্পদের প্রকাশসম্বন্ধে প্রাচ্যে এবং প্রতীচ্যে প্রণালীগত বিভিন্নতা অত্যধিক—পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত। পাশ্চাত্য দেশে কেহ কিছু প্রত্যক্ষ বা অনুভব করিলে তিনি অমনি তাহা লিখিতে বসিয়া যান, যাহার তাহার কাছে বলিয়া বেড়ান, এবং কেহ তাহা অসম্ভব বা অযৌক্তিক বলিলে তর্ক-যুদ্ধে লাগিয়া পড়েন। আপন উক্তির সংস্থাপন করিতেই হইবে, তাহার জন্য যুক্তি বা সমর্থন যেথানেই পাওয়া যাউক। এই প্রণালী সাধনের অন্তরায়। যে তর্ক বিতর্ক এবং আত্মসমর্থনেই ব্যাপৃত থাকে, সে সাধনের অবসর পাইবে কথন? ইহাতে মনোবৃত্তি বহির্ম্মুখীন হইয়া পড়ে; সাধনে সিদ্ধির জন্য যে অন্তর্ম্মুখীনতার প্রয়োজন, তাহা থাকে না।

প্রাচ্যদেশে, বিশেষতঃ ভারতীয় আর্য্যদিগের মধ্যে এ প্রণালী সম্পূর্ণ বিপরীত। এথানকার রীতি,—সাধন-লব্ধ সম্পদ ভক্ত, বিশ্বাসী

বা শিষ্য ব্যতীত অন্যের নিকট প্রকাশ করিবে না। উপদেশ সম্বন্ধেও এই কথা; যে শ্রদ্ধার সহিত উপদেশ গ্রহণ না করিয়া যুক্তি তর্কের অবতারণা করিবে, তেমন অভক্ত বা অশিষ্যকে তত্ত্বোপদেশ দিবে না। এই কারণেই ভারতের অধ্যাত্ম বিদ্যা অতি গুহ্য।

এই গুহ্য বিদ্যা প্রধানতঃ উপদেশাত্মক। কিরূপ অভ্যাস করিলে কি প্রকার শক্তি লাভ হয়, ইহাই যোগ-শাস্ত্রের উপদেশ; কিরূপ ক্রিয়া করিলে কি প্রকার ফল পাওয়া যায়, ইহাই তন্ত্র-শাস্ত্রের অনু-শাসন। এই অভ্যাস এবং ক্রিয়া লইয়া উপদেষ্টা এবং উপদিষ্ট উভয়েই ব্যস্ত, কিন্তু তাহার ফল বা সিদ্ধি লইয়া কাহারও ব্যস্ততা নাই। ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্যই অন্নের প্রয়োজন, অন্নের জন্যই জল, তণ্ডুল ও ইন্ধনাদির আয়োজন। যতক্ষণ ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় নাই, ততক্ষণই পাকের উদ্যোগে দৌড়াদৌড়ি; কিন্তু যখন ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি হইয়া যায়, তখন আর কে দৌড়াদৌড়ি করে? সাধনেও এই রূপ। সিদ্ধি-লাভ না হওয়া পর্য্যন্তই যত উপদেশ, যত অভ্যাস, যত আলোচনা; কিন্তু যখন সিদ্ধি-লাভ হইল, প্রাণের ক্ষুৎপিপাসা মিটিল, তখন আর উপদেশ, অভ্যাস বা আলোচনার প্রয়োজন কি? এই জন্যই আর্য্যদিগের অধ্যাত্ম-শাস্ত্রে সিদ্ধি-লাভের উপায় সম্বন্ধে উপদেশ-পূর্ণ বহু গ্রন্থ আছে, কিন্তু সিদ্ধি-লাভের পরবর্ত্তী ঘটনার বর্ণনাযুক্ত কোন গ্রন্থ নাই। অনেক স্থলে অনেক সিদ্ধ মহাপুরুষের জীবনের অনেক অলৌকিক ঘটনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা প্রসঙ্গা-ধীন মাত্র, সিদ্ধাবস্থার বর্ণনার উদ্দেশ্যে নহে।

কুঞ্জবাবুর জীবনে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য উভয় শিক্ষাই সম্মিলিত হইলেও তিনি দীর্ঘকাল প্রাচ্য সাধন-মার্গে চলেন নাই; বরং প্রতীচ্য প্রথাতেই অনেকটা অভ্যস্ত ছিলেন। পরে যখন নানা কারণের সম-

যেত ফলে হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে সিদ্ধির দ্বার উদঘাটিত হইল, তিনি এক চমৎকার অভিনব রাজ্যে প্রবেশ করিলেন, তখনও তিনি সেই প্রতীচ্য-ভাবের আকর্ষণ ছাড়াইতে পারিলেন না, তাই "মধু-কৃপা"তে তাঁহার সিদ্ধাবস্থার অভিজ্ঞতাগুলিকে লিপিবদ্ধ করিলেন। আর কেহ যাহা করেন নাই, কুঞ্জবাবু তাহাই করিয়াছেন, এই জন্যই তাঁহার গ্রন্থকে "অপূর্ব্ব" বলিয়াছি।

কুঞ্জ বাবুর অবস্থাকে আমি সিদ্ধাবস্থাই বলিতেছি। কুণ্ডলিনী শক্তি জাগিলেই মানুষ সিদ্ধ হইল। সাধারণ লোকে সিদ্ধিকেই মুক্তি মনে করে; কিন্তু তাহা নহে; সিদ্ধি মুক্তির পূর্ব্ববর্ত্তী। ইতি।

কৈলাসহর,
শ্রীহট্ট।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দেবশর্ম্মা।

সূচীপত্র।

মধুষ্কপা।

মা।

বঙ্গবাসী আমার অসিদ্ধজীবনের কথা শুনিয়া তোমার কোন ইষ্টসিদ্ধ হইবে কি? ভাই, হউক না হউক যে ভূমিতে জন্মিয়াছি, যাহার শ্যামল ক্রোড়ে বাল্যে ক্রীড়া করিয়াছি, যাহার অন্নে বর্দ্ধিত হইয়া আজ তৃতীয় দশায় উপস্থিত হইয়াছি, তাহার অধিবাসীদিগকে মনে মনে বড় ভালবাসিয়া আসিয়াছি। দুঃখের বিষয় ভাইকে না শুনাইয়া আর কাহাকে শুনাইয়া সান্ত্বনা পাইব? তোমার প্রয়োজনে না লাগে, আমার এই প্রয়োজন আছে বলিয়াই তোমাকে বলিতেছি। শুনিও এবং সেই অনুসারে কায করিও। আমি যে নিদারুণ দুঃখ পাইলাম, হয়ত তোমরা তাহা পরিহার করিতে পারিবে; এবং মনুষ্য জীবন সার্থক করিতে পারিবে। আমার ক্ষুদ্র জীবন দ্বারা

তোমার কোনরূপ সেবা করিতে পারি নাই, এবং পারিব যে, সে আশাও ফুরাইয়াছে; তাই পূর্ব্বপুরুষগণের পুণ্যফল, দেবানুগ্রহ ও মহতের প্রসাদে যে রত্ন পাইয়াও হারাইলাম, তাহার অন্বেষণের পথ তোমাকে বলিয়া দিয়া যাইতেছি। যদি ধীরের ন্যায় যাইতে পার, অমূল্য রত্ন লাভ হইবে। মনুষ্য জীবন কৃতার্থ হইবে! ভারত-বাসীর তাহা অপেক্ষা উচ্চ আশা আর হইতে পারে না।

রামপ্রসাদ গাইয়াছিলেন,—

"জনমি ভারত ভুমে মা, কি কর্ম্ম করিলাম আমি
আমার একুল ওকুল দুকুল গেল, অকুল পাথারে ভাসি।"

ভাই, যারা ভারতে জন্মে কেবল তাদেরই কর্ম্ম ও ব্রহ্ম এই দুকুল প্রকৃতভাবে আছে; পৃথিবীর আর কোথাও তাহা নাই। ইহার সমন্বয় ভারতের বিশেষত্ব। যে তাহা পারে না, সে অকূল পাথারে ভাসে। এখন এইটী বড় দরকার। আমি সারাজীবন এই সমন্বয় চেষ্টাই করিয়াছিলাম কিন্তু আমার অদৃষ্টে সেই দিব্যমন্দিরের দ্বারে উপস্থিতি মাত্র ঘটিয়াছিল। আমি তাহার অধিষ্ঠাতা জীবনবাঞ্ছিতকে দর্শন করিতে পারি নাই। তোমরা পারিবে এই আশায় আমার দুঃখের কাহিনী বলিতে বসিয়াছি—

পিতামহ মুন্সী মোহনলাল—

পদ্মানদীর দক্ষিণতীরে পূর্ব্ববঙ্গ বেলগাছী ষ্টেসন হইতে দেড় ক্রোশ পশ্চিমে ধনবাড়িয়া নামে একখানি গ্রাম আছে। এই স্থান আমাদের আদিনিবাস। ইহা বৈদ্যজাতির ২৭ সমাজের অন্তর্গত ছিল। এখন আর এ গ্রামে হিন্দুজাতির বসতি নাই। কতকাল

হইতে হিন্দুবসতি বিলুপ্ত হইয়াছে ও কেন হইয়াছে, তাহা জানিবার উপায় নাই। একটীমাত্র হিন্দুর ভিঁটা আজিও পড়িয়া আছে; ইহাকে, জগচ্চন্দ্র দাসের ভিঁটাবলে, জনপ্রবাদ এই যে জগচ্চন্দ্র দাস সিদ্ধ-পুরুষ ছিলেন। আই তাঁহার ভিঁটায় কেহ বাস করিতে পারে না। যেই বসত করিয়াছে, তাহাকে নানা দৈববিপদে পড়িয়া স্থান ত্যাগ করিতে হইয়াছে।

আমাদের বংশে প্রবাদ এই যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ফৌজ-দারের দৌরাত্মে পূর্ব্বনিবাস ত্যাগ করিয়া পদ্মার উত্তর পারে আসিয়া ইন্দ্রজিৎপুর নামক গ্রামে বাস করেন। ইহা পাবনা জেলার অন্ত-র্গত। এই গ্রামে আমার পিতামহ মুন্সী মোহন ইংরাজী ১৭৫৯ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা গঙ্গাপ্রসাদ দাস রংপুরে থাকিতেন। কিন্তু কি করিতেন তাহা জানা যায় না।

তখনকার রংপুর উত্তরভারতের সীমান্তপ্রদেশ। ব্রহ্মরাজ আলোম-প্রায় অধিকার ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। নিকটে ভোটাঙ প্রদেশ ও নেপাল; গোলাযোগ এবং অশান্তি প্রায় সর্ব্বদাই লাগিয়া থাকিত। অশান্তির সময়ে বলবান্ ও বুদ্ধিমান লোকের বিশেষ আদর। দুটাকা উপার্জ্জনেরও খুব সম্ভবনা। তাই বঙ্গদেশের নানাস্থান হইতে হিন্দুমুসলমান বহুলোক রংপুরে চাকরী লাভের আশায় যাইতেন। এবং দুই পাঁচ বৎসরে কিছু সঙ্গতি করিয়া বাড়ী গিয়া বসিতেন।

মোহন লালের যখন ১৩। ১৪ বৎসর বয়স তখন, রংপুরে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই পিতৃব্য ছিলেন। মধ্যম রংপুর জলপাই-গুড়ী অঞ্চলে কি কাজ করিতেন। কনিষ্ঠ বাড়ীতে যে জোতজমি ছিল তাহার আবাদ পত্তন ও সংসারের কাজকর্ম্ম দেখিতেন।

মোহনলালের এ বয়স পর্য্যন্ত লেখাপড়া শিক্ষার আরম্ভ ও হয়নাই। কেন হয় নাই, এ বিষয়ে বাবা যাহা লিখিয়াছেন আমি তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি।—

"দেশে তখন অন্নবস্ত্রের অভাব ছিল না। আর আজকাল আমার বালক পৌত্রদের বুটের আঘাতে আমার বাস্তুভূমিকে পর্য্যন্ত যেমন কম্পিত হইতে হইতেছে, এরূপ বিকট বিলাসিতার ভাব সমাজে সেকালে,—সেকালে কেন, আমাদের বালক কালে ও ছিল না। আমরা ও ১০। ১১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, এখন কার মত বাঁধাবাঁধি রকমে কাপড় পরিতাম না। কিন্তু অলঙ্কারের ব্যবহার বেশ ছিল। আমরাও ঐ বয়স পর্য্যন্ত পায়ে নুপুর, হাতে বালাবাজু, গলায় চাঁদকলি, মোহন মালা ও তক্তি এবং কানে কুণ্ডল ও মোচা এবং কোমরে চাঁদঘুংরি দিয়া খেলাধূলা করিয়া বেড়াইয়াছি।

"আমি আমার বাল্যকালে (৭৫ বৎসর পূর্ব্বে) আমাদের গ্রামে ও নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে মুন্সী মোহনলালের সমবয়স্ক বা কিছু ন্যূনাধিক বয়সের যে সকল ভদ্রলোক দেখিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও কোন ভাষায় উচ্চশিক্ষিত দেখিনাই। মোসলমানের রাজত্বকালে আরবী পারসীই লোকের বিষয়করী বিদ্যা ছিল। কিন্তু আজ কাল ইংরেজ রাজত্বকালে চাকরীর যেমন বাহুল্য ঘটিয়াছে, মোসলমানের সময় তাহা ছিল না। সুতরাং চাকরী সকলের ভাগ্যে ঘটিত না। কাযেই অন্ততঃ পল্লীগ্রামবাসী হিন্দুদিগের মধ্যে, আরবী ও পারসী ভাষার প্রসার খুব কমই ছিল। ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য এই দুই জাতি সংস্কৃত শিক্ষা করিতেন; আমি যাঁহাদিগকে দেখিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প লোক সংস্কৃতে চলনসই শিক্ষাই লাভ করিয়াছিলেন। তখন জমিদারী মহাজনী শিক্ষাই শিক্ষা ছিল; যিনি দলিল দস্তাবেজ

খানা লিখিতে পারিলেন, কাশীদাসী মহাভারত পড়িতে পাড়িলেন, গ্রামের মধ্যে তিনিই একজন লোক। শিক্ষার যখন এই অবস্থা ছিল, তখন নিজবাড়ীতে মায়ের কোলে থাকিয়া মোহনলালের যে কোন শিক্ষা হয় নাই, তাহাতে বিস্ময়ের কথা কিছু নাই।"

পিতার মৃত্যুর পর মোহনলাল মাতার সহিত মাতামহের গৃহে যান। তাঁহার মাতামহ অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার নিবাস সিরাজগঞ্জের অধীন ফুলকোঁচা গ্রামে ছিল। রংপুরেও তাঁহার বাসা ছিল, এখনও তাহা আছে। তাঁহাদের এখনও রংপুর ও পাবনা জেলায় বেশ ভূমিসম্পত্তি আছে।

মোহনলালের মাতা পিত্রালয়েই থাকিতেন। একদিন মোহনলাল তাঁহার মাতামহের শয়নঘরের বারান্দার উপর দিয়া দৌড়াইয়া যাইতেছিলেন, তাঁহার পায়ের শব্দে তাঁহার মাতামহ স্ত্রীকে বলিলেন "দেখত, বারান্দার উপর দিয়া দৈত্যের মত ও যায় কে? তিনি জানিতেন ও কে। তাই বলিলেন, ষাটের বাছা, ও তোমারই দৌহিত্র মোহনলাল। তিনি এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন-উহাকে ডাকত। মাতামহী মোহনলালকে ডাকিলেন। মোহনলালের মাতামহ দেখিলেন,—গৌরবর্ণ, সুগঠিত, বলিষ্ট বালক। বিধবাকন্যার একমাত্র পুত্রকে নিকটে ডাকিয়া সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন, দাদা, তুমি কি পড়? মোহনলাল বলিলেন, আমাকে কেহ লেখা পড়া শিখায় নাই।

তাঁহার মাতামহ সেইবারই তাঁহাকে রংপুরে লইয়া গেলেন। রংপুরের লালাবাগ রেলওয়ে ষ্টেসনের ২মাইল পূর্ব্বে তামকাট নামে একটী স্থান আছে। তামকাট সেকালে সমৃদ্ধ মোসলমানদিগের বাসস্থান ছিল। ইঁহারা সম্ভ্রান্ত মোগলজাতীয়; ইঁহাদের উপাধি মীরজা (আমীরের পুত্র); ইঁহারা যেমন গৌরবর্ণ ও সুন্দর তেমনই

বিদ্বান ছিলেন। ইহাদের অনেকে সঙ্গতিসম্পন্ন ও সঙ্গতশালী ছিলেন। মীরজা কাশিমআলি পারস্যভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। মোহনলালের মাতামহ তাঁহার নিকট মোহনলালকে রাখিয়া আসিলেন।

পিতামহদেব সর্ব্বদা মীরজাদিগের বাড়ীর সীমার মধ্যেই থাকিতেন। এজন্য তাঁহার আহারব্যবহারপরনপরিচ্ছদ মুসলমানের মতই হইয়া গিয়াছিল। বোধহয়, মীরজাদিগের কোন হিন্দু কর্ম্মচারীর বাসায় থাকিয়া তিনি লেখা পড়া শিখিতেন। সতত শিক্ষকের সংসর্গে থাকায় তাঁহার শিক্ষার অনেক সুবিধা হইয়াছিল। তাঁহার স্মৃতিশক্তি ও অসাধারণ ছিল। বৃদ্ধবয়সে যখন তিনি গোয়ালপাড়ায় সদর আমিন ছিলেন, বাসায় গিয়া বিচারের রায় লিখিতেন। কিন্তু নথীবাসায় লইয়া যাইতেন না। আসামদেশের লোকদিগের নামগুলি অদ্ভুত-রকম; কিন্তু তাঁহার সব মনে থাকিত। একদিন কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে "আপনি এ সব নাম কি করিয়া মনে রাখেন?" উত্তরে তিনি বলেন-"মানুষ যাহা একবার দেখে বা শুনে, তাহা কি করিয়া ভুলে তাহা আমি বুঝিনা।" এইরূপ স্মৃতিশক্তি অধ্যবসায় একাগ্রতা ও যত্নের গুণে পারস্যভাষায় তিনি সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। গদ্য ও পদ্য উভয় প্রকার রচনাতেই তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য জন্মিয়াছিল। তিনি পারস্য-ভাষায় আইন ও বিশেষ রূপে শিক্ষা করেন।

মোহনলালের শিক্ষাশেষ হইলে তিনি তামকাটের মীরজাদিগের কোন মোকর্দ্দমা তদ্বির করিবার জন্য কলিকাতায় সুপ্রীমকোর্টে গমন করেন। এই মোকর্দ্দমায় মীরজাদিগের জয় হয়। এজন্য তাঁহারা মোহনলালকে অনেকগুলি জিনিস পারিতোষিক দিয়াছিলেন।

বাবা বলিতেন, মুনসী মোহনলাল মহাপুরুষ। তিনি পিতার প্রশংসা করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন না। অনেকে মনে করিতে পারেন,

আত্মীয়কে সকলেই গুণী মনে করে। পিতার প্রশংসাকরাটা আর বিচিত্র কি ? বাস্তবিক তাহা নহে। পিতৃদেব ভক্তিমান ও পিতৃপরায়ণ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন স্বতঃই বিচারনিষ্ঠ। তিনি অকারণ কাহার ও নিন্দা বা প্রশংসা করিতেন না। পিতৃদেব পিতামহের জীবনের যে সকল ঘটনা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, আমি তাহা হইতে দু'একটী লিখিতেছি ; পাঠকদেখিবেন মোহনলাল প্রকৃতই মহাপুরুষ ছিলেন।

মধুপাগলা যেমন কৃষকের মধ্যে বনফুল, মোহনলাল ও তেমন গৃহস্থের মধ্যে বনফুল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন ধনীর মধ্যে বনফুল, রাজর্ষি জনক তেমন রাজার মধ্যে বনফুল। কোনটী মাঠ আলোকরে, কোনটী রাজোদ্যান আলো করে। কোনটী বনেই ফোটে, বনেই ঝরিয়া যায় ; কিন্তু তাহার সৌরভ বাধা অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া উর্দ্ধেবিসারিত হয় ; কিন্তু বনের বৃক্ষরাজি তাহার কিছুই অনুভব করে না। কদাচিৎ কোন সংসারপথিক হয়ত বনবেলীর সৌরভের ন্যায় সেই প্রাণতর্পণ ঘ্রাণ ঈষৎ অনুভব করে। আবার রাজোদ্যান আলো করিয়াও সেই ফুলই ফুটে ; তখন পথের পথিক রেলিং এর মধ্যে মুখদিয়া ফুলটীকে দেখিয়া, প্রশংসা করিতে করিতে গৃহে গমন করে। ফুল একই ; প্রতিষ্ঠা যে ভিন্ন, সে মালীর ইচ্ছা। পিতৃদেব লিখিয়াছেন—

"মোহনলাল মীরজাদের মোকদ্দমার তদ্বিরের জন্য যখন কলিকাতায় যান তখন ভবানীপুরের কোন ব্রাহ্মণের বাড়ীর এক অংশ ভাড়া লইয়াছিলেন। একদা ব্রাহ্মণ কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করেন। খাইবার সময় মোহনলালকে বাড়ীর তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া যান। ব্রাহ্মণের পরিবারের মধ্যে তরুণী স্ত্রী ও একটী চাকরাণী।

ব্রাহ্মণীর স্বভাব ভাল ছিল না। এই অবসরে তিনি মোহনলালকে প্রলোভিত করিতে নানা চেষ্টা করিলেন। একদিন জলখাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া বারান্দায় খাওয়াইলেন। আর একদিন ঘরের ভিতর জায়গা করিয়াদিলেন। ঠাকুরাণী নিজে জলখাওয়ার আনিয়া দিয়া সামনে বসিলেন, পিতৃদেব দুইটী টাকা রাখিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন, মা, ব্রাহ্মণ বাড়ী নাই আপনার মনে হয়ত ভয় হইয়া থাকিবে। আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। আমার গায়ে যথেষ্ট বল আছে। আমার প্রাণ থাকিতে আপনার কোন অনিষ্ট হইতেদিব না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ব্রাহ্মণ কন্যা সেই হইতে নিরস্ত হইলেন।

আমাদের গ্রামে বালকৃষ্ণ আচার্য্য নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন; তিনি মোহনলালের সমবয়স্ক ছিলেন এবং তাঁহার সহিত প্রায়ই রাজপুর থাকিতেন। আচার্য্য মহাশয়ের ৯০ বৎসরের সময় মৃত্যু হয়। তাঁহার পিতার মৃত্যুকালে পিতৃদেবের বয়স ১০ বৎসর ছিল। পিতৃদেব এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট মোহনলালের যে কোন কথা শুনিয়াছিলেন, তাহাই স্মরণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া যান। এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আশ্চর্য্যপ্রকৃতির লোক ছিলেন; ৫০ বৎসর পূর্ব্বেও তিনি প্রচলিত হিন্দুমতে সন্ধ্যা উপাসনা করিতেন না। তাঁহার পুত্রবধু সন্ধ্যাআহ্নিকের আয়োজন করিয়া তাঁহাকে ডাকিলে, তিনি বলিতেন, মা, আমি বিছানায় বসিযাই সন্ধ্যা করিব, সন্ধ্যা বিছানায় বসিয়াও হয়। বোধ হয়, রাজা রামমোহনের সংসর্গে ঐ সময় হইতে অথবা আরবী ও পারসী ভাষার প্রভাবে সমাজে ধীরে ধীরে স্বাধীন চিন্তা ও বিচার আরম্ভ হইয়াছিল। আমরা দেখিতে পাই, মোহনলাল ও সম্পূর্ণ হিন্দুর আচার অনুষ্ঠান করিতেন না। তিনি জুতা পায় দিয়াও জল খাইতেন, বিছানায় বসিয়া সবেদায়

শরীর ঢাকিয়া ধ্যান করিতেন। একদিন একটী কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত লোক (ভিক্ষুক) মোহনলালের বৈঠকখানার সম্মুখে দাঁড়ায়; পিতামহ ভৃত্যকে একসের চাউল আনিয়া দিতে বলিলেন। ভৃত্য আনিয়া দিল। একজন ব্রাহ্মণ বৈঠকখানায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিলেন মুনসী মহাশয়, ও ব্যক্তি মহাপাপী—উহাকে দান করিলে পূণ্য হয় না, বরং পাপ হয়। মোহনলাল, ইহাতে বলিলেন যদি পুণ্যের জন্য কেহ দান করে, তবে আমার বিশ্বাস, ইহাকে দিলে আপনাকে দেওয়া অপেক্ষা অধিক ফল হয়। ব্রাহ্মণ অপ্রতিভ হইলেন। কথক শ্রীযুক্ত জানকীনাথ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট আমি বৃদ্ধ বালকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয়ের সম্বন্ধে একটী কথা শুনিয়াছি; তাহা আরও বিস্ময়জনক। গোস্বামী মহাশয় এখনও জীবিত আছেন। তিনি আমাদের গ্রামের স্কুলের পণ্ডিত ছিলেন; অনেক কাল আচার্য্য মহাশয়ের বাড়ী ছিলেন। আচার্য্য মহাশয়ের পুত্রবধূ তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। বৃদ্ধআচার্য্য পুত্র, দুর্গাচরণকে বলিতেছেন, দুর্গাচরণ, আমার শ্রাদ্ধে বেশী ব্যয় করিওনা। লোকে ত কত কি দিতে বলিবে; হাতী দেও, ঘোড়া দেও, তুমি তাহা করিওনা। অবস্থানুরূপ ব্যয় করিতে হয়। আর এক কাজ করিও; দেখ, শেষকালে আমার মুখে বোতলের মধ্যে হাতে তেলাপোকা (আরশুলার) ও দিওনা; পদ্মার জল দিও। গঙ্গাজল বোতলে বা তামার বোতলের ন্যায় পাত্রে থাকে। তাহার মুখে সিপি থাকে না। গঙ্গাজলের ব্যবহার প্রায় স্পর্শের জন্য। মৃত্যুকালেই খাইতে দেয়। তাহা ঠাকুর নিষেধ করিলেন,—ও জল দিওনা। রাজা রামমোহন রায় ইংরাজী ১৮০০ সনে রঙ্গপুর ডিগবি সাহেবের কেরাণী হন। পরে দেওয়ান হইয়া ১৮০৩ পর্য্যন্ত রঙ্গপুরে ছিলেন। মোহনলাল ঐ সময়ে জজের আফিসে একজন কর্ম্মচারি

ছিলেন। তিনি বয়সে রামমোহন অপেক্ষা প্রায় ১৫ বৎসরের বড় ছিলেন। মোহনলাল যেমন বিদ্বান সেইরূপ চরিত্রবান ও ধর্ম্মপরায়ন ছিলেন।

রামমোহন তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি বলিতেন, বাঙ্গালদের মধ্যে একলোক মুনসী মোহনলাল। রাজা রামমোহন রায়ের নিকট এরূপ প্রশংসা পাওয়া বড় সামান্য কথা নহে এবং বড় সামান্য গুণে ও লাভ হয় না। মোহনলাল জজের সেরেস্তাদার হন। রঙ্গপুরের জজ এবং উত্তর ভারতের গভর্ণর জেনারেলের এজেণ্ট ডেভিড স্কট সাহেব পিতামহকে বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার জ্ঞান, ধর্ম্মভাব ও সাধুতার জন্য সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। সেকালে যাহারা চাকরী করিত, তাহাদের মধ্যে দুটি দোষ অত্যন্ত প্রবল ছিল; একটী উৎকোচ গ্রহণ, আর একটী দুশ্চরিত্রতা। মোহন লাল এই দুই দোষ হইতে মুক্ত ছিলেন। তিনি যে কাজ করিতেন ঐপদে থাকায় তখন কতকজন লক্ষ লক্ষ অর্জ্জন করিয়াছে, কত ভূসম্প্রত্তি করিয়া গিয়াছে। মোহন লাল সে প্রকৃতির লোক হইলে, সন্তানসন্ততিদিগকে বড় মানুষ করিয়া রাখিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি জানিতেন—মনু না পড়িয়া ও জানিতেন—ত্রিবর্গ ইতিতুদ্দিতিঃ, পরস্পর অবিরুদ্ধ ধর্ম্মার্থ কামই এই ত্রিবর্গই শ্রেয়। কারণ, তাহাই পুরুষার্থ। দেখি, সাধারণ মনুষ্য শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও মূর্খ ও আত্মহিত করেনা। আবার মহাপুরুষেরা শাস্ত্রহীন হইয়াও পণ্ডিত এবং আত্মাহিতানুষ্ঠান করেণ। পিতামহ একরূপ ধনলালসা হীন ছিলেন; তাহা নিম্নলিখিত গল্পে বুঝাযাইবে। মোহনলালের শীতলচন্দ্র দাস নামে একটি বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিল। আমরা তাহাকে দেখিয়াছি। বাবা তাহাকে শীতলমামা

বলিতেন। আমরা তাহাকে শীতলদাদা বলিতাম। তিনি খুব বৃদ্ধ হইয়াছিলেন; তিনি নিজে বলিয়াছেন, যে বুড়াকর্ত্তা রঙ্গপুরের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আসিলে, আমি একদিন তাহাকে জিজ্ঞাস করিয়াছিলাম "আপনি রঙ্গপুরের জজের সেরেস্তাদারি ছিলেন; এপদে থাকিয়া লোক বড়লোক হইয়া থাকে; আপনি কি করিলেন? ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন "শীতল, হাতী বোঝাই করিয়া আমার নিকট টাকা আনিয়াছিল; তাহাতে আমার লোভ হয় নাই। গাড়ী বোঝাই করিয়া আমার নিকট টাকা আনিধাছিল; তাহাতে ও আমার আমার লোভ হয় নাই। তবে নৌকা বোঝাই করিয়া টাকা আনিলে আমার লোভ হইত কিনা, তাহা পরীক্ষা হয় নাই"। তিনি যে নিজে ঘুষ লইতেন না তাহা নহে। তাঁহার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে ওদোষ দেখিলে, তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও দুঃখিত হইতেন। পিতামহ যখন গোয়াল পাড়ায় সদর আমিন ছিলেন, তখন আমার পিতৃব্য তাঁহার মহরে ছিলেন। তাঁহার নামে এক ঘুষের মোকদ্দমা হয়;—পিতা পুত্রকে জেলে দিলেন। তিনি শেষে আপিলে খালাস হন।

একবার তাঁহার মাতুলপুত্র প্যারিমোহন রায়ের চাকরীর উমেদার হইয়া গোয়াল পাড়ায় তাঁহার বাসায় যাইয়া উপস্থিত হন। স্থানিয় লোকেরা মোহনলালকে ভ্রাতার একটী চাকরির জন্য সাহেবকে অনুরোধ করিতে বলেন; তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, আমি কাহারও জন্য অনুরোধ করিবনা, আপনার ক্ষমতা দেখাইয়া কাজ করিতে পারে করুক। 'প্যারিমোহন রায়' মোহনলাল মুনসীর মাতুল পুত্র শুদ্ধ এই পরিচয় দেওয়াতেই সাহেবেরা তাহাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করেন, ইহাতে তিনিও বলিয়াছিলেন এই সব লোকের জন্তই হয়ত আমাকে শেষে কলুষিত হইতে হইবে।

সে কালের ভদ্রলোকেরা প্রায়ই বাড়ীতে পরিবার রাখিয়া বিদেশে যাইতেন। তখন লোকের বাড়ী প্রধান অবলম্বন ছিল। সকলেরই জোত জমি ছিল। বৃদ্ধ মা বাপ স্বগ্রাম ত্যাগ করিয়া বিদেশে যাইতেন না; কাজেই পুত্রবধূপ্রভৃতিকে তাহাদের সেবাশুশ্রূষা ও দেবসেবাদির জন্য বাড়ীতে থাকিতে হইত। এজন্য সেকালের দুশ্চরিত্রতা চাকুরীয়াদিগের একটী প্রধান দোষ ছিল।

একবার মোহনলালের বয়স্যগণ তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য, তাঁহার বিছানায় এক বেশ্যা শোয়াইয়া রাখিয়াছিল। তিনি জানিতে পারিয়া অন্য ঘরে শয়ন করিলেন, এবং প্রাতঃকালে চাকরের দ্বারা বিছানা পত্র ফেলিয়া দিলেন। আর একবার তাঁহারা তাঁহার অজ্ঞাত সারে তাঁহাকে কোন বেশ্যাপ্রাঙ্গণে লইয়া গিয়া বহির্দ্বারে শিকল দেন। মোহনলাল অতিশয় বলবান ছিলেন। তিনি বাঁশের বেড়ার নিকটে একটা পেয়ারাগাছে উঠিয়া লম্ফ দিয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন।

এই সময়ে মোহনলালের চক্ষুর পীড়া হয়; এবং আর কাজ করিতে না পারায় পেনসন লন। ইতি পূর্ব্বে তিনি সগ্রামের সংলগ্ন যাত্রাপুর গ্রামে একটী বাড়ী করেন। উহা উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা ছিল। দক্ষিণে একটী বড় পুষ্করিণী ছিল। রংপুর হইতে আসিয়া তিনি এই বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। ১৮২৪ সনে প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ইংরাজের আসাম দখল হয়। এই সময় ডেভিট্ স্কট সাহেব যাত্রাপুরে যান এবং আসামের বন্দবস্তের জন্য তাঁহাকে গোয়াল পাড়ায় যাইতে অনুরোধ করেন। পিতামহ বলিলেন আমি অন্ধ আমা দ্বারা কি কাজ হইবে। তখন তিনি তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া অস্ত্র চিকিৎসায় চক্ষু আরাম হইলে গোয়ালপাড়ায় লইয়া যান। পিতামহ গোয়াল পাড়ায় সদর আমীন ছিলেন।

অধিক কাল সেখানে ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। আমাদে কেবল জেলা গোয়াল পাড়াতেই চিরস্থায়ী বন্দবস্ত আছে। ঐ বন্দবস্তে সময় স্কট সাহেব মোহনলালকে একটী সম্পত্তি লইতে বলেন; তাহার বর্ত্তমান আয় পঞ্চাশ হাজার টাকা। মোহনলাল লন না। ১৮৩০ সনে তিনি পুনরায় পেনসন লইয়া বাড়ী যান।

মোহনলাল বাড়ী আসিলে আমাদের গ্রামের নিকটবর্ত্তি গ্রামে যে সকল বিদ্বান ও জ্ঞানী ব্যাক্তি ছিলেন,তাঁহারা প্রতিদিন বিকালে তাঁহার বাড়ী আসিতেন। প্রত্যহ রামায়ণ, মহাভারত, কাশীখণ্ড প্রভৃতি ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠ হইত। এবং পাঠের পর সেই বিষয়ের সমালোচনা হইত।

বাড়ী আসিয়া তিনি বৃদ্ধবয়সে লেখাপড়ার চর্চ্চা করিতেন। কেহ লেখাপড়া শিখিতে আসিলে, তাহাকে যত্ন করিয়া শিখাইতেন। তাহার চাকর দিগকেও নিজে লেখা পড়া শিখাইয়া চাকরী করিয়া অবস্থার উন্নতি করিতে পারে এরূপ করিয়া দিয়াছিলেন। সকলে চেষ্টা করিয়া অবস্থার উন্নতি করিতে পারে এইরূপ পরামর্শ ও উৎসাহ দিতেন এবং সাহায্য করিতেন। রুকুণীবাসী ফকিরচাঁদ তাঁহার ক্ষৌরকর্ম্ম করিত। তিনি তাহাকে কিছু টাকা দিয়া বলিয়াছিলেন, তুমি আর এ কাজ করিও না। ময়রার দোকান দেও; তাহাতে অবস্থার উন্নতি করিতে পারিবে। সে তাহাই করে এবং তাহাতে তার অবস্থা ভাল হয়। ফকির পরম বৈষ্ণব ছিল। বাবা বলিতেন আমার সহিত দেখা হইলে ফকির চোখের জল ফেলিয়া বলিত, মরিয়া যেন কর্ত্তার পাদপদ্ম পাই। আমার শরীরের চামড়া দিয়া তাঁহার জুতা বানাইয়া দিলেও তাঁহার ঋণ শোধ যায় না।

তিনি বিদ্যার অতিশয় গৌরব করিতেন এবং বলিতেন, আমার বাড়ীর রাখাল ও যেন রাখালের রাজা হয় এবং মূর্খ না হয়।

আমাদের গ্রামের চণ্ডীপ্রসাদ সেনকে (যিনি তাঁর পরে রংপুরের জজের সেরেস্তাদার হন) তিনি শেষ বয়সে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত জাগিয়া পার্শী পড়াইতেন। তাঁহার শিক্ষার বয়স প্রায় গিয়াছিল; কেবল পিতামহের যত্নেই কার্য্যোপযোগী শিক্ষালাভ করিয়া বিস্তর অর্থোপার্জ্জন ও অন্নদান করিয়াছিলেন। চণ্ডীচরণ সেন মহাশয় যখনই পিতামহের নাম করিতেন তখনই ভক্তিভরে চক্ষুর জলে বুক ভাসাইতেন। এরূপ ভক্তিকৃতজ্ঞতা আমাদের মধ্যে অতি বিরল।

বাবা বলিতেন "তিনি কোন কর্ত্তব্য ভুলিতেন না। আমাকে প্রত্যহ পড়াইতেন এবং শিক্ষা সহজে হইবে বলিয়া, আমার সহিত পার্শীতে কথা বলিতেন। আমার একবার জীর্ণজ্বর হয়। তিনি এক বৎসর কাল পর্দ্দা ফেলিয়া ঘরের মধ্যে কাছে কাছে করিয়া রাখিতেন। হেকিমী চিকিৎসা হইত। বিষম গ্রীষ্মেও ঘরের দ্বার বা জানালা খুলিতেন না। নিয়মিত কার্য্য কখনও পরিত্যাগ করিতেন না। যথা সময়ে সমস্ত কার্য্য করিতেন। অনেক ভদ্রলোক আসিয়াছেন, নানা কথা হইতেছে, কিন্তু তাঁহার স্নান আহারের সময় উপস্থিত হইলে তখনই উঠিয়া যাইতেন"।

"তিনি পাপের উপেক্ষা করিতেন না। আমার বালককালে মা বাবার কাছে একবার বলেন যে, আমি মিথ্যাকথা বলিয়াছি; এজন্য এক মাস কাল আমাকে তাঁহার নিকট যাইতে দেন নাই। আমাদের একটি গরু কোন লোকের ক্ষেত খায়। সে বাবার নিকট রাখালের নামে নালিশ করে। তিনি রাখালকে ডাকিয়া সব জিজ্ঞাসা করিলেন, সে নিজের দোষ স্বীকার করিল। তখন তিনি রাখালকে বলিলেন, তুই যে রকম লাঠির মার খাইতে পারিবি, সেই রকম একখানা লাঠি

আন। সে একটি নল লইয়া আসিল; তিনি তাহা দিয়া ছোট্ট করিয়া তাহাকে দু ঘা মারিলেন।

"আবার ছেলেদের সহিত আমোদ কৌতুক ও করিতেন। তখন প্রহেলিকার অর্থবলা বড় মস্ত বিদ্যাবুদ্ধির পরিচায়ক ছিল তিনি প্রহেলিকা জিজ্ঞাসা করিতেন ছেলেরা উত্তর দিত একটা প্রহেলিকা আমার মনে আছে—

সোজাসুজি মেয়ে, মা, উল্টাইলে নেয়ে।
বল যাদু করবে তুমি কি কি অক্ষর দিয়ে॥

উত্তর "মাঝি" তাহার মাতা অন্ধ ছিলেন তিনি প্রাতঃকালে বাহির বাড়ী আসিবার সময় প্রত্যহ তাঁহাকে প্রণাম না করিয়া আসিতেন না। মাতা অন্ধ হইলেও পুত্রের আহারের সময় প্রত্যহ উপস্থিত থাকিতেন।

মোহনলাল শাক্ত ছিলেন। তাঁহার গুরুদেবের নাম মৃত্যুঞ্জয় তপস্বী। সিংহস্থা জগদম্বিকা তাঁহার ইষ্টদেবী। তিনি উপাসনা কালে লাল চেলীর ধুতী ও উত্তরীয় ব্যবহার করিতেন। এবং উপবীতের ন্যায় রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করিতেন। যতদিন দৃষ্টি শক্তি ছিল ততদিন শিবপূজা ও বিষ্ণুপূজা পৃথক ভাবে করিতেন। অন্ধ হইলে শিবের উপরই অঞ্জলি দিয়া বিষ্ণুপূজা সমাধা করিতেন। যথা সময়ে সন্ধ্যা উপাসনা করিতেন। তাঁহার রক্ত প্রবালের মালাছিল। উপাসনা কালে তাহা জপ করিতেন। অন্য সময়ে কেবল করজপ করিতেন। সংখ্যা রাখিতেন না।

এক দিবস সায়ংসন্ধ্যা সমাধা করিয়া নিজের শয়নের বিছানায় গিয়া বসেন। মশারি ফেলা ছিল। পিতামহ দৃষ্টি শক্তিহীন হইলে রাত্রিতে শয়ন ঘরেই আহার করিতেন। একদিন আমার পিতামহী

ভাত লইয়া গিয়া তাঁহাকে আহার করিতে ডাকিলেন। অপেক্ষা করিয়া দেখিলেন তিনি উঠিলেন না। তখন মশারি উঠাইয়া দেখেন যে মাথার উপর একটা চোগা দিয়া শরীর ঢাকিয়া বসিয়া আছেন। পিতামহী তাঁহার পায়ে হাতদিয়া ডাকিলেন। ইহাতে তিনি চমকিয়া উঠিলেন এবং বড় বিরক্ত হইলেন। ইহাতে বুঝাযায় যে তিনি নির্জ্জনে ধ্যান করিতেন।

উপাসনায় তাঁহার কিছুমাত্র আড়ম্বর ছিলনা। সেকালে আড়ম্বরটা খুব বেশীছিল। যাঁহার সন্ধ্যা আহ্নিকে যত দীর্ঘ সময় লাগিত সমাজে তিনি তত ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইতেন। মোহনলাল সর্ব্বদা করজপ করিতেন কিন্তু কোন দেবতার নাম উচ্চারণ করিতেন না। ইহাতে বুঝাযায় তিনি জ্ঞাননিষ্ঠ গৃহস্থ ছিলেন।

একদিন আমাদের বাহির বাড়ী ভানুমতী বাজি হইতেছিল। বাজীকর পায়ে শিং বাঁধিয়া মাথায় কলসী রাখিয়া ও গলায় বাঁশ ঝুলাইয়া দড়ির উপর দিয়া যাইতেছিল ইহা দেখিয়া মোহনলাল বলিয়া উঠেন "আহা মানুষ যদি এমনি করিয়া সংসার করে তবে কি দুঃখ পায়" অর্থাৎ ঈশ্বরে সতত মন রাখিয়া সর্ব্বকর্ম্ম অর্পণ করিয়া যদি তাঁহার জন্য সংসার করে তবে আর কোন দুঃখ পাইতে হয় না।

১২৪৩ সনের বৈশাখ মাসে শুক্লাপঞ্চমীতে দিবা দুই প্রহরের সময় তাঁহার মৃত্যু হয়। সময়ে মসয়ে শ্লেষ্মার জন্য তাঁহার পার্শ্ব বেদনা হইত মৃত্যুর পূর্ব্বেও এইরূপ বেদনায় ৩।৪ দিন অসুস্থ হইয়া বাড়ীর ভিতরে ছিলেন। পরে আরাম হইয়া খৈল দ্বারা মাথা ও শরীর পরিষ্কার করিলেন। স্নান করিয়া ধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া নিয়মিত উপাসনাদি করিলেন। কিন্তু ঠাণ্ডা লাগায় আবার বেদনা উপস্থিত

হয় এবংশ য্যায় গিয়া শয়ন করেন। পরে মেজেতে বিছানা পাতিতে বলিলেন। মাতামহী বিছানা পাতিয়া দিলেন মোহন লাল খাট হইতে নামিবার সময় তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার শয্যা এই ত্যাগ করিলাম; নামিয়া তাকিয়া ঠেসান দিয়া ডানহাত চিবুকের নীচে রাখিয়া বসিলেন। একবার শৌচে গিয়া আসিয়া তাকিয়া শিয়র দিয়া শুইলেন। ডান হাত কর জপ আকারে ধরা ছিল। একটু পরই শ্বাস উপস্থিত হইল। তখনই বাহির করা হইল। তাঁহার মুখ প্রশান্ত। কোন যন্ত্রণাদি অনুভবের চিহ্নমাত্র লক্ষিত হইল না। সুনির্ম্মল আকাশ তলে মধ্যাহ্ন সূর্য্যকিরণের সহিত তাঁহার প্রাণের উৎক্রমণ হইল। সেকালের রীতি অনুসারে তাঁহার মাথায় বেড়ী ও টিকী ছিল। মাথায় চুল অতি অল্প ছিল। আমার এক পিশী ছিলেন তখন তাহার বয়স প্রায় দুই বৎসর পিতামহদেবের মাথার নিকট যে তুলসী গাছ পুঁতিয়া দেওয়া হয় তাহা হইতে তাঁহার মাথায় মঞ্জরী ঝরিয়া পড়িয়াছিল। দুই বৎসরের শিশু কন্যা তাহা খুঁটিয়া তুলিতেছিলেন। মৃত দেহ স্পর্শে শিশুর অমঙ্গল হইতে পারে মনে করিয়া সকলে তাড়াতাড়ি মেয়ে আনিতে গিয়ে দেখে তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ হইয়ছে। গ্রামে রব পড়িয়া গেল মুনসী মোহনলালের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া প্রাণ নির্গত হইয়াছে। সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। কতলোক দেখিতে আসিল। বেদান্তে আছে, যাঁহাদের প্রাণ মূর্দ্ধণ্য নাড়ী সুষুম্না ভেদ করিয়া উৎক্রান্ত হয় তাঁহারা দেবযান পথে গমন করেন এবং স্বর্গভোগের পর মুক্তি লাভ করেন। উত্তরায়ন দিবাভাগ শুক্লপক্ষ সম্বৎসরাভিমানিনী দেবতার উপালক্ষিত পথে তড়িৎলোক পর্য্যন্ত গমন হয় পরে অমানব পুরুষ কর্ত্তৃক হিরণ্যভর্গের লোকে নীত হন তৎপরে স্বর্গভোগান্তে মুক্তি হয়। জ্ঞানী গৃহস্থের

এরূপ মুক্তির কথা বেদান্তে আছে। সেই দিন গ্রামে একটী বিবাহ উপলক্ষে অন্যান্য স্থানের অনেক বৈদ্য উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ সমারোহের সহিত পদ্মার কূলে তাঁহার সৎকার করা হয়। পাঠক যদি হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস কর আর শাস্ত্রে বিশ্বাস কর তবে বিবেচনা করিয়া দেখ মোহনলাল সমগ্রজীবন সংসারের মধ্যে থাকিয়া মুনিজন-সাধ্য কি কঠোর সাধনই করিয়াছিলেন। এক দিনের তরেও তিনি সংসারের ভার ত্যাগ করেন নাই। কর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াও যিনি এমন ব্রহ্মনিষ্ঠ তিনি কত বড় বীর। হিন্দুধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম, নিত্য সত্য। অনুষ্ঠান করিলেই ফল হয়। সাধন যতই গোপনে হউক না কেন একদিন না একদিন তাহার ফল প্রকাশ পায়।

মোহনলালের ক্রমে দুই পত্নী। প্রথম পুত্রের জন্মকালেই প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তাঁহার আর বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তাঁহার মাতা অন্ধ ছিলেন। মাতার বয়স তাঁহার অপেক্ষা ১২ বৎসর মাত্র অধিক ছিল। তিনি মাতার একমাত্র পুত্র। সংসারে দ্বিতীয় স্ত্রীলোক ছিল না। তাঁহার মাতা নিজের সেবা শুশ্রূষা হইবে না বলিয়া পুত্রকে পুনরায় বিবাহ করিতে বলেন। এই দ্বিতীয় পত্নীর এক পুত্র ও এক কন্যা। পুত্র কৃষ্ণলাল মুন্সী। কন্যা শিবসুন্দরী অল্প বয়সেই মারা যান।

আমাদের বংশে প্রবাদ আছে যে পিতামহের অধিক বয়সে ও পুত্র না হওয়ায় তিনি এক সন্ন্যাসী দ্বারা যজ্ঞ করান; ক্রিয়া শেষ হইলে তিনি বলেন তোমার পুত্র হইবে। কিন্তু পিতা মাতা ও পুত্র এই তিনের মধ্যে এক জনের মৃত্যু হইবে। আমার পিতৃব্য ৭ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। প্রসবের পরই আমার পিতামহীর মৃত্যু হয়। একটী মুসলমান স্ত্রীলোক তাঁহাকে লালন পালন করে।

আমার পিতৃব্য মুন্সী ব্রজলাল ১২২১ সনের ২৩ শে আষাঢ় জন্মগ্রহণ করেন তিনি পারশী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। গোয়ালপাড়ায় বর্দ্ধমানের কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রবংশের মুসলমান চাকরী করিতেন। পিতৃদেবের তাঁহাদের সহিত প্রতিযোগিতা চলিত। পিতৃদেবের নিকট গল্প শুনিয়াছি একবার পিতৃব্যদেব তাঁহার কোন মুসলমান বন্ধুর পুত্রের বিবাহে নিমন্ত্রিত হন। কিন্তু যাইতে একটুক বিলম্ব হয়; পিতৃব্যদেব বিবাহ সভায় উপস্থিত হইবা মাত্র তাঁহার কোন মুসলমান বন্ধু পার্শীতে একটী শ্লোক করিয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করেন। পিতৃব্যদেব তখনই একটী হাস্যরসাত্মক শ্লোকে উত্তর দিয়া সভাস্থ সকলকে হাসাইলেন এবং প্রতিপক্ষকে নীরব ও অপ্রতিভ করেন। তিনি কিছু সম্মানভীরু ছিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মে তাঁহার আস্থা ছিল। একবার অজ্ঞাত সারে একটা সজারু বধ করিয়া পুরোহিত ডাকিয়া বিধিমত প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। তিনি মুনসেফ হইয়া তেজপুরে যান সেখানে গিয়া ওলাউঠায় তাঁহার মৃত্যু হয়। বাবা বলিতেন দাদা চিরদিন স্বজনের মধ্যে থাকিয়া মৃত্যুকালে অবান্ধব স্থানে গিয়া পড়িয়াছিলেন, না জানি তাঁহার স্নেহময় মনে কতই কষ্ট হইয়াছিল। তিনি ব্রজভাষায় সুন্দর সুন্দর হোলির গান রচনা করিতেন। তাহার বাংলা রচনাও অতি সরল সদর্থযুক্ত। তাঁহার হস্ত লিখিত পুস্তক হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

উত্তম চিন্তা কি?

উত্তম চিন্তা তাহাকে বলি যাহা অবলম্বনে আনন্দ, প্রেম, পুলকের উদয় হয়। জাগতিক পদার্থ সকলের মাহাত্ম্য (শ্রষ্টার জ্ঞান ঐশ্বর্য্য দয়াদি) দর্শনে হৃৎপিণ্ড প্রফুল্ল হয়। সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর ঈশ্বরীয় কৌশল সমুহ হৃদয়ঙ্গম হওনে আপনাকে কৃতার্থ মানা যায়। মহতী কীর্ত্তি

স্থাপনের সামর্থ্য হয়। অপিচ তদ্দ্বারা সৌভাগ্য যশ মান বৃদ্ধি পায় বরং তদ্‌গুণে বিশেষ বিশেষ কীর্ত্তি দ্বারা স্বকীয় ও পরকীয় বিবিধ উপকার লাভ হয়।

আমি ঐ উত্তম চিন্তা তাহাকে বলিতেছি যাহা মানব ভিন্ন অন্যান্য জীবে থাকা গোচর হয়না। এবং পরমেশ্বর বিচার শক্তি বিশেষরূপে মানবের অধীন করিয়া যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন সে এই চিন্তার কর্ম্ম।

কদর্য্য চিন্তা সকল জীবেরই আছে। উৎকৃষ্ট চিন্তা (উত্তমতা ধারণের চিন্তা) যে মানুষের নাই সে ইতর জীবের তুল্য গণ্য হয়। এই চিন্তা সাবকাশীয় সময়ের প্রতীক্ষিতায় মধ্যম ও অধম। অর্থাৎ কদর্য্য চিন্তায় ও উপায় চিন্তায় সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত থাকা গেলে ক্ষণেক অবকাশ পাওয়া ও কঠিন। উৎকৃষ্ট চিন্তা দুর্লভ্য। কারণ তাহার ফল—অর্থাৎ জ্ঞান, আনন্দ, প্রেম, ভক্তি ইত্যাদি সমীপভাগে দর্শন না হওয়ায় অপ্রবৃত্তি জনক। এ প্রযুক্ত তাহাতে আদৌ প্রবৃত্তি হওয়াই কঠিন। কিন্তু দরিদ্র কর্ত্তৃক দানের ন্যায় অনবকাশ মধ্যে অবকাশ লইবে। যে হেতু তন্নিমিত্তে নির্দ্ধারিত আয়ুর পৃথক সময় লাভ হইবে না। আর কটু ঔষধের ন্যায় উত্তম চিন্তার সফলতা দৃষ্টি করিবেক। কীর্ত্তিমানদিগের গুণ-কীর্ত্তি শ্রবণে এবং সৎকীর্ত্তি দর্শনে উৎসাহিত হইবে। যখন প্রবৃত্তির উদয় হয় তখন কোন বিষয় দুষ্কর থাকে না।

যাবৎ রস বোধ না হয় তাবৎ নৈপুণ্য জন্মেনা। যাবৎ অনুষ্ঠান না হয় তাবৎ রস বোধ হয় না যাবৎ প্রবৃত্তি না হয় তাবৎ অনুষ্ঠান হয় না। যাবৎ লভ্য বিবেচনা না হয় তাবৎ প্রবৃত্তি জন্মে না। অতএব স্বার্থ বিবেচনা করিয়া প্রবৃত্তিকে উত্তম পথে প্রবর্ত্তিত করিবে ও অনুষ্ঠান পূর্ব্বক আস্বাদ লইবে। যখন সুস্বাদ, কর্ম্মের সহিত কর্ত্তার

প্রণয় ঘটনা করে তখন নৈপুণ্য কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক দাসত্ব স্বীকারে দণ্ডায়মান হয়। অনাবিষ্ট (অনায়ত্ত) বিষয়ের প্রাক্কাল সমুদ্রের তুল্য। নিবিষ্ট বিষয়ের সমাধান কাল গোষ্পদের তুল্য।

অন্যমনস্ক জনের অভিপ্রায় বিস্মৃতি বশতঃ বিফল হয়। এবং ক্ষণে ক্ষণে বিবিধ যুক্তির উদয় হওয়াতে একটাও সিদ্ধ হয় না। এই কারণে তাহার কাল ও জীবন বৃথা যায়।

সাহস যখন বুদ্ধি ও সাধ্যের সহিত যুক্ত হইয়া মনুষ্যকে উপযুক্ত করে তখন সে কৃতকার্য্য ও যশস্বী হইতে পারে। নতুবা বিঘ্ন ও অপমান লাভ করে। এ প্রযুক্ত লোকে অনুষ্ঠানের অগ্রে আত্মবুদ্ধি ও সাধ্যকে পরিমাণ করিবে। এবং কার্য্যের ফলাফল ও সময় সামগ্রী বিবেচনা করিবে। যে হেতু বুদ্ধি অভাবে সাধ্য হয়না, সাধ্য অভাবে সাধনা হয়না। সময় ও সামগ্রী বিবেচনা না করিলে বুদ্ধি ও সাধ্য উভয়ই বৃথা হয়।

আশা হইতে মতি, মতি হইতে উদ্যোগ, উদ্যোগ হইতে কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে ফল হইয়া থাকে। জলমগ্ন নিরুদ্যমপুরুষ কদাচিৎ ভাগ্যক্রমে কূল পাইতে পারে। উদ্যোগী পুরুষের সন্তরণ দ্বারা অবশ্য কূল প্রাপ্তির আশা আছে।

অনভিজ্ঞের সদালাপ, নিরুৎসাহ ও অলসের সদনুষ্ঠান, স্বরহীন ব্যক্তির সঙ্গীতালাপ অভিমানী দিগের আমোদ বাঞ্ছা, কৃপণের লৌকিকতা ইচ্ছা ও নিষ্কর্ম্মার সুফলাকাঙ্ক্ষা অলীক।

কুস্থান হইতে সুশস্যের প্রত্যাশা, কুসমাজ হইতে সুযুক্তির প্রয়াস, কুস্বভাবী হইতে সৎসংস্কারের অভিলাষ, ক্রোধী ও অনবরোধী হইতে সদ্বিচারের আকাঙ্ক্ষা নৈষ্ঠুর্য্য লাভের কারণ। তাঁহার হৃদয়ের নিদর্শন—কোন দরিদ্র তাঁহাকে ২টী গাব উপহার দিয়াছিল তিনি সেই

বিষয় লিখিতেছেন—ইহা আমাকে এত তুষ্ট করিয়াছিল বুঝি রাজ সম্ভোগেও কেহ এত তুষ্ট হয় না। তৎকালীন শ্রীদামের বনফুল, রঘুনাথের বালির পিণ্ড ও বিদুরের ক্ষুদ্র (ক্ষুদ্) আমার স্মরণ হইয়াছিল।

১২৩২ সনের ২০শে জ্যৈষ্ঠ মুন্সী কৃষ্ণলালের জন্ম হয়। বাবার কথা বলিতে গেলে অনেক কথা মনে পড়ে। সে সব অতি শ্রবণযোগ্য কথা হইলেও তাহা বলিতে গেলে কথা বাড়িয়া যাইবে। ২।৪ কথা মাত্র বলিব। বাবার যখন ১০ বৎসর বয়স এবং আমার পিতৃব্যের যখন ২০ বৎসর বয়স তখন পিতামহের মৃত্যু হয়। পিতৃব্য তখন গোয়াল পাড়ার কাচারীতে টাকা ৩০ বেতনে এক চাকরী করিতেন। বাবা ১০ বৎসর বয়সে আর কত লেখাপড়া শিখিবেন। বাবা বলিতেন, আমি শৈশবে পাঠশালে পড়িয়াছি। যাহার হাতের অক্ষর ভাল সে মাটিতে একটী অক্ষর বড় করিয়া লিখিয়া দিত। আমাকে কঞ্চী দিয়া তাহার উপর বুলাইতে হইত। কখন কখন কঞ্চীর খোঁচায় আদ হাত গর্ত্ত হইয়া যাইত। কখন অক্ষরের নিকট শুইয়া শুইয়া লিখিতে লিখিতে ঘুমাইয়া পড়িতাম। তার পর মুন্সীর কাছে পড়ার গল্পও করিতেন। তিনি তামাক খাইতেন, আর বেত হাতে করিয়া বলিতেন, "আরে পড়্"। কেহ পড়িল "করীমা ববক্‌শা একার হালেমা"। আবার হয়ত একজন নিম্নস্বরে বলিল, "আজ কি আছে কপালে কওয়া যায় না।"

বাবা অগ্রজের নিকট প্রথম পারশী পড়িতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বড় ক্রোধ ছিল। বাবা বলিতেন আমি তাঁহার লাল বড় বড় চোক দেখিয়া একদিন মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম। সেই অবধি তিনি আর আমাকে পড়াইতেন না। বাবা বলিতেন দাদার রাগও ছিল

যেমন ভালবাসা ও ছিল তেমন। আমাকে প্রাণের অধিক ভাল বাসিতেন। এখন ভায়ে ভায়ে তেমন ভালবাসা যেন দেখিনা। আমি ৪ বৎসর পার্শি পড়িলাম। আমার ইহাতে কি বিদ্যা হইতে পারে বুঝিতেই পার। ১৪ বৎসরের সময় দাদা আমার বয়স কিছু বেশী দেখাইবে বলিয়া খুব উঁচু করিয়া এক পাগড়ী বাঁধিয়া গোয়ালপাড়ায় বড় সাহেবের নিকট উপস্থিত করিলেন আমি চাকরী না করিলে সংসার চলে না। বাবার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, সুতরাং চাকরী পাইতে আমার কোন কষ্ট পাইতে হইল না। বাবা ১৪ বৎসরে আরম্ভ করিয়া ৪৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত চাকরী করেন। আর ৩২ বৎসর পেনসেন ভোগ করেন। আমার বালক কালে বাবা গোয়াল পাড়ায় ৮০৲ টাকা বেতনে সেরেস্তাদার ছিলেন।

ডিক্রী ডিস্‌মিসের দিন।

বাবা একদিন গল্প করিতেছিলেন,—

"১৮৩৯ সনে নভেম্বর মাসে ডেভিড্‌সন সাহেবের সময় ১৪ বৎসর বয়সে আমি ১২৲ টাকা বেতনে গোয়ালপাড়ায় এক মোহরের পদে নিযুক্ত হই। সাহেব আমাকে বলিলেন, 'তুমি এক বেলা স্কুলে যাও আর এক বেলা কাছারীতে কাজ কর। ডেভিড্‌সন সাহেব চলিয়া গেলে ১৮৫১ সালে A. Start সাহেব তাঁহার পদে আসেন। তখন কেবল ফৌজদারির পেস্কার আমি হইয়াছি। আমার জ্ঞাতি দাদা কালীনাথ দাস ফৌজদারির সেরেস্তাদার। তাঁহার প্রিয় কোন ব্যক্তি পেস্কারী পদ না পাওয়ায় তিনি আমার কোন সাহায্য করিতেন না। এজন্য আমি কিঁছু অসুবিধায় পড়িয়াছিলাম। ষ্টার্ট সাহেব

আসিয়া প্রথম দিনই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৃষ্ণলাল কে?" ইহাতে বোধ হয় ডেভিড্‌সন সাহেব আমার বিষয় তাঁহাকে কিছু বলিয়াছিলেন।

এই সময়ে বিচার কার্য্য প্রায় বড় বড় বাঙ্গালী কর্ম্মচারীদের উপর নির্ভর করিত। সাহেব উভয় পক্ষের কথা শুনিয়া "ডিক্রী" বা "ডিস্‌মিস্" বলিতেন। ঘটনা ও প্রমাণাদি তাঁহার হুকুমের অনুকূলে সংগ্রহ করিয়া তাঁহার রায় বজায় রাখিতে হইত।

এই সময়ে বিজনীর রাণী ভাগ্যেশ্বরীর সহিত হাবড়া ঘাটের প্রজাদের বিষম বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে। প্রজারা সব বিদ্রোহী প্রেমনারায়ণ দারোগা তাহাদের দলপতি। অবশেষে প্রজারা ডেপুটী কমিশনরের নিকট এক লম্বা দরখাস্ত করিল। লোকে সহর পূর্ণ, কাচারীতে ও সেদিন লোক ধরেনা। সাহেবের বাঁয়ে সেরেস্তাদার, পেস্কার প্রভৃতি বড় বড় আমলা দাঁড়াইয়া, পশ্চাতে ছোট ছোট আমলা। সম্মুখে দুই পক্ষের উকীল। সকলেরই আজ পোষাকের বেশ ঘটা। সকলেরই গায় জামা জোড়া ও মাথায় ফুলান পাগড়ী। কপালে রক্তচন্দন ও শ্বেত চন্দনের জাঁকাল ফোঁটা। কেহ কেহ সাহেবের মন জয় করিবার জন্য গোরোচনার ছোট ফোঁটা কাটিয়াছেন ও নানা তুকতাক করিয়াছেন। কাচারী ঘর ও বাহির, লোকে লোকারণ্য। পেস্কার দরখাস্ত পড়িলেন। শেষে উকীলেরা দু এক কথা বলিলেন, সাহেব বড় মিতভাষী, কথা কওয়াটা বড়ই কম। সাহেব অস্পষ্টস্বরে প্রজার ডিক্রী দিলেন। আমলা ও উকীলেরা তাহা বুঝিলেন কিন্তু অর্থের লোভ তাঁহাদিগকে বুঝিতে দিতেছে না। বড় বড় কর্ম্মচারী কলম লইয়া সাহেবের অভিপ্রায় লিখিয়া সাহেবকে শুনাইবা মাত্র তিনি মুখ ফিরাইতেছেন। তখন আর এক জন চশমা

মুছিতে মুছিতে বলিতেছেন ভাইসাহেব কাগজ খানা আমাকে একবার দিন ত। তিনি ও লিখিলেন। তাহা শুনিয়াও সাহেব মুখ ফিরাইলেন। তখন আর এক জন কাগজ টানিয়া লইলেন এইরূপ চলিতেছে এমন সময় কোন কাগজে সাহেবের দস্তখতের জন্য আমাকে তথায় যাইতে হইয়াছিল। আমি গিয়া ঐ তামাসা দেখিতেছিলাম বড় বড় আমলারা যখন সাহেবের কথার অর্থগ্রহণ করিতে পারিলেন না, তখন আমি বলিলাম হুজুরের হুকুমের অর্থ হয় ত এই। আপনারা তাই লিখুন। সাহেব তখন আমাকে নিকটে ডাকিলেন এবং পীঠে এক থাবড় দিয়া কাগজখানি লইয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন তুমি মুন্সী মোহনলালের বেটা তুমি হুকুম লিখিতে পারিবে। তুমি লিখ। আমার বয়স তখন ১৮। সমস্ত প্রাচীন আমলা হা করিয়া তাকাইয়া রহিলেন। আমি পড়িলাম, তিনি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন হাঁ ঠিক হইয়াছে।

কুচবিহারে কাজ।

কোচবিহার করদ রাজ্য। একলক্ষ নারায়ণী টাকা প্রতি বৎসর ইংরাজকে দিতে হইত, ইহার নাম নালবন্দী অর্থাৎ সৈন্যের খরচ। যখন কোন রাজা নাবালক থাকেন তখন ষ্টেটের জন্য সরকার পক্ষ হইতে একজন কমিসনার নিযুক্ত হইতেন।

এগ্নিউ সাহেব কমিশনার হইয়া আমাকে কমিসনারের সেরেস্তাদার করেন এবং কোচবিহারের সেরেস্তাদি তদারক করিয়া রিপোর্ট করিতে বলেন। আমি প্রায় তিন মাস এই জন্য বেহারে ছিলাম,

তখন নলডাঙ্গার নীলকমল সান্যাল দেওয়ান। তিনি খুব নাম ডাকের লোক কিন্তু কোন বিষয়েই কোন বন্দোবস্ত ছিলনা। রাজা-রাজাদের সহিত এই নিয়ম ছিল যে ইংরাজের আইন না চলুক তাহার রীতি অনুসারে তথায় কার্য্য হইবে কিন্তু তাহার কিছুমাত্রও হয় নাই, ঠিক জমীদারদের প্রথায় কাজ কর্ম্ম চলিত।

আমি দেখিলাম, রাশি রাশি নথী গাদা করা আছে। ৪০ বৎসরের খুনি আসামীর নামে মোকর্দ্দমা চলিতেছে সে হয়ত কোন দিন মরিয়া গিয়াছে, কোন আসামী ২৫ বৎসর হইতে হাজতে আছে কত দেওয়ানীর আসামী জেলখানায় পচিতেছে মেয়াদের একটা সীমা নাই, টাকা দিয়া তবে যাইবে। এগ্নিউ সাহেব সেই সময় এক দিন উপস্থিত ছিলেন, একজন ব্রাহ্মণ ২৫ বৎসর হাজতে আছে; তহবিল ভাঙ্গা কি মাল খাজানা না দেওয়া এইরূপ কি হইয়াছিল। সাহেব এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার বিচার করিতে বলিলেন। ডেপুটী কমিশনার তথায় উপস্থিত ছিলেন; তিনি বলিলেন, "ও সব দেওয়ানের কাজ, আমার এখানে লোক নাই"। এগ্নিউ সাহেব বলিলেন, "আমার লোক আছে"। তৎক্ষণাৎ তিনি আমাকে বিচার করিয়া হুকুম লিখিয়া আনিতে বলিলেন। আমি যাহা হয় করিয়াদিলাম, সে ব্রাহ্মণকে সাহেব ডাকিলেন তাহার পাকা লম্বা দাড়ি, ছেঁড়া ও ময়লা কাপড় দেখিলেই দুঃখ হয় সাহেব তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন কিন্তু বলিলেন, "তুমি রাজার টাকা দাও"। সে বলিল, "হুজুর টাকা দিতে আমি প্রস্তুত আছি, কিন্তু সারাজীবন আবদ্ধ থাকিয়া কি করিয়া টাকা দিব"। ঐ ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া দেওয়ায় এগ্নিউ সাহেবের নামে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে আমারও কিছু হইল। নায়েব আহিলকারেরা রীতিমত মাহিয়ানা পাইতেন না, জরিমানা হইতে তাঁহারা মাহিয়ানা

লইতেন, তাঁহাদের বেতন মাত্র ২৫৲ টাকা ছিল; মোকর্দ্দমা মামলা কম থাকিলে দারোগাদের উপর হুকুম যাইত। দারোগাদের কোতঘরে এক এক কালীর খুঁটী থাকিত তাহাতে কালীমূর্ত্তি আঁকা থাকিত। আসামীকে আসিয়াই সেই কালীর নিকট ভূমিষ্ঠ হইয়া কোৎসেলামী দিতে হইত। পুলীশের অত্যাচার যে এখন কম তাহা আমি বলিনা। ১৮৬৬ সনের মার্চ্চে রিপোর্ট দিলাম।

আমার রিপোর্টের পর এগ্নিউ সাহেব আমাকে বিহারের মাজিষ্ট্রেট করিলেন এবং তিন মাস থাকিয়া ফৌজদারী আইন প্রচলন করিতে বলিলেন, এই কার্য্যে যে কত কষ্ট পাইয়াছি বলা যায় না। ইংরেজী আইন যে স্থলে অজ্ঞাত তথায় প্রচলন করা যে কি ব্যাপার তাহা সহজেই বুঝা যায়। ইহার পর কিছু কাল ধুবড়ি ও নগাঁয়ে মুন্সফি করিলাম। এই সময় হটন সাহেব আসিলেন। কিছু দিন পরে দেওয়ান নীলকমল সান্যালের মৃত্যু হইলে, হটন সাহেব আমাকে কুচবেহারের দেওয়ানী দিতে চান, আমি স্বীকার করিলাম না।

ইহার কারণ এই আমি যখন বিহারে যাই তখন তথায় দুইটী দল ছিল। এক দল বুড়ী রাণীর দিকে, অপর দল ছেলের দিক্। উভয় দলই গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগকে অপর দলের লোক মনে করিতেন। দেওয়ান নাবালক রাজার পক্ষে ছিলেন; তাঁহার ইচ্ছা সম্পত্তি গভর্ণমেণ্টের হাতে থাকে। রাণীর ইচ্ছা রাজ্য তাঁর নিজের হাতে থাকে। এই লইয়া গোল; উভয় পক্ষের শত্রু হইয়া কাজ করা অসম্ভব মনে করিয়া আমি দেওয়ানী পদ স্বীকার করিলাম না।

তার পর আমাকে মুনসেফ করিবার জন্য হটন সাহেব হাইকোর্টে লিখেন। হাইকোর্ট বলিলেন, পরীক্ষা দেওয়া লোক ভিন্ন অন্য লোককে আর ও কাজ দেওয়া হইবে না। পরে তিনি গভর্ণমেণ্টে লিখেন,

তাহার উত্তর পাইলেন যে, হাইকোর্টের মতের উপর তাঁহারা কোন কথা বলিতে পারেন না।

তারপর সাহেব এক দিন আমাকে বাংলায় ডাকাইয়া বলিলেন আমি তোমাকে যখন খুঁজিয়াছি তখনই পাইয়াছি। আমার ইচ্ছা তোমার কিছু উপকার করি। কিন্তু কিছু করিতে পারিতেছি না। তুমি সেট্‌লমেণ্ট ডেপুটী কলেক্টর হও আমি দিতে পারি। কিন্তু সে কাজ অস্থায়ী। আমি গেলাম না। তার পর তিনি বলিলেন ১৫০৲ টাকা বেতনে তোমাকে বেহারে নায়েব আহেলকারের পদে নিযুক্ত করিতেছি, তুমি সেখানে যাও। আমি অগত্যা স্বীকার করিলাম। দেখ, যে বেহারে আমি দেওয়ানী নেই নাই, সেখানে আমাকে নায়েব আহেলকার হইয়া যাইতে হইল।

বিহারে সুখে কাজ করি নাই; গোয়াল পাড়াতেই সুখে ছিলাম। বিহারে যত অসুবিধার কাজ তাহাই আমাকে করিতে হইত ১৮৬৭ সনে দেওয়ান প্রজার জমাবৃদ্ধি করিলেন। ইতিপূর্ব্বে হটন সাহেবের সহিত এ বিষয় আমার কথা হয়। আমি বলি প্রজার কুলাইয়া জমাবৃদ্ধি করা উচিত। তাহাতে প্রতি বিঘায় ৷৷০ আনার বেশী খাজানা হইতে পারে না। দেওয়ানেরা পরামর্শ করিয়া ১৲ টাকা করিলেন। তুফানগঞ্জের প্রজারা দলে দলে রংপুরের এলাকায় পলাইয়া যাইতে লাগিল। রাত্রি দুই প্রহর। পত্র লইয়া এক শোয়ার আসিয়া উপস্থিত। "দেওয়ান লিখিয়াছেন, "প্রজারা যাহাতে না পালায় আপনি গিয়া তাহা করিবেন। তাহারা যে খাজানা দিতে স্বীকার হয় তাহাই স্থির করিবেন।

প্রজাদের পালাইবার প্রধান কারণ এই যে, কবুলিয়তে বেগার দিবার কথা ছিল। প্রজারা তাহার এই অর্থ করিল যে যুদ্ধে

বেগার দিতে যাইতে হইবে। সেখানে গেলে ভুটিয়ারা ধরিয়া বলি দিবে। আমি অনেক কষ্টে তাহাদিগকে ফিরাইলাম। বেগারের কথা উঠাইয়া দেওয়া হইল। জমা ১৲ টাকাই থাকিল। তবে রাজা বিবেচনা করিবেন এইরূপ আশ্বাস দিলাম। প্রজার সমস্ত আপত্তি তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিলে আমাদের কোন সম্মান থাকিত না। সাধুতার ও যোগ্যতার জন্য বাবার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তিনি ২০০৲ টাকা বেতন পাইতেন কিন্তু উপরিস্থিত বাঙ্গালী কর্ম্মচারিদিগরে তাঁহার অবর্গ হওয়ায়, সময়ের পূর্ব্বেই কাজ পরিত্যাগ করিয়া আসেন, এজন্য ৭৫৲ টাকা পেনসেন পাইতেন। পিতৃদেব অতিশয় তেজস্বী লোক ছিলেন। খোসামদ দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। বাবা ইংরাজি জানিতেন না। ভাল বাংলা জানিতেন। বাবার কাগজ পত্রের মধ্যে একখানি পত্র দেখিয়াছি। পত্রখানি তৎকালের দেওয়ানের নামে লেখা। তিনি লিখেন রাজসরকার একটী নায়েব আহেলকারের পদ এবলিশ করিতে চান। আপনি যদি পেনসান লইতে ইচ্ছুক থাকেন লিখিবেন। বাবা লিখিয়াছেন—"অতি আহ্লাদের সহিত ইচ্ছুক আছি"। বাবা জ্ঞানী ছিলেন। তিনি বলিতেন, সংসারের জন্য একদিন মাত্র ঈশ্বরের নিকট আমার চক্ষু দিয়া জল পড়িয়াছিল। যে দিন আমি পেনসান লইলাম। তোমরা ভায়ে ভগিনীটী অনেকগুলি, নূতন বাড়ী ঘর করিতে হইবে। তোমাদিগকে লেখাপড়া শিখাইতে হইবে। স্বগ্রামে অমি নূতন লোক চিরদিন বিদেশেই কাটাইয়াছি; কি করিয়া চলিবে ইহা ভাবিয়া একদিন অন্ধকার দেখিয়াছিলাম। ঐ আয়েই তিনি সংসার যে ভাবে চালাইয়া গিয়াছেন এখন তাহার পাঁচগুণ আয়েও সেরূপ চলে না।

পিতৃদেব বাংলা লেখাপড়া নিজে নিজেই শিখিয়াছিলেন। পাটী-গণিত কিনিয়া রাত্রি ৩টার সময় আঁক কষিতেন। যত ভাল বাংলা পুস্তক বা সম্বাদ পত্র বাহির হইত তাহা তিনি কিনিয়া পাঠ করিতেন। তাঁহার বাংলা রচনা অতি সুন্দর। আইন ও তিনি নিজেই বাড়ীতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। ভাবিয়া দেখুন ১৪ বৎসরের বালক সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া কাজে প্রবৃত্ত হন পরে কেবল নিজের চেষ্টায় এতদূর কৃতিত্বলাভ করেন যে, একদিন কুচবেহারের দেওয়ানী ও সরকারী মুনসেফী পদেও তিনি যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন।

যে দীনহাটায় তিনি থাকিতেন তাহার সম্বন্ধে বলিতেন যে, আমি গিয়া দেখি যে, লোকে মাটীর সানকিতে ভাতখায় আর বাঁশের চোঙ্গে জল খায়। নিঃসম্বল! আমার সময় তাহারা থালা বাটী ব্যবহার করে। আমি দেখিয়া আসি যে, তাহারা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে ও নিরুপদ্রবে আছে। পিতৃদেব বলিতেন বিদেশে থাকাকাল মধ্যে যতদিন গোয়ালপাড়ায় ছিলাম ততদিনই সুখে ছিলাম। গোয়ালপাড়া ঠিক স্বগ্রামের মত হইয়া গিয়াছিল। উকিল মোক্তার কর্ম্মচারী সবই বাংলার লোক—যেন একটী গ্রাম।

বাবা প্রথম বয়সে বেশ সেতারা বাজাইতে জানিতেন ও গান করিতে পারিতেন। বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত শেষরাত্রে মৃদুস্বরে গাইতেন, "মনে কর শেষের ও সেদিন ভয়ঙ্কর।" বাবার প্রায়ই বাত প্রধান জ্বর হইত। জ্বরের মধ্যে গাইতেন, "মন মত্তকরী, কি করি ওমা শঙ্করী"। বাবা সাধুসন্ন্যাসীর সঙ্গ বড় ভাল বাসিতেন ও দুইবার গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি অনেক জ্ঞানী ও প্রেমী সাধু দর্শন করিরাছিলেন ও তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ পাইয়াছিলেন।

একজন ভক্তের বিষয় এখানে সংক্ষেপে বলিব।—

একদিন গল্প করিতে করিতে বলিলেন, কাঞ্চনদাস বাবাজিকে গোয়ালপাড়ায় দেখিয়াছি। তাঁহাকে লোকে পাগল বলিত। তিনি ভিক্ষা করিয়া যে ২। ৪ পয়সা পাইতেন তাহাদিয়া চাউল কিনিয়া ব্রহ্মপুত্রের তীরে কাচারীর সামনে এক গাছতলায় ভাত রাঁধিতেন। পরে অন্ধ আতুর, বলক, বৃদ্ধ বাজার হইতে ডাকিয়া আনিয়া আগে তাহাদিগকে ব্রহ্মপুত্রে বেশ করিয়া স্নান করাইতেন পরে দৈ ও ভাত শালপাতায় করিয়া খাইতে দিতেন। নিজে কখন্ খাইতেন কেহ জানিত না। শুনা যায় তিনি এক দিন চিড়া ও এক দিন ভাত খাইতেন।

তিনি সরকারী কাচারীর বারান্দায় মাটীতে পড়িয়া থাকিতেন। কর্ণেল এগ্নিউ তখন বড় সাহেব। বাবাজী কাচারীতে ঢুকিয়া এজলাসের দিকে তাকাইয়া বলিতেন; "মার বড়া সাহেব কো দশ জুতো"। সাহেব কিন্তু তাহাতে কিছু বলিতেন না। একে সাহেব, তাতে মিলিটারি, একজন দিশী লোক তাঁহাকে গালি দেয়, অথচ তিনি কিছু বলেন না ইহাতে লোকে আশ্চর্য্য হইতে পারে, এজন্য এজলাসের লোকদিগকে বলিলেন ঃ—"দেখ কাঞ্চনদাস আমাকে গালি দেয়, অথচ আমি কিছু বলিনা, তোমরা ইহাতে কি মনে কর? কেহ বলিল, "হুজুর, সাধু পাগল"। সাহেব বলিলেন, "না, সেজন্য না, দেখ এই পাগল ভিক্ষা করিয়া যাহা পায় তাহাদিয়া নিজে কিছু খায় না গরীব দুঃখীকে খাওয়ায় এত বেশ কাজ"।

কাঞ্চনদাসের তিনটী ভাব দেখা যাইত। আনন্দ, কাঁদা ও রাগ। সে যে আনন্দ তা যে না দেখিয়াছে তাহাকে বুঝান যায় না! বালকের মত মুখের দুই কোন দিয়া লালা পড়িতেছে। বাবাজী আনন্দে উন্মত্ত। চোখ মুখ দিয়া যেন সে আনন্দ ফুটিয়া বাহির হইতেছে। প্রতি রোমকূপ দিয়া আনন্দ ছুটিতেছে। সে যেন আনন্দের এক খানি ফটো।

আবার কখন সহরের মধ্যে পথে পথে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছেন যেন তাঁর কি ভয়ানক ইষ্টনাশই হইয়াছে।

আবার তাঁর রাগ সেও আশ্চর্য্য। আছেন আছেন আর লাফাইয়া উঠিতেছেন। যেন আকাশ কি বাতাসের সহিত বিবাদ করিতেছেন। সে রাগ আর পড়ে না; কিন্তু সবই অপার্থিব।

বাবাজী একদিন কাচারী যাওয়ার রাস্তায় যাইতেছিলেন আমি বাসায় আসিতেছি, পথে দেখা হইল। তিনি কর জপ করিয়া দেখাইলেন এবং আমার মাথায় একটী তুলসী দিলেন। জপ করিও, এইটীই যেন তাঁর বলার উদ্দেশ্য। জপাৎ সিদ্ধিঃ। সেই অবধি জানি তিনি বৈষ্ণব। জাতিতে তিনি গোয়াল ছিলেন। বাবা আবার বলিলেন একটা রহস্য শোন—

একবার সাহেবেরা যুক্তি করিয়া কাঞ্চনদাসকে বাঁধিয়া ছাঁদিয়া নৌকায় তুলিয়াছেন। সাধু চীৎকার করিতেছেন। তখন প্রায় সন্ধ্যা। কাচারীর সব আমলা ব্যাপার কি দেখিতে গেল। গিয়া অবাক। সাধু বলিতেছেন।—"সাহেব, আমাকে কোথায় নিবে?" সাহেব বলিলেন, "তোমাকে কলিকাতায় নিব।" তিনি বলিলেন, "কেন"। সাহেব বলিলেন, "তুমি এমন ভাল মানুষ ছিলে হঠাৎ পাগল হইয়া গিয়াছ তাই তোমাকে ভাল করিবার জন্য কলিকাতায় লইয়া যাইতেছি।" কাঞ্চনদাস হাসিয়া বলিলেন "সাহেব, তুমি কি পাগল! আমার এ পাগলামী কি সারে?" সবলোক হাসিয়া অজ্ঞান। কথাটা বুঝলে সাহেবদের দেশে (charity) দান ধর্ম্ম আছে সাহেবেরা সেটা চট্ করিয়া বুঝিলেন। সাধু গালিদিলেও সাহেব কিছু বলেন না। কিন্তু ভগবৎ প্রেমোন্মাদ জ্ঞান এত নাই। তাঁরাও তা দেখেন নাই। তাঁহারা জানিবেন কি করিয়া। সমাজে থাকিলে দেখা যায়। দেখিলে

জানাযায়। আবার রাজা রামকৃষ্ণের সম্পত্তি নীলাম ও জয়কালীর বাড়ী ভোগের কথা শুনিয়া বলিতেন, রাজাটা কি পাগল! কোন জাতি যে আমাদিগকে চিনিতে পারে না, কেবল জলের উপর তেলের মত ভাসে তার মরূকবই এই জায়গা। তাঁরা একজলে নান, একজল খান। আমরা একজলে নাই, একজল খাই। তাঁদের দেশের এক বাতাস, এক আকাশ; আমাদের দেশের এক বাতাস, এক আকাশ। এইটাই ভারতের বিশেষত্ব। বেদের বিশেষত্ব। হিমালয়ের বিশেষত্ব।

বাবা ২ বার গৃহ ত্যাগ করেন। প্রথমবার রাম কবিরাজের দ্বারা চিকিৎসার জন্য সহরে যান। সঙ্গে হরি নামে একজন বিশ্বস্ত কৈবর্ত্ত ভৃত্য ছিল। উপশম হইলে তথায় নিজামতে চাকরী করা তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তখন খুব বড় বড় চাকরী সেখানে জুটিত। একদিন ২ জন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীবালকের সহিত গঙ্গার ঘাটে দেখা হয়। তাঁহাদের সহিত আলাপে তিনি এত মুগ্ধ হন যে, পরদিন এই স্থান হইতে কাশীর দিকে চলিয়া যান। পথে উলাউঠা হয়। এক বৈদ্যের শুশ্রূষায় আরাম হন। পরে আবার চলিতে আরম্ভ করেন। একদিন এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে যাইতে ছিলেন; এজন্য সে চিমঠা লইয়া মারিতে আসে। বাবা বলিয়াছিলেন—সেই দিন প্রতিজ্ঞা করিলাম,—মরিয়া গেলেও কোন সন্ন্যাসীর সঙ্গে যাইব না। পথে এক রাত্রি পাটনার ফতুয়া ঘাটে গঙ্গাতীরে একখানা নৌকার উপর বসিয়া জপ করিতেছিলেন। জনশূন্য ঘাট। কে যেন তাঁর পীঠে ভর দেয়। রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলেন—তুই বাড়ী যা। তোর মা আছে! তবুও ফিরিলেন না। কাশীর দিকেই চলিলেন। একরাত্রি গাছতলায় শুয়ে আছেন। সে দিন পূর্ণিমা। স্বপ্ন দেখিলেন, তাঁর মা

৩—

বলিতেছেন,—দেখ্ আমার মৃত্যু হইয়াছে, তুই বাড়ী যা, গিয়া আমার পিণ্ড দে। আমার পিণ্ড দেয় এমন আর কেহ নাই। বাবা মার মৃত্যুতে কাতর হইয়া তখনই বাড়ী ফিরিলেন। তিনি যে দিন বাড়ী আসিলেন তার পরদিনই শ্রাদ্ধ।

পিতৃদেব তাঁহার দ্বিতীয়বার গৃহ ত্যাগ সম্বন্ধে একদিন যে গল্প করিয়াছিলেন তাহা এই—

অনেকদিন হইতে আমার কাশী গিয়া পাণিনি পড়িয়া বেদান্ত অধ্যয়ন ও যোগাভ্যাসের ইচ্ছা ছিল। ইতিপূর্ব্বে আমি গভীর রাত্রে প্রাণায়াম করিতাম। জপ, মনন ও প্রাণায়াম প্রত্যহ করিতাম। পূজাও করিতাম বটে কিন্তু তাহাতে আমার বড় মন ছিল না। আমি শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলাম। বীরাচার গ্রহণ করিয়াছিলাম। চক্রেও কিছুদিন বসি। কিন্তু শেষে তাহা ত্যাগ করিলাম। আমার ধারণা হইল ঈশ্বরদত্তবুদ্ধি যাহাতে বিকৃত হয় সে পথে ঈশ্বরলাভ অসম্ভব।

কোন প্রকার বাহ্যাড়ম্বরে আমার অনুরাগ ছিল না। এজন্য প্রাচীন সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাকে নাস্তিক বলিতেন। আমি জ্ঞানাঙ্কুর নামে একখানি বাঙ্গালা পুস্তক পাইয়াছিলাম। তাহার পর হইতে আমার সাকারে আস্থা কমিয়া গেল। এই সময় গোয়াল-পাড়ায় একজন বাঙ্গালী পরমহংস আসেন। তাঁহার সহিত আলাপে বুঝি যে আমি ঠিক পথই গ্রহণ করিয়াছি। উক্ত পরমহংস অতিশয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বলিয়া যান যে আমি ঠিক বুঝিয়াছি।

ঈশ্বরে চির দিনই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এ সংসার দুঃখের। এ জীবন লইয়া কি করিব, এই চিন্তা কিছুদিন আমার মন বড়ই অধিকার করিয়াছিল। সংসার ত্যাগ স্থির করিয়া সে দিন কাচারী

গেলাম না। এই সময় আমি ফৌজদারীর নাজির। অনেক মূল্যবান জিনিষ পত্র আমার হাতে, সে গুলি গুছাইয়া রাখিলাম। সরকারী বাক্সের চাবী আমার নিম্নস্থ কর্ম্মচারী চন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তীর নিকটে এই বলিয়া পাঠাইয়া দিলাম যে, আমি আজ কাচারী যাইব না। চাবিটী তুমি রাখিও।

বেলা ৭।৮ টার সময় বাড়ী হইতে বাহির হইয়া দ্রৌপদী ময়দাওয়ালীকে ছয়টী পয়সা দিলাম। তৎপর গোয়ালপাড়ার ঘাটে একখানা নৌকা ভাড়া করিলাম। তাহারা আমাকে পরদিন প্রভাতের পূর্ব্বে বাঘুয়া পৌছিয়া দিবে এই কথা হইল। যথাকালে বাঘুয়ায় পৌঁছিয়া এক ডাকের রানার পাইলাম। আমি কতকদূর তাহার সহিত গেলাম, সে দ্রুতগতি চলিয়া গেল। আমি অলিপুর ও রঙ্গপুর অতিক্রম করিলাম। রাত্রিতে এক চাঁড়ালের বাড়ীতে অতিথি হইলাম। সে এক পিতলের বাটী ও কিছু চাউল দিল। কুয়া হইতে জল তুলিয়া বাটীতে ভাত রাঁধিয়া খাইয়া বিশ্রাম করিয়া চলিয়া গেলাম। পরদিন দিনাজপুরের এলাকায় উপস্থিত হইলাম। আমার ইচ্ছা যে মালদহ হইয়া কাশী যাইব।

এই সময়ে ঈশ্বরে আমার যেরূপ নির্ভর এমন বোধহয় কখনই হয় নাই। দিনরাত্রি বনজঙ্গলের পথে যাইতেছি কিন্তু মনে কিছু মাত্র ভয় নাই। বিপদে ও কষ্টে পড়িলে ঈশ্বরের মহিমাই দেখিতাম। পরদিন এক দোকানে একবেলা চিড়াগুড় খাইয়া একখানা চাটায়ের উপর শুইয়া পড়িলাম। দোকানদার আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি জাতি? আমি বলিলাম, বৈদ্য। সে আমাকে যত্ন করিয়া উপরে বসাইল। সে রাত্রি কাটাইয়া বিকালে এক হাটখোলার কোন বুড়ীর দোকানে বসিয়া কিছু মুড়কী খাইলাম। আকাশে বড়

মেঘ করিল। বুড়ী বলিল, বাছা তুমি এখন দোকান হইতে যাও। আমি দোকান বন্ধ করিয়া বাড়ী যাইব। আমি বলিলাম, কোথা যাইব? ঐ মাঠের মধ্যে একখানা "নাকা" ঘর আছে, দেখিতে পাইবে। সেখানে সব অতিথি থাকে। তুমি সেখানে গিয়া থাক। আমি গিয়া দেখি, একখানা প্রকাণ্ড ঘর তার বেড়া নাই। ঘরে দ্বিতীয় মনুষ্য নাই। অপরাহ্নেও ঝড় বাতাস দেখিয়া আমি তাহার মধ্যে শুইয়া পড়িলাম, রাত্রিতে অনেক লোক আসিল। আগুন জ্বালিল। বড় বড় বলদ ঘরের খুঁটীর সঙ্গে বাঁধিল। আমার নিকটেই বলদ বাঁধিয়াছিল; আমি উঠিয়া গিয়া আর এক জায়গায় শুইলাম। রাত্রিতে একটা বলদ ছুটিয়া গিয়া একবুড়ীর গায়ের উপরে উঠে, তাহাতে বুড়ী বড় আঘাত পায়। ক্ষুরের আঘাতে চামড়া কাটিয়া রক্ত বাহির হইয়াছে; ঘরে খুব একটা গোলমাল আরম্ভ হইয়াছে। বুড়ীর পুত্র ও পুত্রবধূ ছিল; তাহারা বৈষ্ণব ভিক্ষুক; প্রভাতে বৃদ্ধাকে ফেলিয়া তাহারা ছেলেপিলে লইয়া চলিয়া যায়। এখন বুড়ী আমাকে বলিল, বাবা, তুই আমাকে নিয়ে চল্। আমি তাহাকে ধরিয়া লইয়া চলিলাম। কিন্তু তাহার একবড় দোষ, পথে যাহাকে পায় তাহার কাছেই ভিক্ষা চায়। ইহাতে আমার বড় অসুখ বোধ হ'তে লাগিল। পরদিন দিনাজপুর সহরে উপস্থিত হইলাম। বুড়ীর ছেলেরা এক সাঁকোর ধারে ভাত চড়াইল। আমি বুড়ীকে বলিলাম, তুমি এখন ছেলের সহিত যাও। বুড়ী বলিল, না বাবা, ও ছেলে আমার কে? তুই আমার বেটা, তুই আমাকে নিয়ে চল্। আমি বলিলাম, না বুড়ী, আমি আর যাইব না। তুমি এদের সাথে এখন চলিতে পারিবে। এই বলিয়া আমি সহরে গিয়া এক মোক্তারের বাড়ী অতিথি হইলাম। এদিকে বড় মেঘ করিল দেখিয়া কোন বাড়ীর গোয়ালের সামনে

বসিয়া আছি, এমন সময় মাধবপুরের গোপাল গোবিন্দ সেনের ভ্রাতা মোহনগোবিন্দ সেন আমাকে চিনিয়া ধরিয়া ফেলিলেন ; তখন উপায় না দেখিয়া সেখানে থাকিলাম।

এদিকে আমি বাসায় না আয়স দাদা ব্যস্ত হইয়া ডেপুটী কমিশনর ষ্টার্ট (Start) সাহেবের নিকটে গিয়া জেলায় জেলায় রোবকারী পাঠান যে, পুলিশ যেখানেই আমায় পায় ধরিয়া সম্মানের সহিত আনে।

নাজিরের বাক্সে দাদার কথামত ডবল তালা লাগান ও মোহর করা হইল, পরদিন দেখা গেল সমস্ত জিনিষ ঠিক আছে। কোন গোল হয় নাই। আমার ধরা পড়িবার পড়দিন রোবকারী আসিল ; আমাকে ধরিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট লইয়া গেল ; তিনি আমাকে বলিলেন, যেমন কাজ করিয়াছ তাহার ফল ভোগ কর গিয়া; এই বলিয়া আমাকে জেলে লইয়া যাইতে বলিলেন।

পুলিশ আমাকে কোতে রাখিল। মস্ত একটা শালকাঠ, তার গায় সব ফুকর আছে ; তাহার মধ্যে এক পা দিয়া আটকাইয়া রাখিল। আমার পাশে এক পাগলও ঐ ভাবে ছিল। সে আমার মাথায় লাথি মারিবার চেষ্টায় থাকিল। যত দূর পারি সরিয়া থাকিলাম। ইহাতে আমার মনে কোন দুঃখ ছিলনা। একটু পরে দারোগা আসিয়া বলিলেন, আমার অন্যায় হইয়াছে। আপনাকে আমি জানিতে পারি নাই। এই বলিয়া তিনি এক খাটিয়ায় বিছানা করিয়া দেওয়াইলেন। আমি তাহার উপর শুইয়া থাকিলাম। খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত হইল, তার পর আমাকে ডুলিতে করিয়া রঙ্গপুর পাঠান হইল। দারোগা বাবাকে জানিতেন, তিনি মুরব্বিরমত দুই চারি কথা বলিলেন। এবং আহারান্তে আমার গোয়াল

পাড়ায় যাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। আমি গোয়াল পাড়ায় উপস্থিত হইলাম। দাদার সহিত কাচারীর পথে দেখা হইল। তিনি আমারদিকে তাকাইলেন না। পরদিন কাচারী গেলাম। সাহেব বলিলেন, ফকিরী করিতে ইচ্ছা হয় বটগাছ এখানেই আছে, বাড়ীছাড় কেন? পিতৃদেব বাড়ীতে যে ৩২ বৎসর কাটাইয়াছেন তাহার ২০ বৎসর কাল দেশের লোকের যথেষ্ট কায করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথমে তুলাইর লোকালবোর্ডের মেম্বর হন। রাজনৈতিক কার্য্যেও যথাসাধ্য যোগ দিতেন। অনেক মোকর্দ্দমা শালিসে মীমাংসা করিতেন। কৃষক দিগের দায়ভাগাদি, যাহা উকীল দিগের নিকট জানিতে হয়, অথবা কাহার কি সত্ব ইত্যাদি যে যখন জানিতে আসিত, তখনই তাহার কায করিতেন। তাঁহার অনিদ্রার রোগ ছিল। তবুও তন্মুকে (চাকর) বলিয়া রাখিতেন, কোন লোক যেন ফিরিয়া না যায়। আমি যদি নিদ্রিত থাকি, আমাকে ডাকিয়া তুলিও। তিনি বাড়ী আসিলে আমাদের অঞ্চলে ফৌজদারী মোকর্দ্দমা খুব কমিয়া যায়। তিনি মারামারি করিয়া মরিতে নিষেধ করিতেন। দেওয়ানীতেই যে সব হইতে পারে লোকে তাঁহার নিকট আসিয়া বুঝিল। ইহা ভিন্ন তিনি সংসারের সমস্ত কাজ নিজেই করিতেন। সে সব দেখাশুনা, লেখা পড়া নিজেই করিতেন। খুব বৃদ্ধ হইলে প্রত্যহ যাহা করিতে হইবে তাহা মনে থাকে না বলিয়া একখাতায় লিখিয়া রাখিতেন। তাহার উপর লেখা ছিল, "স্মারক বহি"।

বাবার "স্মারক বহিতে" সাংসারিক কথাভিন্ন অন্য কথাও থাকিত। তাঁহার ঐ পুস্তকের ৫০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, ১৩০৯ সনের ৩০শে চৈত্র পর্য্যন্ত ও আমি দুর্ব্বল হস্ত, দুর্ব্বল চক্ষু এবং দুর্ব্বল মাথা লইয়া বহু কষ্টে লিখা পড়ার কায করিতে পারিলাম। ইহার পর আর পারিব বলিয়া

মনে হয় না। "জমা খরচ" বলিয়া এক খানা খাতা আমার থাকিবে, আমার বৃত্তান্ত যদি লিখিতে পারি, তবে তাহাতে লিখিব।

"হে মহান্ আত্মা! আমার অনন্ত জীবনের এই একটিপর্ব্ব বৃথা গেল; গেলেও জীব কখনও তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। দেশ কাল বাধা জন্মাইতে পারে না। আমি প্রতি মুহূর্ত্তে আমার জীবন ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছি। এই উপায়ে তোমার দয়ার প্রতি আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে। সুতরাং যে কালে যে দেশেই থাকি না কেন, তোমার দয়া হইতে কখন বঞ্চিত হইব না। ওঁ। ১৩০৯। ৩০ শে চৈত্র, সোমবার ভোরের পূর্ব্বে।

শ্রীকৃষ্ণলাল দাস গুপ্ত।"

তাঁহার কার্য্যের শৃঙ্খলা ঠিক সাহেবদের মতছিল। টেবিলের উপর কাগজ, পত্র, পেন, দোয়াত বেশ সাজান আছে। ঘরের কোথাও কিছু বিশৃঙ্খল নহে। সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সাহেবদের সঙ্গে থাকিয়া তিনি এই গুণটি শিখিয়াছিলেন।

বাবা প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় ভালবাসিতেন; পর্ব্বত, বন, নদী, আকাশ, ফুল, শিশু তাঁর বড় প্রিয় ছিল। আমাদের উঠানে একটা ডালিমের গাছ ছিল। ডালিম ভাল হইত না। আমরা কাটিয়া ফেলিব শুনিয়া বলিলেন, "না, উটীকে কাটিও না। কেমন সুন্দর লালফুল ফুটে থাকে, দেখ্‌তে বেশ"। ফুলের মধ্যে গোলাপ তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। আর স্বপ্ন! কত সুন্দর স্বপ্নই যে তিনি দেখিতেন, তার অন্ত নাই। তাতে পাহাড়, বন, নদীর বিচিত্র শোভার কথাই বা কত! কখন কখন তাহা আধ্যাত্মিক ভাবে ও ব্যাখ্যা করিতেন।

পিতৃদেবের ধর্ম্মভাবই প্রধান কথা।—

যৌবনে তিনি শাক্তধর্ম্মে দীক্ষিত হন। আমাদের কুলদেবতা "সিংহস্থা জগদম্বিকা"—দুর্গা। কিছুদিন চক্রেও বসিয়াছিলেন। আমাকে এক দিন বলিলেন, চক্রে আমাকে সকলে টানিয়া লইয়া গেল—বলিল, আয় তোর হবে। আমি ক'দিন গেলাম। পরে ভাবিলাম, এ কিরকম সাধনা, নেশা হয়। এতে কি করে ধর্ম্ম হবে! ফলে তন্ত্র মতের ভাল সাধক সব সময়েই বিরল। এইরূপে বিরক্ত হইয়া তিনি উহা ত্যাগ করিয়া আসেন। বেদান্তের 'ব্রহ্মে' তাঁহার অকাঙ্ক্ষা হয়। আদি সমাজের সংবাদ পত্র ও পুস্তকাদি তিনি নিয়ত লইতেন। বাবা বড় বিচার করিতেন, তিনি বলিতেন ঈশ্বর উপাসনায় **চাই অনুরাগ**। তাহা শুয়ে শুয়েও হয় গল্পের মধ্যেও হয়। যে, সে সাধনের রস পাইয়াছে, সে তাহা কাহাকেও দেখাইতে চাহে না। এবং আমি যে কিছু করি তাহা লোকে না জানে এই ইচ্ছা করে। অনুরাগ না জন্মিলে এরূপ সাধন হয় না। চাই অনুরাগ। অনুসন্ধানে অনুরাগ হয়, অনুরাগে বিবেক হয়। বেদান্তে পঞ্চবিধ উপাসনা বলে; তার একটি এই যে, গার্হস্থ্যের সব কর, কিন্তু সর্ব্বদা তাঁকে স্মরণ ও তাঁতে শ্রদ্ধা চাই। ইহাতেও তাঁহাকে পাওয়া যায়। এ সতত স্মরণ দুর্ঘট—সত্য, কিন্তু আমার দিনে একবার, কি পাঁচ দিন দশদিন পরও যদি একবার স্মরণ হয়, সেও ভাল। কিন্তু সেটি **অকপট হওয়া চাই**। নিয়ম বাঁধা পূজা পদ্ধতিতে অনেক সময়ে রীতিরক্ষা হইয়া যায়, আমি তাও চর দিন করিয়াছি। সাকার উপসনা ও করিয়াছি কিন্তু যে শাস্ত্রবাক্য জানিয়াছে যে সেই চিৎ পুরুষই আমার আমি, এ জড় ও জীব তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে, যাহার মন বিচারনিষ্ঠ, তাহার মূর্ত্তিতে কখনই মন উঠিবে না। বিশেষ নিরাকার ভজিয়াই যে সুখ পায়, সে কৃষ্ণের কথাই বা শুনিবে কেন, আর পরমহংসের কথাই বা

শুনিবে কেন? রাজা রামকৃষ্ণ, এক এক পরগণা নীলাম হইয়া যাইত, আর জয় কালীর নিকট ভোগ দিতেন। লোকে তাঁহাকে পাগল বলিত; কিন্তু যে "পরমানন্দ ময়ীরে" জানে, সে লোকের কথা শুনিবে কেন? লোক অনেক দিন ঘুরে বেড়ায়, কি ভজিবে বুঝে না। কোনটিতেই তৃপ্তি বা শান্তি পায়না, শেষে উপাস্য আপনি মিলে। তিনি নিজেই বলে দেন। কেবল চাই অনুরাগ। অনুরাগী না হ'লে তাঁকে পাওয়া যায় না। যে মহিমাদর্শন না করে, তার অনুরাগ হয় না। সতত মহিমাদর্শন বড় দরকার আর সৎসঙ্গ, সাধুদর্শন. তাঁদের সহিত আলাপ বড়ই দরকার। তাহা হইতেই আত্মকর্ত্তব্য ঠিক হইয়া যায়।

শেষ কালে একদিন বলেছিলেন, আমি জাগ্রত অবস্থায় দুদিন কালী মূর্ত্তি দেখিয়াছি। ক্রমে মূর্ত্তি আকাশে লীন হয়ে গেল। এখন আর স্বপ্নে ব্রাহ্মণ দেখি না, দেবতাই দেখি।

ঈশ্বরের জ্ঞান হইলে, জীবে দয়া আপনি আসে। জীবের কল্যাণ করিতে ইচ্ছা হয়। না করিতে পারিলে বুক ফাটিয়া যায়। জ্ঞানের পর কর্ম্ম আপনি আসে।

বেদে বলে ব্রহ্ম আনন্দময়, আনন্দই তাঁহার স্বরূপ। তন্ময় হইতে পারিলেই আনন্দ অনুভব হয়। এরূপ অবস্থা হয়, অবশ্য অল্প ক্ষণের জন্য। আমি করজপ আর করিনা, তাহাতেও মন বাহিরে আসে। কেবল মনেই জপ করি। কখনও বীজ মন্ত্র, কখনও প্রণব। আমাদের ইষ্টদেবতা জগদ্ধাত্রী। আমার বীজ মন্ত্রটি বড় কঠিন। আমি দেব দেবতার উপাসনা আর করি না। উপনিষদের ধর্ম্মই খাঁটি ধর্ম্ম। আমি আত্মার উপাসনা করি; অন্য কিছুতে মন ধরে না।

কর্ম্মফল মানিতে হয়। **ঈশ্বর লাভ সম্বন্ধে নিরাশ হইতে নাই।** দেখ, আমি দুইবার গৃহত্যাগ করি। আমার

সংসারের ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তোমরা আসিবা, আমার সাধ্য কি যে কর্ম্ম লঙ্ঘন করি। আমরা তাঁহার ইচ্ছার অধীন। যাহা ইচ্ছা করি, তাহা করিতে পারি না; তাঁহার যাহা বিধান তাহাই হয়। চেষ্টা করিয়া ও আমরা তাহার অন্যথা করিতে পারি না।

আমার বয়স খুব বেশীই হইয়াছে, এখন সময় হইয়াছে, বোধ হয় কলিকাতাতেই আমার মৃত্যু হইবে। যদি নিকটে, থাক, তবে সাদা কম্বল বা কুশাসন আমার শেষশয্যা করিয়া দিও। শেষ মুহূর্ত্তে কেহ যেন টানাটানি না করে। আমার যে টুকু জ্ঞান থাকিবে, তাহা যেন কেহ লোপ করিয়া না দেয়।

তুমি নিকটে থাকিলে ভাগবতের গজেন্দ্রমোক্ষণ স্তবটি শুনাই ও। ওটি আমি প্রথম বয়স হইতেই অভ্যাস করিয়াছি। অমন স্তব আর পাই নাই। হিন্দু ধর্ম্মে সার কথা ক'টি উহাতেই আছে।

মৃত্যুর ২০ দিন পূর্ব্বে পিতৃদেব বলিলেন, আমি কলিকাতা যাইব। কেন, কেহ তাহা জানে না। আমার দ্বিতীয় কনিষ্ঠ কলিকাতায় থাকে। সেখানে গিয়া থাকিলেন। তাঁহার মৃত্যুর দিন ঐ বাড়ীতে আমার ভাগিনেয়ীর বিবাহের আয়োজন হইতেছে। বাবা বলিলেন, বিবাহের আয়োজন অন্যত্র কর। আমার সময় নিকট। বিবাহের দিন প্রভাতে মাতাঠাকুরাণীকে বলিলেন—দেখিলাম ২টি শিশু সমবয়স্ক নীলবর্ণ, যেন শরীর হ'তে স্নিগ্ধ চন্দ্রের জ্যোতি বাহির হইতেছে। হাসি হাসি মুখ। গলায় পৈতা। আমার শিয়রে ঐবাক্সের উপর বসিয়াছে। আমাকে বিষ্ণু দূতেই লইয়া যাইবে। আর দেখিলাম আমার কপালের উপর হাত দিয়া একটি সধবা ব্রাহ্মণ কন্যা দাঁড়াইয়া আছেন। কপালে রক্ত চন্দনের ফোটা। বলিলেন—চলত যাই, দেখি এবার কি করিতে পারি। ইনি আমাদের কুলদেবতা।

কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া ইঁহাকে দেখিলেই জানিলাম যে রোগ-মুক্ত হইয়াছি। এবার কার কথা বুঝিয়াছ? মধ্যাহ্নে ভাত আনা হইলে বসিলেন, কিন্তু আহার করিলেন না।

বিকালে উপস্থিত আত্মীয় কুটুম্ব স্বজন তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। তাঁহাদের সহিত আলাপ করিলেন। পরস্পর বলিলেন, ইহাঁর মৃত্যু আজ হ'বে কেমন কথা! তারপর একবার শৌচে গেলেন। আসিয়া আর কথা বলিতে পারিলেন না। মৃত্যুর দুই মিনিট পূর্ব্বে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন। যারা শুশ্রূষা করিতেছিল, বুকে হাত দিয়া উঠিতে নিষেধ করিল। তখন তিনি, যে ব্যক্তির বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছে, "উঠ্‌ব" বলিয়া জোর করিয়া বসিলেন। পা খানা চৌকী হ'তে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল, উঠাইয়া আসন করিলেন এবং **জপ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলেন**। কোন শ্বাসকষ্ট, কি কোন বাক্‌যন্ত্রনা হয় নাই। শেষ বয়সে প্রায়ই বলিতেন, জ্বর হইলেই আমার মাথা আক্রমণ করে; আমি অজ্ঞান হইয়া যাই। বোধ হয় শেষ কালে আমি ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া মরিতে পারিব না। বাবা বসিয়া প্রাণ-ত্যাগ করেন; আমার বোধ হয় তাহা হইবে না। কিন্তু যে ভৃত্য চির-জীবন ঈশ্বরকে স্মরণ করে, ঈশ্বর শেষ কালে তাহাকে স্মরণ করেনই।

বাবা বড় সুবিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার কাছে বসিলে আর উঠিতে ইচ্ছা করিত না। গম্ভীর অথচ আমোদ প্রিয়, ন্যায়বান, পরদুঃখকাতর ও সরল এমন লোক বড় দেখি নাই। তাঁর সরলতার একটা কথা বলি।—

একদিন মধ্যাহ্নে খেয়ে দেয়ে এসে নিজের ঘরে উঠ্‌বেন। আমি বাড়ীর ভিতর যাইব—দেখা হইল। বলিলেন, কুঞ্জ, হাস্‌বে নাত? আমি অবাক্। কি বাবার কথায় হাস্‌ব? পরে বলিলেন, আমি তাঁকে প্রভুও বলি; অর্থাৎ তিনি স্বরূপের ধ্যান করেন, প্রণব জপেন

তিনি আবার প্রভু ও বলেন, এ বিরুদ্ধ হইল। আমি ঈষৎ হাসিলাম। আজ্ঞা হাঁ, তা বুঝি, হয়। আমাদের ও প্রভু ভাব।

রাম কৃষ্ণ পরম হংস বলিয়াছেন কেহ স্ব রূপের ধ্যান করে আবার প্রভু ও বলে। এরূপ খুব উচুঁতে না উঠলে হয় না।

তাঁহার দান—

গ্রামের অনেক দরিদ্রা দুঃখিনীকে তিনি রীতিমত মাসে মাসে অর্থ সাহায্য করিতেন। আমাদের গ্রামে নবীন পাটুনী নামে একজন প্রায় ৯৫ বৎসর বয়সের বৃদ্ধ ও আছে; তাহাকে ও তিনি সাহায্য করিতেন। ইহাভিন্ন দুর্ভিক্ষের সময় চাউল কিনিয়া দুঃখীদিগকে দিতেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রেরা আসামে থাকিতেন। তাহাদের দ্বারা জমিদারদের নিকট হইতে ও অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া তাহা দান করিতেন। লোকের দুঃখ মোচন করা তাঁহার স্বভাবে পরিণত হইয়াছিল। লোককে খাওয়াইয়া তাঁহার তৃপ্তি হইত না। যা তা আহার করিতে পারিতেন না। আহার করিতে বসিয়া অনেক সময় বলিতেন, যা দেবে অঙ্গে, তাই যাবে সঙ্গে।

বাবার গুণ গ্রাহিতা—

আমার এক জ্ঞাতি দাদা ছিলেন। জ্ঞাতি হইলেও ঠিক জ্ঞাতির মত নয়। খুব আপন ছিলেন। ৪০৲ টাকা মাহিনায় রঙ্গপুরে চাক্‌রী করিতেন। তাঁর একটি ছেলে ছিল। নাম প্রমথ। প্রমথ বড় ধীর গম্ভীর ছেলে। দুঃখে কষ্টে পড়িতে পড়িতে কুচবিহার কলেজ হইতে B.A. পাশ করে ও B.L. হয়, পরে রঙ্গপুরে উকীল হয়। এবং অল্পকালেই অস্থায়ী মুনসেফ হয়।

একবার বাবার বড় জ্বর, আমরা ক'ভাই ই বিদেশে, প্রমথ বাড়ীতে। সে আমাদের চেয়ে বেশী করে। বাবা একদিন প্রমথকে ডাকিয়া

পাঠান। চাকরকে বলেন, বল গিয়ে যে, রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর আমাকে একবার দেখে যায়।

মাঘ মাস। প্রমথ যথা সময় আসিয়াছে। দেখে যে তিনি ঘুমাইতেছেন। তখন চুপ করিয়া বেড়া ঠেসান দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মনে করিল, জাগিলে জিজ্ঞাসা পত্র করিবে। বাবা খুব ঘুমাইয়া গিয়াছেন, যখন জাগিলেন তখন ও রাত্রি আছে। মাথা তুলিয়া দেখেন, সামনে প্রমথ দাঁড়াইয়া আছে।

দেখে বলিলেন—কি প্রমথ?

প্রমথ—আজ্ঞা হাঁ।

বাবা বলিলেন—রাত্রি শেষ হয়েছে, তুই এখানে?

প্রমথ কথা বলে না। বাবা বলিলেন—তোকে দেখে যেতে বলে-ছিলাম সন্ধ্যার পর—প্রমথ বলিল—আজ্ঞা, আমি তখনই এসেছি। আপনি ঘুমাইয়াছিলেন। বাবা বলিলেন—তবে কি তুই এই শীতে একটি পিরাণ গায়ে সারা রাত্রি এখানে দাঁড়িয়ে আছিস! যা দাদা বাড়ী যা, শোও গিয়ে, হাঁ তুইই এ বংশের ছেলে।

বোধ হয় এইরূপে আশীর্ব্বাদ পাইয়াছিল বলিয়াই প্রমথের অত তাড়াতাড়ি উন্নতি হয়ে গিয়েছিল। প্রমথ চাকুরী ১ বৎসরও করিতে পারে নাই। মারা গিয়াছে। মা, ঠাকুর মা, কিন্তু বেঁচে! এইত সংসার!

ভৃত্যের প্রতি ব্যবহার—

তনু সর্দ্দার বাবার বড় প্রিয় চাকর। সে দীনহাটার আর্দ্দালী ছিল। তার আগেও বাড়ীতে চাকর ছিল। সে বাবার পেন্সনের টাকা পাবনা হইতে মাসে মাসে আনিত। একবার তনু ঐ ৭৫৲ টাকা হইতে ২ বলদ কিনিয়া উপস্থিত। বাবা বলিলেন, তনু আর টাকা কৈ? তনু বলিল, কত্তা, ছ্যারা লাঙ্গল ববার পারে, তাতি এই

জুড়ে গরু কিনে আনলাম। বাবা বলিলেন—আচ্ছা বেশ করিছিস্, অল্পে অল্পে দিস্। বাবার সহিত পাড়ার ছোট ছোট বউরাও আসিয়া কথা কহিত। কাহারও শাউড়ি দজ্জাল; বউ আসিয়া নালিশ করিয়া গেল। বউ যে গাঁয়েরই মেয়ে। বাবা বলিতেন—আচ্ছা যা, আমি ধমকাইয়া দিব। অনেক ভাল মুসলমানের বাড়ীর মধ্যে গিয়া মেয়েছেলেদের সহিত আলাপ করিতেন। তারা নাকি বড় ভদ্রতা ও ভক্তি করিত। কেহ মোড়া আনিয়া দিত। কেহ বাতাস করিয়া দিত। বাবা মুসলমানী ব্যবহার জানিতেন। তিনিও সকলকেই আশীর্ব্বাদ করিতেন।

বাবা যখন বাড়ী হইতে কলিকাতায় আসেন লোকে তখন কাঁদিয়াছিল। বাবা বলিলেন, আমি জানিতাম না যে লোকে আমার জন্য কাঁদিবে।

আমার মাতাঠাকুরাণী এখনও জীবিত আছেন। তাঁহারও বয়স ৭০ এর উপর হইয়াছে। যতদিন বাবা বিদেশে ছিলেন, মা'র কোন কষ্ট ছিল না। দাস দাসীর অভাব ছিল না। কিন্তু আমরা ছোট ছোট, মা একা, গ্রামে আর পূর্ব্বের ন্যায় লোকজন পাওয়া যাইত না। তিনি বহুকষ্টে আমাদিগকে লালন পালন করিয়াছেন। আমার মধ্যম কনিষ্ঠ বলে—মা ম'লে আর আমাদের জন্য কেহ কষ্ট করিয়া মুড়ি ভাজিয়া দিবে না। কথা সত্য! স্নেহ মমতা বড় জিনিষ। মা'র কথা কি বলিব! বল্‌তে পারি না—মা'র অদৃষ্ট যেন বড় মন্দ!

* * * * * *

এখন আমার কথা বলিতে হয়। আহা আমার আমি উঠিতে উঠিতে ও উঠিল না! বড় সাধ ছিল, আমি উঠে গেলে সেই উপর হ'তে বিশ্ব টা কেমন দেখায় একবার দেখিব। তা মা দ্বার হ'তে

তাড়িয়ে দিলেন। ব্রহ্মধামের দ্বার দেখিয়া আমাকে ফিরিয়া আসিতে হইল। ইহা অপেক্ষা দুঃখের কথা আর কি আছে। তোমরা আমার দুঃখ কেহ বুঝিবে না। লোকের পতিপুত্র মরে, তাই পতিপুত্রের মরণ যে কি দুঃখের তা লোকে বুঝে। ধননাশ লোকে দেখে, তাই ধননাশদুঃখ লোকে বুঝে। কিন্তু আমার দুঃখ কেহ বুঝিবে না। কারণ এ দুঃখের দুঃখী বড় বিরল। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মাঘ গোয়ালপাড়ায় আমার পিতামহনির্ম্মিত বাসায় আমার জন্ম হয়। আমার জন্মের পূর্ব্বে আমার আরো দুটি অগ্রজ জন্মিয়াই মরিয়া যান। এজন্য আমার জন্মকালে অনেক ডাইন নিবারণের তন্ত্র মন্ত্র ব্যবহার করা হয়। আমার জন্মমাত্র সূতিকা ঘরের কোণ কাটিয়া আমাকে বাহির করিয়া তৎক্ষণাৎ ওজন করা হয়। আমি ওজনে পৌণে তিন সের হই। এই "পৌণে" আমার কোন কালে ঘুচিল না। তারপর মা আমাকে ক্ষুদ দিয়া কিনিয়া রাখিলেন, এজন্য আমার নাম ক্ষুদে। তখন পিতৃব্যদেব সংসারের কর্ত্তা; তিনি আমাকে বড় ভালবাসিতেন। আমরা শাক্ত হইলেও তাঁর কৃষ্ণে অনুরাগ ছিল। আমার রাশি নাম ভূবন হইলে ও তিনি আমার নাম কুঞ্জলাল রাখেন। পিতৃব্যের কথা আমার মনে পড়ে না। তখন আমি বড় শিশু।

আমি একটু বড় হইলে বাবার কাছে পড়িতাম। সেকালে ও আমি কখন পাঠশালে পড়ি নাই। মধ্যাহ্নে বাবার লম্বা লম্বা পুরাণ পাগড়ীর কাপড় দিয়া খাসী, পাঁঠা বাঁধিয়া টানাটানি করিতাম। মাকে ও খুব ভয় করিতাম, বাবাকে ও ততোধিক। বাহির বাড়ী প্রায় যাইতাম না। বাবা সকালে সঙ্গে করিয়া কাচারী ঘরে লইয়া যাইতেন। ২।৪ অক্ষর পড়িয়া তিনি অন্যমনস্ক হইলেই পলাইয়া

বাড়ীর মধ্যে আসিতাম। মাও মারিতেন। কিন্তু তাঁকে ছাড়িয়া যাইতাম না। এই ভাবে ৫।৬ বৎসর গেল।

গোয়াল পাড়ার ইংরাজী বিদ্যালয়ে ও আমি যাতায়াত করিতাম ; ঐ স্কুলের পথে স্কুলের বুড়া পণ্ডিতকে যে আমি জপ করিতে দেখিয়াছি তাহাতে আমার ঈর্ষা হয়। বৃদ্ধ পথের এক ধারদিয়া যাইতেছেন। মাথা বাঁদিকে কাত। হাত বুকের কাছে। ধীরে ধীরে পা ফেলিতে-ছেন, শরীর টের পায় কিনা। সে ত জপ নয় যেন ধ্যান। একতান—যেন চোখের উপর ধ্যেয় লাগিয়া আছে। আবার স্কুলে গেলেই বৃদ্ধ ভিন্নরূপ ধারণ করিতেন। বোধ হয় ওটি শিক্ষকতার একটি অনিবার্য্য অঙ্গ।

আমি স্কুলে বেশী পড়া শুনা করিতাম না। ৫।৬ বৎসর বয়স ঘুরিয়া ঘারিয়া বেড়াই, আর খোঁড়া সিন্ধু রাম হেড্ মাষ্টার কে উকি মারিয়া দেখিতাম। সিন্ধুরাম আসামী, খৃষ্টিয়ান হইয়াছিল বলিয়া জাতি জ্ঞাতিরা মারিয়া পা ভাঙ্গিয়া দেয়। তিনি হ্যাট্ কোট পড়িতেন দাড়ি রাখিতেন, রংটি গৌরই ছিল। স্কুল ব্রহ্মপুত্রের উপর, ওপারে "যোগীর গোফা"। দুধারে জেলখানার বাগান—একদিকে পুকুর ও গোয়াল পাড়ার পাহাড়, তাহার উপর শিবের বাড়ী ; পুকুরে একটি গণ্ডার বাঁধা থাকিত। কোথাও নদীর তীরে স্তূপাকার চুণের পাহাড় ; কাছেই কাচারী। কখন কখন কাহার পরমায়ু শেষ হইয়া আসিলে সেখানে ফাঁসীর আয়োজন হয়।

আমাদের বাসা ঠিক পাহাড়ের নীচে। পাহাড় পশ্চিমে। বাসা ও পাহাড়ের মধ্যে আমরা খেলাধুলা করিতাম। সূর্য্য একটু পাহাড়ের আড়াল পড়িলেই পাহাড়ের প্রকাণ্ড ছায়া বাসার উপর আসিয়া পড়িত। অকাল সন্ধ্যা উপস্থিত হইত। শৃগাল গর্ত্ত হইতে বাহির

হইয়া শব্দ করিত। পেঁচা ডাকিয়া উঠিত। সঙ্গীগণ বলিত, ভাই সন্ধ্যা হইয়াছে, চল বাড়ী যাই। সন্ধ্যা কিন্তু তখনও হয় নাই। হয়ত এক প্রহর বেলা আছে। বাসার উঠানে কখন হরিণ শিশু আসিত। একবার একটিকে আমাদের গোয়াল ঘরে আটকান হয়েছিল। গোয়াল ঘর সর্ব্ব পশ্চিম ঘর। আমাদের বড় ঘরের বারান্দা হইতে উল্লুক, বানর গাছে গাছে লাফালাফি করিতেছে দেখা যাইত। কাঠবিড়ালী লেজ ফুলাইয়া দেখা দিয়া চট করিয়া অদৃশ্য হইত। কত বন্য কুক্কুট আমাদের আস্তাকুঁড়ের ভাত খাইতে অসিত। কখন কখন নানা জাতি সাপ ও সজারু প্রভৃতি ও উঠানে আসিত। পাহাড়ের গায়ে নানাজাতীয় তরুলতা, তাতে নানা বর্ণের পাখী ডাকিতেছে ও খেলিতেছে। কোথাও বড় বড় পাথরের উপর দিয়া ঝরণা পড়িতেছে। বড় সুন্দর। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা আমি আমার জন্মভূমির কাছেই শিখিয়াছিলাম, আমি পিতামাতার নিকট শিক্ষার জন্য শাসিত হইলে ও তাঁহাদের বড় আদরের ধন ছিলাম। বাবার সুনাম ও প্রতিপত্তি ও খুবছিল। সহরের বিশিষ্ট ভদ্রলোকেরাও আমাকে বড় ভালবাসিতেন। শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র বাগচী মহাশয় আমাদের প্রতি-বেশী ছিলেন। তাঁহার প্রকাণ্ড গোলাপের বাগান ছিল। আমি একত্র এত ফোটা, শিশির সিক্ত গোলাপ কোথাও দেখি নাই। আমি শিশিরে ভিজিয়া ভিজিয়া তাঁহার অনেক ফুল সংগ্রহ করিতাম। গুণাভিরাম বাবু, ছোট সাহেব, তখন অপুত্রক। আমাকে বড় ভাল-বাসিতেন। তিনি প্রায়ই আমাকে ডাকিয়া পাঠাতেন। বাবা আমাকে পাঠাইয়াদিতেন, আমি আর তিনি খাইতে বসিতাম। তাঁর স্ত্রী পরিবেশন করিতেন। তাঁদের বাড়ীতে তাঁর স্ত্রী তাঁতে কাপড় বুনিতেন। আমি যখন স্কুল হইতে জল খাইতে নরসিংবাড়ীতে

যাইতাম, পূজারী তিলের লাড়ু দিয়া জল দিত। ঝরণার জল ইন্দারায় পড়ে। সে যে জল নির্ম্মল ও শীতল। নিকটে বাঁধান চৌবাচ্চা; সব পাহাড়ের উপরে। তার মধ্যে সব মাছ খেলা করিতেছে। ঘন গাছের ছায়া, গ্রীষ্মে এমন মনোরম স্থান আর দেখি নাই। বাবার চা বাগানের অংশ ছিল। কখন হাতীতে কখন বা সাদিরাম কেরাণীর বোটে আমরা বাগান দেখিতে যাইতাম। নৌকায় গেলে, ব্রহ্মপুত্রের জলের আঘাতে আঘাতে কুলের পাথর গুলিতে বড় বড় ছিদ্র হইয়াছে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতাম। একদিন ফিরিয়া আসিতে রাত্রি হইল। আমরা কাচারীর কাছে নামিলাম। সেখানেই মাল খানা। উঠিতেই সিপাহী বলিল "হুকুমদার"। কেরাণী বলিলেন, "বস্তিওয়ালা"। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ও কি বলে, বাবা বলিলেন, who comes there—কে আ'সে? না, সহরবাসী। কেন বলে? তিনি সব বুঝাইয়া বলিলেন। বাবা কিছু কিছু ইংরাজী জানিতেন। যৎসামান্য।

আমরা কখন কখন পাহাড়ের উপরে বেড়াইতে যাইতাম। উপরে উঠিলে নীচের বাড়ী ঘর ছোট ছোট দেখাইত। আমাদের বাসার সোজা সুজি আসিয়া, ঐ আমাদের গোয়াল ঘর না রে? ইত্যাদি পরস্পর বলাবলি করিতাম।পাহাড়ের গায় কাটা লাল রাস্তা। তাতে কোথাও ঝরণা বহিতেছে। তাতে জল ধরিবার জন্য নল লাগান আছে। উপরে একটু স্থান সমতল, সেখানে প্যারেড হয়। সময় সময় খেলা হয়। বানরকে কলা ও ঘি মাখান বাঁশে উঠিতে দেওয়া হইত। একটা পাত্রে জল দিয়া তাতে একটী টাকা ফেলিয়া দিত। একজন ব্যাটারী দ্বারা বিদ্যুৎ চালনা করিত। যে পার টাকা লও। খুব তামাসা দেখা যাইত।

পাহাড়ের উপরে সাহেবদের কুঠি। বড় সাহেবের, পুলিশ সাহেবের। সাহেবদের বাড়ী ঘর যেমন হয়। পরিচ্ছন্ন। ওখানে এক দেবতা আছেন, তাঁর নাম শ্যামসুন্দর। একরকম কৃষ্ণবিগ্রহ। ওদেশের লোক সব বৈষ্ণব। তারা বড় বড় করতাল বাজাইয়া, ভয়ানক শব্দ করিয়া, নাম ধরিত। নাম ধরাটা কীর্ত্তন। কাছেই শ্যাম সুন্দরের ডোবা। ব্রহ্মপুত্র দূরে বলিয়া আমরা প্রায় তাহাতেই স্নান করিতাম। তাহার ও ধার বড় গভীর ছিল। পূজার সময় আমাদের গ্রামের জেলেরা আমাদিগকে আনিবার জন্য নৌকা লইয়া যাইত। আমরা তাহাদের দ্বারা খেপলা জালে ঐ ডোবার মাছ ধরাইতাম।

এই রূপে আমার বাল্যকালের খানিকটা অতি সুখে গোয়াল পাড়ায় কাটিয়াগেল। ইতি মধ্যে বাবা তেজপুর বদলী হইলেন। মেজদাদা আমাদিগকে বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য নৌকা লইয়া উপস্থিত হইলেন। আমরা দ্রব্যজাত, যা তা মূল্যে বিক্রয় করিয়া বাড়ী আসিলাম। বাড়ী ও প্রায় ৩। ৪ বৎসর ছিলাম। আমাদের গ্রামে ভদ্রলোকের বাস অতি সামান্যছিল। বাড়ীতেই বাংলা স্কুল ছিল, তাহাতে পড়িতাম। নাম পড়া। খেলাধূলা করিয়া বেড়াইতাম। তখন গ্রামে বড় সুখ। তখন গ্রামে খুব সুখ। এখন ছেলেরা খেলা করেনা। বাপের সাথে রোজগারে যায়। নৈলে পেট চলে না। তখন তা ছিলনা। গ্রামের নীচে প্রকাণ্ড পদ্মা। কত ষ্টীমার যাইতেছে। বর্ষায় বাড়ী ঘর ভাঙ্গিয়া নিতেছে। মাছমারা। খেজুরের সাঁজে রস খাওয়া। আমখাওয়া। সুপারির খোলার পালোয়ার নৌকায় পাল তুলিয়া পদ্মায় ভাসান। ডুগ্ ডুগ্, কাক উড়ানী, কড়িমঞ্জরী, বড় রাস্তার ধারে বটপাকড়ের নীচু ডালে ঘোড়া ঘোড়া খেলা আর

রাত্রে সরকার বাড়ী সখীসোণার গীত। কালী গড়িয়া কলাগাছ কচুগাছ বলিদেওয়া, কখন জাঁকাল পূজায় তরমুজ আনিয়া বলি দিয়া ভক্ষণ। লাটীমের সময় লাটীম, ঘুড়ির সময় ঘুড়ি। বর্ষায় দোয়ার পাতিয়া মাছ ধরা, এতেই সময় কাটিয়া যাইত। পল্লীগ্রামে ক'টা ঋতু যেমন উপভোগ করা যায় এমন আর কোথাও নয়। মানুষ কালের সঙ্গে প্রকৃতির অবয়ব হইয়া যায়। গ্রীষ্মের কালীঞ্জীর মেঘ এখনও ভুলিতে পারি না। তখন যেমন ঝড় হইত এখন তেমন হয় না। ঝড় আসিলেই দাসের বিটী বুড়ী (আমাদের একটী প্রাচীন চাকরাণী) বলিত, "হেল্লার ঘর ভ্যাল্লার দুয়ার পবনদেব রক্ষা কর" কোনবার মণ্ডপ পড়িয়া প্রতিমা পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া যাইত। পূজার সময় তখন বড় আনন্দ ছিল। পূজা আসিতেছে, ইহাতেই আনন্দ। প্রথম দেখা দিত ছুতার। অনেক আগে একদিন বাইশ কাঁধে করিয়া উপস্থিত। আমার সে বলরাম মিস্ত্রীর কথা আজও মনে আছে। তার সকল মাথায় টাক পিছনে এক জটা। প্রথম কাঠাম আরম্ভ। অমনি পাড়ার ছেলে জুটিয়াগেল। ছুতারের কাঠ ধরিতেছে, গল্প করিতেছে। তারপর কুমার। আমাদের কুমারছিল নিমাই পাল। নিমাই বড় সুন্দর মূর্ত্তি গড়িত। বুঁদিয়া গাঁথা ও একমেটে একসময়। গ্রামের অনেক ছেলে, যাদের একটুক না বিদ্যার ভাব থাকে, তারা সাথে সাথে কাজ করে। শেষে দেখিয়াছি তারাও বেশ মূর্ত্তি গড়িতে শিখে। তারপর দোমাটিয়া ও রংকরা, তখন পূজা উপস্থিত। নিমাই দীপ ধরিয়া রাত্রে চিত্র করিত—সময় পাইয়া উঠিত না। ২। ৩ বাড়ী চিত্র করিবে। গ্রামের লোকেরা কড়াতে আমলা ভিজাইয়া প্রতিমার চুল রঙ্গাইতেছে। শুকাইয়া টানিয়া চুলের আকার করিতেছে। তেঁতুলের বীজ সিদ্ধ করিয়া কাঁই করিতেছে। এসব হইতেছে। এদিকে চাকর-

দের রঙ্গপুর ও গোয়াল পাড়া হইতে আসা আরম্ভ হইল। এখন গ্রামে গিয়ে দেখি নদীর ধারে সবনৌকায় কাটা নিশান ও টেকারা। ঘন ঘন টিকারা বাজিতেছে। আজ বড় বাড়ীর নৌকা, কাল সরকার বাড়ীর নৌকা, এদিন মুন্সী বাড়ীর নৌকা ঘাটে আসিল। মধ্যে পূজার দ্রব্যজাত, ছয়ের উপর পাঁঠা ভ্যা ভ্যা করিতেছে। গ্রাম বাসীর আনন্দের আর সীমা নাই। যদি তখন ফটোগ্রাফ থাকিত আর ঐ সময় ঘাটের ফটো রাখা হইত, তবে এক ঘণ্টায় যে আনন্দের মূর্ত্তি আমরা দেখিতাম এখন ১০ বৎসরেও তা দেখা যায় না। অমন এক পরিবারের ভাব গ্রামে এখন আর হয় না। সে কাল আর নাই। সে বিশ্বাস নাই, সুখ নাই, ভালবাসা নাই। তার পর পূজা। বিল্বপত্র বাছা হইতেছে। কেহ বিল হইতে পদ্ম আনিতেছে। নৈবেদ্যের চাউল ধোয়া হইতেছে। নৈবেদ্য সাজান হইতেছে। কেহ কলাকাঁদ বাতাবী-লেবু ও রচনার হাঁড়ি সাজাইতেছে। পুরোহিত যে বাড়ীর যে কল্প, সেই অনুসারে চণ্ডী পাঠ করিতেছেন। আমরা বসিয়া তাহা শুনিতাম সেই স্বরে কি যেন একটা ভাব চিরদিন গাঁথা আছে তাতে কাণে বর মিষ্ট লাগিত। যেমন কাল মেঘ দেখিয়া আনন্দ—পদ্মার স্রোতে আধ বিঘা এক এক চাপ ক্রমে নামিতে নামিতে হুস্ করিয়া প্রলয়োচ্ছাসে ডুবিতে দেখিয়া আনন্দ—হৌক না কেন সে নিজের বাড়ী। সেই রকম একটা আনন্দ। বড় হইলাম, সেই চণ্ডী, সেই নীলমণি ঘোষাল কিন্তু এখন দেখি পুরোহিত পড়িতেছে—"ভ্রূকুটিভী········ ষণাননা।" আহা অমন কাল কি আর আছে। বাল্যকালের মত আর কাল নাই। অকপট, বিশ্বাসী, সরল প্রকৃতির পুত্র, অহংশূন্য।

এদিকে প্রতিমা রং করা সাজান ঘামান হইয়া গেল ও পুরোহিতের নবপত্রিকা মহাস্নান ও পূজার সম্ভার সব জুটিল। ঢাক বাজিল, পূজা

হইল, বলি হইল, গ্রামের লোক আনন্দে মাতিল। একদিনকার আরতির কথা আমার মনে পড়ে। একদিন আমাদের বাড়ী আরতি হইতেছে। আমাদের গ্রামের রাজচন্দ্র (এখন ডাক্তার) আমাদের খেলার সাথী, হঠাৎ মণ্ডপে লাফাইয়া উঠিল। আর এক ধুনচী লইয়া প্রতিমার চারিদিকে উন্মত্তের মত ঘুরিতে লাগিল। সকলে তাহাকে ধরিল, সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। কালীনাম করিলেই তাহার আবেশ হইত। আমাদের গুরুদেব রক্ষাকর তপস্বী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, একটি বোয়াল মাছ আর কি কি দিলে শনি মঙ্গল বারে শ্মশানে পূজাদিয়া তিনি ভাল করিয়া দিবেন। পরে নাকি তাই করিয়া আরাম করিয়া ছিল।

পূজা হইয়া গেল। বিজয়ার বিসর্জ্জন, বাইচ ওআড়ং এ আমরা খুব আনন্দ উপভোগ করিতাম। ফেণী বাতাসাই কত মিঠা। বিজয়ার পর লাঠিখেলা একটী দ্রষ্টব্য ব্যাপার। পাবনা জেলার লাঠিয়াল বিখ্যাত, বিশেষ হাটখালীর লাঠিয়ালের খুব নাম ছিল। তখন ভদ্রলোকেরাও লাঠিখেলা শিখিতেন। তখনকার লোকের অভিমান, তেজ ও বীরত্ব ছিল। আজ যার যে যোগ্যতা তাহা দেখাইবার দিন। "ঐ হাত আর বা হাত" এর সাথে সাথে লাঠির আগায় আগায় যেন আমার চক্ষু ঘুরিত। তাদের উৎসাহ দেখিয়া ইচ্ছা হইত আমি ও আসরে নামি। আমাদের আনন্দধোপা বেশ লাঠিখেলিত। একবার তাহাকে খেলার জন্য সকলে টানাটানি করে, কিন্তু সে কিছুতেই খেলিবে না। শেষে খেলিতে আরম্ভ করিল—তার কাঁধের উপর একখানা ছোপান পাকা গামছা ছিল। হঠাৎ প্রতি-পক্ষের লাঠির আগায় বাধিয়া শূন্যে উঠিয়া পড়িল। এই গামছা মাটীতে পড়িতেই দিল না। খেলাও হইতেছে গামছা ও উপরে

থাকিয়া যাইতেছে। লাঠি সখের খেলা ছিল না। লাঠিতে সুশিক্ষিত না হইলে আত্মরক্ষার উপায় ছিল না। আমাদের দেশ টা ডাকাতে পূর্ণ ছিল। খেতু পাড়ার গোপীনাথ বাগচী ও বড় খাপুরের বাঞ্ছারাম জোয়াদ্দার ডাকাতি অপরাধে জেলে ছিল, একথা অনেকে বলে। পাবনা জেলার দুইদিকে ভারতের দুইটী সর্ব্বপ্রধান নদী, মধ্যে কতকগুলি বিল। এ অঞ্চলে ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে গামছা মোড়ার এত ভয় ছিল যে পাঁচটী টাকা লইয়া নাজিরগঞ্জ যাওয়া যাইত না। তাহারা মধ্যপথে কালীবাড়ীর নিকট পথিক দিগকে বধ করিত। বাঞ্ছারাম জোয়াদ্দার গামছা মোড়ার দলের সর্দ্দার ছিল। তাহারা স্থলে ও জলে ডাকাতি করিত।

বাইশ কোদালে (গোয়ালন্দের ত্রিমোহনা) প্রভৃতি স্থানে পান্সী ও ছিপ লইয়া, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র (যমুনা) ও মেঘনা, তিন পথেই যাতায়াত করিত। বাঞ্ছারাম বড় লোকের সাজসজ্জায় একখানি পান্সী নৌকায় থাকিত। তাহার আসবাব দেখিয়া একজন বড় লোক বলিয়া বোধ হইত। বাঞ্ছারামের সম্বন্ধে ছড়া ছিল, যে সব প্রাচীন লোক তাহা জানিত তাহারা আর জীবিত নাই, আমি দুই লাইন মাত্র পাইয়াছি তাহা এই :—

মধ্যে বসে তাকিয়া ঠেসে—
দুই মুড়া তার কোল বালিশ।

ইহাতেই বুঝা যায়, বাঞ্ছারাম নৌকা যাত্রীদিগকে প্রতারিত করিবার জন্য খুব বাবু আনা চালে চলিত। কোন ধনীর নৌকা দেখিলে দুখানা ছিপ্ দ্রুত বাহিয়া তাহার দুই পাশে উপস্থিত হইত এবং তাহাদিগের সর্ব্বস্বান্ত করিত। বাধাদিলে সর্ব্বস্ব লইয়া যাত্রীদিগকে বধ করিত এবং নৌকা কুড়লির আঘাতে ডুবাইয়া

দিত। সন্ধ্যার সময়ে যেখানে নৌকার বহর লাগিত, ডাকাতেরা তথায় এক অদ্ভুত কৌশলে স্বকার্য্য সাধন করিত। হরির লুট হইবে শুনিলে হিন্দুমাত্রই তাহাতে যোগ দেয়; এজন্য তাহারা একটা খালি হাঁড়ীর মুখে কাপড় বাঁধিয়া নৌকার লোকদিগকে বলিত, এই ঘাটে হরি নাম হইবে ও বাতাসা লুট দেওয়া হইবে; তোমরা সকলে চল। এই সম্বন্ধেও একটা ছড়া আছে।

বাঁধে খালি হাঁড়ির মুখ
এ বড় কৌতুক।
বলে তোরা আয় সবে
দেই হরির লুট॥

নৌকার বহর জনশূন্য হইলে, একদল গিয়া সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইত। প্রবাদ এই যে, বাঞ্ছারামের আদেশ ছিল "সারে থো"। একবার এক যাত্রীর নৌকা দেখিয়া, ডাকাতের দল আক্রমণের অনুমতি চাওয়ায় বাঞ্ছারাম বলে "সারে থো"; তাহারা যাত্রীদিগকে বধ করিয়া জিনিসপত্র সব লইয়া আসে। বঞ্ছারাম গিয়া দেখে যে তাহার লোকেরা তাহার জামাতাকে বধ করিয়াছে। তখন বলিল, আরে সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্;—এযে আমার জামাইর নৌকা। তাহারা বলিল, কর্ত্তা আপনি সারিয়া থুতে বলিয়াছেন, আমরা সারিয়াছি। বাঞ্ছারামের মেয়ে স্বামীর গাড়ু দেখিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করে, বাবা, এ গাড়ু কার। বাঞ্ছারাম বলে, মা, ওকথা আর জিজ্ঞাসা করো না। তখন মেয়ে স্বামী বধের প্রতিশোধার্থে পিতাকে ধরাইয়া দেয়। ডাকাতের মাল লইবার লোকও নিকটে নিকটে নৌকায় থাকিত; রাত্রি হইলে মাল লইয়া আসিত। একজন থানদারের নাম ফকির চাঁদ বনিক; বাড়ী ছিল গোবিন্দপুর। তখন দেশে বিলাতী ঘুন্‌শী ছিল না। শণ-

পাটের সুতা কাল করিয়া তাহাতে গাবের আটা দিয়া পাকা রং করিয়া বেণেরা বিক্রয় করিত। ইতর ভদ্র তাহাই কোমরে দিত। ফকির চাঁদ ডাকাতীর স্থানের নিকট এক নৌকা লইয়া রাত্রিতে অপেক্ষা করিত এবং নৌকায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া জেলেদের ন্যায় ঐ ঘুন্‌ণীর সূতা পাকাইত। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করিত, এ কাহার নৌকা; সে উত্তরে বলিত, ফকিরচাঁদ হালদারের নৌকা। লোকে মনে করিত, জেলেরা নৌকা ভাড়া খাটিতে যাইতেছে। বাঞ্ছারামের দল হুগলী জেলে থাকিত; পূজার ২।১ মাস পূর্ব্বে, আরও ডাকাইত ধরাইয়া দিব বলিয়া স্বগ্রামে আসিত এবং অনেক ধনীকে ভয় দেখাইয়া কিছু আদায় করিয়া, সেই টাকায় আমোদ আহ্লাদ করিয়া পূজার পর আবার হুগলীতে যাইত!

আমাদের দেশের লোক খুব জানশক্ত; যাকে বলে প্রাণসার। অন্য জেলার জেলে যে জলে নৌকা ধরে না, পাবনা নদীতীরের গৃহস্থ তাতে অনায়াসে চ'লে যায়। তেমন জোয়ান আর দেখা যায় না; আগেকার মত খাইতেই পায় না। না মাছ, না ভাত; তাতে পেট হ'তে পড়ে অবধি রোগ। তখন এক কোকারাম বিশ্বাস কবিরাজ, এখন ২।১ গাঁ অন্তরই ডাক্তার; সকাল বেলা দেখ গিয়া ধামাভরা শিশি নিয়ে এক এক গৃহস্থ উপস্থিত।

ভদ্রলোকই অন্নাভাবে দুর্ভিক্ষক্ষীণ, মানুষের মত নয়; শুকাইয়া যাইতেছে। আগে একটা কথা ছিল, বস্ত্রহীন অলঙ্কার আর ঘৃতহীন ভোজন শোভা পায় না। এখন বস্ত্র নাই আর অলঙ্কার। ভোজন নাই তার ঘৃত। এখন অন্নাভাবই দেশের রোগ। ইহাতে জাতির অস্থি মজ্জা শুকাইয়া যাইতেছে। ঋষি বলেছেন, "প্রাণা বা অন্নম্" অন্নটা কি কম জিনষ। ঋষি বলেছেন, "তৎবলম্" "তৎসর্ব্বৌষধং।" যে

কোন প্রকারে (যয়া কয়া বিধয়া) অন্ন চাই। বাঁচিতে হ'লে এবং মানুষ হ'তে, মাত্র নরাকারে নয়, মানুষের মত মানুষের আকারে, যা আমি বাল্যকালে দেখেছি, অন্ন চাই! এবং অন্ন চাই বলিয়াই মানুষের ধর্ম্ম চাই। বিনা ধর্ম্মে দু'দশ দিন হইতে পারে, চিরদিন অন্নলাভ হয় না।

তৎ এতৎ ক্ষত্রস্য ক্ষত্রং যৎধর্ম্মঃ। তস্মাৎ ধর্ম্মাৎ পরং নাস্তি। ধর্ম্ম-উগ্র-অপেক্ষা ও উগ্র, ধর্ম্মাপেক্ষা বলবান কিছু নাই। সে ধর্ম্ম কি? যো বৈ স ধর্ম্মঃ সত্যং বই তৎ। সত্যই সে ধর্ম্ম। ধর্ম্ম বল, বলে অন্ন। তাই বলদেবের ঘাড়ে লাঙ্গল। আর তিনি কৃষ্ণের, পূর্ণজ্ঞানের, অগ্রজ! অন্নকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিবে, তবে অন্ন পাইবে। "সর্ব্বং বৈ তে অন্নং আপ্নুবন্তি, যো অন্নং ব্রহ্ম উপাসতে। অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠং"। আগে গাই এর পালানে দুধ হয়, তারপর বাছুর জন্মে। তাই অন্ন প্রাণীমাত্রের অগ্রজ। "তস্মাৎ সর্ব্বৌষধং উচ্যতে"। অন্ন না থাকিলে ক্ষুধাগ্নিতে সবপ্রাণী দগ্ধিয়া দগ্ধিয়া মরিয়া যায়; তাই অন্ন সর্ব্বৌষধ। পিতৃগণ অন্নের মহিমা জানিতেন,-জানিতেন অন্ন প্রাণের মূল, কর্ম্মের মূল, ধর্ম্মের মূল। মা বৈশ্বানররূপিনী জঠরে আছেন; পিতৃগণ অন্ন চাহিয়া লইয়া তাহাতে আহুতি দিতেন। কলিকালে মা আরো প্রকাশ,—জিহ্বা দেখাইয়া বলিতেছেন—বৎস, আমি ক্ষুধার্ত্ত, এখানে অন্নদাও; অন্ন পাইবে। জীবের বৈশ্বানরে আহুতি দেও, হব্য পাইবে। দিলেই পাওয়া যায়। চাহিলেই পাওয়া যায়। চাও, পাইবে; বরদাস্মি, বৎস আবার বল ঃ—

অগ্নির্জ্যোতিঃ জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহা
অগ্নির্বর্চ্চঃ জ্যোতির্বর্চ্চঃ স্বাহা।

কর্ত্তারা লোকজনকে খাওয়াইয়া গ্রামের দুঃখীদিগকে বস্ত্রাদি দিয়া পরিতুষ্ট করিয়া কর্ম্মস্থানে রওনা হইলেন। আবার গ্রাম যেমন

তেমনি। কিন্তু গ্রামের নিজস্ব গ্রামেই থাকে! সেই স্রোতোবহা নদী, সেই মাঠ, সেই আকাশ, সেই চাঁদ, সেই সখিসোণার গান, পদ্মপুরাণ। মানুষ যায় আসে, কিন্তু একটা নিত্য আনন্দ স্রোত, যে টা যার নিজস্ব, তা চিরদিনই থাকে। সব যায়গাই আনন্দময়ীর ক্ষেত্র, তিনি তা আনন্দছাড়া করেন না। আনন্দটা প্রাণ, নইলে জীব বাঁচিত না। আহা, ঋষিরা প্রাণে প্রাণে ঐটা খুব দেখিতেন। তাঁদের চোকটা ঐ দিকই থাকিত। তাহাতেই তাহাদের দিব্যচক্ষু ঐ টার রঙ্গেই রঙ্গিয়া যাইত।

সরল পল্লীবাসীর তৎকালের নানা সুখস্বচ্ছন্দের মধ্যেও চারিটী প্রধান দুঃখ ছিল। তার একটী এখনও আছে! প্রথম দুঃখ, নীলকরের অত্যাচার। দ্বিতীয়দুঃখ, পল্টনের অত্যাচার। তৃতীয়দুঃখ, পুলীসের ভয়। চতুর্থদুঃখ জমিদারের ভয়। আমার অতি শৈশবে এ দেশ নীলকরে ছাইয়া গিয়াছিল। সেই অতীত অত্যাচারের চিহ্ন শিয়াল শূকরের আবাস, ভাঙ্গা কুঠিগুলি বনজঙ্গলে মুখ ঢাকিয়া স্থানে স্থানে পড়িয়া আছে। নীলকরেরা যে পাট্টা লিখিয়া লইত, তাহার একখানি আমি দেখিয়াছি। তাহাতে লেখা ছিল, আমি অমুক দেবশর্ম্মা আমার এত বিঘাজমি নীল বুনানী করিব; তজ্জন্য এত টাকা লইয়া এই পাট্টা লিখিয়া দিলাম!

নীলকরেরা ভয়ানক অত্যাচার করিত। চাষা ক্ষেতে লাঙ্গল দিতেছে; তাহাকে ধরিয়া লইয়া নীলের ক্ষেত চাষ করাইত। নৌকার মাল্লা গুন টানিয়া যাইতেছে, তাহাকে ধরিয়া নীল কাটাইত। ঘাটে নৌকা বাঁধা আছে; হয়ত কাল ধানের ব্যাপার করিতে যাইবে। নীলকরের লোক নীল বোঝাই করিতে খুলিয়া লইয়া গেল। ভদ্রলোক পাল্কীতে যাইতেছেন, বেহারাদিগকে নীল কাটিতে

বসাইয়া দিল। ভদ্রলোকটীকে বলিল, তুমি নীলকাটিতে না জান আটী বাঁধ।

আমাদের শক্র আমরাই। নীলকর গ্রামেই দেওয়ান, মেরধা, পাইক, সর্দ্দার সবই পাইত। কিন্তু তাহারা স্বগ্রামবাসীর হাতে মারও খাইত। আমার বাল্যকালে নীলকর আমাদের অঞ্চল হইতে দূরীভূত হয়। যাহারা তাড়াইল, তাহাদের কেহ কেহ এখনও জীবিত আছে। সেই সব লড়াইএর গল্প যখন তাহারা বলে, শুনিতে বেশ লাগে ঃ—কুঠীয়ালেরা সর্দ্দার লইয়া বিরোধী গ্রাম আক্রমণ করিত এবং গ্রামবাসীরাও সর্দ্দার লইয়া তাহাদিগকে তাড়া করিত। দুই দলে সময়ে সময়ে ভয়ানক মারামারি হইত। সড়কী, লাঠী খুব চলিত। আর চলিত "উড়ে"। উড়ে হাত ৪ লম্বা বাঁশের একখানা চটা—আগাটা চাঁছিয়া সড়কীর ফলার মত করা। এবং আগার শেষটা খুব সরু। ফেলিয়া মারিলে ফলাটী গায়ে বিধিত এবং ভার সহিতে না পারিয়া সরু স্থানে ভাঙ্গিয়া শরীরে একটী শেল হইয়া থাকিত। কুঠীয়ালের দেওয়ান, তাগিতগিরি, মেরধা প্রায়ই মার খাইত। যে সকল ভদ্রলোক গ্রামবাসীকে কুঠীয়ালের কথা শুনিতে নিষেধ করিতেন, তাঁহাদের উপরই নীলকরের বড় আক্রোশ। তাঁহাদের উঠান পর্য্যন্ত চাষ করিয়া নীল বুনিয়া দিয়া আসিত।

নাজিরগঞ্জের কুঠী বন্ধ হইয়া গেলে, অনেক দিন পর তাহাতে একটী স্কুল বসিয়াছিল। আমি দিন কতক সেখানে পড়িতে যাইতাম। তখন দেখিতাম, একটী ঘোর কৃষ্ণবর্ণা বুনানীর কোলে একটী সুন্দর ফুটফুটে সাহেবের ছেলে। (বুনাণীর নাম কৃষ্ণমনি) এই বিপরীত আকৃতি দেখিয়া আমার বড় কৌতুহল হইত।

পরে বড় হইলে জানিলাম যে, ছেলেটী কুঠীর এম্বর (Ember) সাহেবের ঔরসজাত। ইহারা যে কি প্রকারের লোক ছিল, ইহাতেই বুঝিতাম। কুঠীয়ালের কাজিয়ার মামলা মোকর্দ্দমা প্রভৃতিতে যে খরচ হয়, তাহার প্রায় দু হাজার টাকা আমাদিগকে দিতে হইয়াছিল। বড় কম নয়, এখনকার আট হাজার টাকা।

এখন যেমন রেল হইয়াছে, তখন এদিকে রেল ছিল না। গোড়া ও দেশী পল্টন ষ্টীমারে ও নৌকায় যাতায়াত করিত। ইহারা অনেক গ্রামে নামিয়া অত্যাচার করিত এবং গোবধ করিত। আমাদের বাড়ীতে উচ্চ প্রাচীর ছিল; এরূপ ভয় উপস্থিত হইলে গ্রামের সমস্ত স্ত্রীলোক ও শিশু আমাদের বাড়ীতে রাত্রি কাটাইত। মূল্যবান জিনিষপত্র সব মাটীতে পুতিয়া ফেলা হইত। সে যে কি কালরাত্রি কাটীত, তা আমার বেশ মনে আছে। সারারাত্রি কেহ চক্ষু বুঁজিত না, একটু শব্দ শুনিলেই কানখাড়া করিত। পুরুষেরা কেবল ঘুরিতেছে। তখন সাহস ও বলবিক্রম ছিল। একবার আমাদের বাড়ীর নিকটে এক ব্রাহ্মণের গরু লইয়া গিয়া তার বাড়ীর নিকটে কাটিতে উদ্যত। ব্রাহ্মণ গিয়া বলিলেন, আগে আমাকে কাট, তারপর আমার গরু কাটিও। ব্রাহ্মণের ভাব দেখিয়া তাহারা তথা হইতে চলিয়া গেল। লোকের তখন অন্ন ছিল, অর্থ ছিল না। সুতরাং সাধারণ প্রজার উপর বেগার ধরা প্রভৃতি ছাড়া পুলিশের বিশেষ জুলুম ছিল না। তাহারা ধনীর নিকট হইতে লইয়া বড় মানুষ হইত। একজন দারোগা লক্ষ টাকা রাখিয়া যাইত।

জমিদারগণই তখন প্রজার হর্ত্তাকর্ত্তা ছিলেন। মার্ ধর্ বাজে আদায় যথেষ্ট হইত। আবার এমন ও হইত মারিয়া ২৫৲ টাকা লইয়া ১০০৲ টাকা বাকি খাজনা মাপ হইয়া গেল, ইহাতে প্রজা

অসন্তুষ্ট হইত না। শরীরের উপর দিয়া তাহাদের সবই যায়। সুতরাং ইহাতে তারা সুখী হইত। প্রজাকে জমিদারের বেগার দিতে হইত। জমিদারের নিকট সাধারণ ভদ্রলোকের কোন ও সম্মান ছিল না, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের চাকরী করিলে তাঁহাদের বিশেষ সম্মানের পাত্র হইতেন। জমির এত আদর ছিলনা। পাট কেহ বুনিত না। গরুর দড়ি হইবে, এই জন্য দু পাচ কাঠা লাগাইত।

১১ যখন ১১ বৎসর বয়স, তখন কোনও আত্মীয়ের সঙ্গে আমি কলিকাতায় পড়িতে গেলাম। আমার (জেঠাত) দাদা সেখানে পড়িতেন। প্রথমবার বড় স্ফূর্ত্তির সহিত গেলাম। খুব উৎসাহ— কলিকাতা দেখিব। সেখানে গিয়া কূপের ব্যাঙ্ সমুদ্রে পড়িলাম! কত কি দেখিলাম। সে এক নূতন প্রকাণ্ড ভাব উপস্থিত হইল। কিন্তু ক্ষণিক। পরদিনই বাড়ীর জন্য, মায়ের জন্য, প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। ঐ হরিত শোভাহীন নিরবছিন্ন পোড়ামাটীর স্তূপ এ চক্ষুকে আর আকর্ষণ করিতে পারিল না। আর বাসা যেন জেলখানা। বাহির হইলেই পথ ভুলার সম্ভাবনা। কি করি দিনে বড় কষ্টে থাকি। রাত্রে বাড়ীর জন্য, মার জন্য, জেঠীমার জন্য কাঁদি। একটী ছোট ভিটার উপর ২।৩ টা ফুলের গাছ পুঁতিয়াছিলাম। তাদের জন্য পর্য্যন্ত মন উৎসুক হইত। দাদা আমাকে গোলদীঘীর দক্ষিণে রাজকৃষ্ণ মিত্র নামক একব্যক্তির এক ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। পড়ি টড়ি থাকি। আমার জন্য ভাত থাকে স্কুল হইতে আসিয়া তাই খাই। আমাদের বাসা ৫৮ নং পাটুয়া টোলার গলী। ৫০।৬০ জন ছাত্র থাকে। ওটা পূর্ব্ববঙ্গের ছাত্রেরই আবাস। আমি মাটি আনিয়া দোতালার উপর শস্য বুনিতাম। বর্ষায় জীর্ণ দেওয়ালের উপরে এক রকম তৃণ হয়

তাহা দেখিয়া বড় আনন্দ হইত। পাতকূয়ার জলে স্নান ও গোলদীঘীর জল খাওয়া হইত। রাস্তার দুইদিকে আলকাতরার ন্যায় কাল ক্লেদপূর্ণ নর্দ্দামা। ঠন্ ঠনের কালীবাড়ীর সামনের নর্দ্দামাটা প্রস্থে ৪।৫ হাত ও ৩ হাত গভীর ছিল। একদিন দেখি একটা ঘোড়া প্রায় ডুবিয়া গিয়াছে। আমাদের ঝি গোদা ছিল। গোদ ও গলগণ্ড কলিকাতায় গিয়াই প্রথম দেখি। সে আবার আফিং খাইত। এজন্য আমাদের জলোদুধে জলদিয়া সে আবার কিছু অংশ বাহির করিয়া লইত। সেবার বাড়ী গেলাম। দাদার পরীক্ষা, তিনি এলেন না। কে লইয়া যাইবে বলিয়া, সেবার আমার বাড়ী হইতে যাওয়া হইল না। আমার বড় আনন্দ। দাদা পৌষ মাসে পরীক্ষা দিয়া আসিলেন। এবার আমাকে আবার লইয়া যাইবেন। তখন কুষ্টিয়া ডাকদহে রেল। নৌকায় দেড় দিন দুই দিন যাইতে হইত। আমাকে ধরিয়া সকলে নদীর তীরে আনিলেন। আমার কাঁদা দেখে কে! আমার বড় মা (পিতৃব্য পত্নী) আমাকে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি বলিতেন, কুঞ্জের বড় মায়া, কোন মেয়ে, শ্বশুরবাড়ী যেতে এত কাঁদে না। আমি এর আঁচল ধরিয়া কাঁদিলাম, ওর আঁচল ধরিয়া কাঁদিলাম। শেষকালে দাদা ধমক দিয়া জোর জবর করিয়া নৌকায় লইয়া যাইতেন। মা কত ক্ষীর, মুড়ি, চিড়া, চিনি, কলা কত খাদ্য দিতেন। আমার নৌকায় উঠিলেই বমি আসিত। আর অবিশ্রান্ত ক্রন্দন। দাদা বিরক্ত হইতেন। এইরূপে কিছুদিন যাতায়াত করি। এবার গেলে বাবার ইচ্ছামত আমাকে আমাদের একজন আত্মীয়, কালিয়ানিবাসী গিরিধর বাবু সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। আমরা দাস, গিরিবাবু আমার নাম বলিলেন গুপ্ত।

তিনি বলিলেন, কি বল খুড়ো 'গুপ্তই ভাল, এদেশের সব বস্তি গুপ্ত আর সেন। সেই অবধি আমি গুপ্ত হইলাম। নৈলে আমরা দাস। সংস্কৃত কলেজের লাষ্ট ক্লাশে ভর্ত্তি হইলাম। পড়ি শুনি থাকি। একজ্বালা বড় শক্ত জ্বালা হইল। আষাঢ়ের সুন্দর কাল মেঘ উঠিত। আমি আনন্দের অসংযমে বলিতাম, ভাই গ্যাখ্ কেমন কাল ম্যাঘ উঠিছে। ওরে বাঙ্গাল, ওরে বাঙ্গাল ম্যাঘ ম্যাঘ। একি দায় হ'লো। কোন দিন মুখবন্ধ করিয়া থাকিতে থাকিতে পারি না, তার জন্য যথেষ্ট লঞ্ছনাও পাইয়াছি। এই রকমে চলিল। ষষ্ঠ শ্রেণীতে বোধ হয় মুগ্ধবোধ আরম্ভ হইল। দ্বিতীয় শ্রেণীতে বোধ হয় আখ্যাত শেষ। পাণিনি তখন উঠিয়া গিয়াছে। আমি যখন ভর্ত্তি হই তখন প্রসন্ন সর্ব্বাধিকারী মহাশয় অধ্যক্ষ। বেণী বাবু, যাঁর পাটীগণিত আগেই চিনি, তিনি হেড্মাষ্টার। দ্বিতীয় শ্রেণীতে রামনারায়ণ পণ্ডিত মহাশয় পড়াইতেন। তিনি অনেক বড় বড় শ্রাদ্ধের বিদায় আদায়ের গল্প করিতেন। আর গল্প করিতেন, সর-বর-রস-মাধুরীর। কিন্তু নিজে বেশ কবিতা করিতে পারিতেন। এবং ছেলেদেরও কবিতা লেখিতে উৎসাহিত করিতেন। আমরা যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে, এখনকার রাজা, তখন প্রিন্‌স্ অব ওয়েল্‌স্ ভারতে আসেন। তখন অনেক ছাত্র সংস্কৃতে পদ্য লিখিয়াছিল। চাঁপাতলা দীঘির পশ্চিমে বিষ্ণুর বাড়ীতে আমাদের একটা ছোট ক্লাব ছিল, তাহাতে বসিয়া জয়দেবের অনুকরণে আমরা সকলে কবিতা লিখিতাম। অমি ভাল ছেলেও ছিলাম না মন্দ ছেলেও ছিলাম না

কৃষ্ণকালী, হরিদাস, ও নারায়ণ খুব ভাল ছেলে ছিল। আর বখার চুড়ামণি ছিল, অতুল ও গোড়াচাঁদ। গোরাচাঁদের রসিকতা

শুনিয়াছি; একত্র পড়ি নাই। সে একক্লাস উপরে পড়িত। পরে অতুল মুরগী হাটায় চুড়ীর দোকান দেয়। আমি যদি কখন কলিকাতায় যাইতাম, তাহার সহিত দেখা হইলেই প্রীতি প্রফুল্ল মুখে বলিত, "কিরে বাঙ্গাল, ভাল আছিস্" ? বড় মিঠা লাগিত। সেই সুখের বাল্যকাল যেন ফিরিয়া আসিত।

বিদ্যাসাধ্যি যা হবার হইল। বি, এ, পড়িতে প্রেসিডেন্সি কলেজে গেলাম। অম্লের ব্যাম হইল। আমার সব "পৌণে"। বি, এ, হইতে পারিলাম না। অঙ্কে কুলাইল না, চিরদিনই আমার হিসাব কম। তারপর বাড়ীতে দুই বৎসর রোগের চিকিৎসা করাইলাম। কিছু হইল না। এদিকে চাকরীর বয়স যায়। বাবা ও কিছু উদ্বিগ্ন হইলেন। এই সময় পাবনা স্কুলে একটী কাজখালি ছিল। আমি শিক্ষক হইলাম। প্রথম হই মাষ্টার, শেষে পণ্ডিত, সব যায়গায় "পৌণে"। এই শিক্ষকের কাজ ও আজ প্রায় ২৫ বৎসর করিতেছি। তা ক, খ পড়ান হইতে বি, এ, পর্য্যন্ত পড়াইতে হইয়াছে। কিন্তু বেতন আমার পৌণে। ছাত্র পড়াইয়া, কি বাড়ী হইতে, কি ভাইদের নিকট হইতে আনিয়া, পেটের অন্ন করিতে হইয়াছে। আমার রাজ সেবায় "নৈব চ নৈব চ"। কিন্তু এই দুঃখ মা আমাকে ইচ্ছা করিয়া দিয়াছিলেন, তাই তাকে ডাকিতে বড় সুখ হইত, ইচ্ছা করিত। অভিমান ও ছিল। কাঁদিতে কাঁদিতে ভাগবতের গান গাহিতাম— কিমজিতোইবতি নোপসন্নান্

কথং ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান্।

এমন অনেক দিন কাঁদিয়াছি। আমার পিতা ও মাতা দু'জনই বৃদ্ধ এবং আমার আয়ও সামান্য, এজন্য আমি পরিবার দিগকে কর্ম্মস্থলে আনিতাম না। এই ভাবে প্রায় ১৭।১৮ বৎসর কাটাইয়াছিলাম।

ইহাতে আমার পড়া ও উপাসনার অনেক সুবিধা হইতেছিল। বাবা বলিতেন, তুমি বড় উদাসীন, তোমার এসংসার চলিবে কিরূপে তা তুমি মোটেই ভাবনা। আমি বলিতাম, হবে এক রকম। তিনি বলিতেন, আর কবে হবে। শেষে ছেলেদের লেখাপড়া শেখার বয়স হইল। তখন অগত্যা সব লইয়া আসিতে হইল। এই সময় হইতে আমি সাংসারিক অনটনে পড়িলাম। ৪০৲ টাকায় আট নয় জনের ভরণ পোষণ কষ্টে চলিতেলাগিল। আমি ভাগবতে পড়িয়াছিলাম, **দরিদ্রেরই সাধুদর্শন হয়**। অভাবে পড়িয়াও মান করিতাম, যদি চাহিতে হয় মার কাছে অর্থ চাহিব কেন? "জীব দিয়াছে যে আহার দিবে সে" তার ব্যবস্থা তিনি একটা করিবেনই। অর্থের চেয়ে বড় কি কিছু নাই? জ্ঞান চাহিব, ভক্তি চাহিব। বিবেক বৈরাগ্য চাহিব। তাঁহার প্রিয়জনের সঙ্গ চাহিব। কিন্তু যখন অত্যন্ত অভাব, আর কুলায় না, তখন গাইতাম, "এমন অন্নপূর্ণা মা থাকিতে মোর ভাগ্যেতে একাদশী"। এও ভাবিতাম, যতদিন "আমি" ও "আমার" আছে ততদিন এদুঃখ যাবে না। চিন্তা জ্বাল কখনই ছাড়িবে না। আমি গাইতাম—

গেল না গেল না দুখের কপাল।
গেল না গেল না, ছাড়িয়া ছাড়ে না, মাসী হলো কাল॥
রামপ্রসাদের মনে এই বড় ত্রাস
জন্মে মাতৃকোলে না করিলাম বাস
পেয়ে দুধের জ্বালা শরীর হলো কালা
তোলা দুধে ছেলে বাঁচে কত কাল?

কখন কখন এই গানে জননী জন্মভূমি হৃদয়বেদিতে দেখা দিতেন। সে শস্যশ্যামলাকে দেখে কেঁদে ফেলতাম। ভাবিতাম আমাদের

মা'র স্তনে এত দুধ, কত লোক খেয়ে মোটাতাজা হইয়ে গেল কিন্তু আমরা এক ছিটা খেতে পেলাম না। মাতৃকোলে বস্তেই পেলাম না। প্রায় ১৫ বৎসর ৩৫৲ টাকায় কাটাই; একবার পেড্লার সাহেব অধ্যক্ষ এলেন; বন্ধুরা বল্লেন,—যাওনা, একবার দেখা কর গিয়া, কিছু না দেয়ও টাকাটা ত আর কেড়ে নিবে না। গেলাম। বলিলাম, আমি চাকুরীর স্বরু হতে কলেজে পড়াই; Higher duty করলে তোমরা বিবেচনা কর শুনি; অপর, এতে (তখন ৪০৲ টাকা পইতাম) আমার চলে না। সাহেব বলিল—Babu I had to wait *twenty-three years* for a lift, and you *must* wait. শুনে শরীর টা জ্বলে গেল। তাঁরা Service এর লোক, ৪০০৲ টাকায় আসেন, উনি এসেছিলেন একেবারে ১০০০৲ টাকায়; তাই ক্রফ্‌ট্ সাহেব ঝানু ছেলে, ওঁর কিস্মত বুঝিত, ২৩ বৎসর রেখে দিয়াছিল। আর কি ভদ্রতা, আর কথার মিষ্টত্ব। সংসারী, রুগ্ন, ফাঁদে পড়ে আছি। কিছু বলিতে পারিলাম না। কিন্তু সেই অবধি এক Edward সাহেব ভিন্ন কারো কাছে যাই নাই। তিনি ভালবাসিতেন, তাই যাইতাম। কিন্তু কাজের বেলা সব সমান। ভগবান দেনেওয়ালা। মন বুঝলেও পেটবুঝে কৈ? তাই দুঃখে গাইতাম—

পেয়ে দুধের জ্বালা শরীর হলো কালা
তোলা দুধে ছেলে বাঁচে কত কাল?

আমার ধর্ম্মজীবনের দুই চারি কথা এখানে বলা অসঙ্গত হইবে না। বাল্যকালে আমি যখন কলিকাতায় পড়িতাম তখন কেশব বাবুর জীবনের মধ্যাহ্ন। অনেক ব্রাহ্ম প্রচারক আমাদের বাসায় প্রায় নিত্য অতিথি হইতেন। রামকুমার (পরে যিনি স্বামী হন) প্রভৃতি আরও কত লোক আমাদের বাসায় খাইতেন। তখন

বঙ্গদেশের প্রায় সব ছাত্রই ব্রাহ্ম। সকলকেই মন্দিরে যাইতে হইত। আবার আমাদের বাসায় ও উপাসনার একটা ঘর ছিল। একটা ঘণ্টা ছিল। রোজ সন্ধ্যাকালে ঘণ্টা বাজাইলেই সেই ঘরে গিয়া উপাসনা করিতে হইত। সকলে যাইত, আমিও যাইতাম। কিন্তু বিশেষ কিছু বুঝিতাম না। তবে কাহাকেও কাঁদিতে দেখিলে কাঁদিতাম, এই পর্য্যন্ত। অনেক দিন এই ভাবে গেল। তখন বক্তৃতাটা খুব হইত। তখন হইতেই আচার বিচার উঠিয়া গেল। ছুটির সময় আমরা বাড়ী আসিতাম। তখন কুষ্টিয়া হইয়া নদীপথে আসিতে হইত। ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলার অনেক ছাত্র পথে আমাদের বাড়ী ২।১ দিন থাকিতেন। আমাদের বাড়ীর মেয়েছেলেরা রাঁধিত, তাঁদের মধ্যে অনেকে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহারাও অসংকোচে খাইতেন। কিন্তু মেয়েরা অন্নদিতে সংকুচিত হইত।

শেষে আমাদের বাসা ভাঙ্গিয়া গেল। নূতন বাসায় উপাসনা ঘর হইল। কিন্তু পরে উপাসনা যার যার তার তার হইয়া উঠিল। তবে বক্তৃতাটা এই বাসায় খুব আরম্ভ হইল। বাড়ীতে যে ধর্ম্মানুষ্ঠান ক্রিয়া কাণ্ড দেখিয়াছি, তাহার উপর ক্রমে অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা উপস্থিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বেই বাবা; আদি সমাজের কতক ভাব রক্ষা করিতেন। বাড়ীর স্ত্রীলোকেরাই খাঁটি হিন্দু ছিলেন। ধর্ম্মের ঐ দ্বৈত প্রকৃতিই আমাদের বাড়ীতে চলিতে লাগিল। অধ্যয়ন ও অনুষ্ঠান অভাবে ক্রমে ওদিকটা মরিয়া গেল। জীবনের যেটা প্রধান লক্ষ্য, ক্রমে সেটা দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল। এই ভাবেই দিন যাইতে লাগিল। তবে মধ্যে মধ্যে কাঁদিতাম। কলেজে পড়ার সময় ও কাঁদিয়াছি। যদি নিজের কোন একটী অসামর্থ্য

বা কর্ত্তব্যে অবহেলা দেখিতাম, সন্ধ্যাকালে তাহার জন্য অনুতাপ করিতাম। মনে মনে ভাবিতাম, বাবা এত দূরান্তরে লেখাপড়ার জন্য পাঠাইয়াছেন, অর্থ দিতেছেন, কোন অভাব নাই; আর আমি আমার কাজ না করিয়া এই করিতেছি। আমি ত বড় বিশ্বাস-ঘাতক কৃতঘ্ন। বোধ হয়, ব্রাহ্মসংশ্রবে আসিয়া আমার এই আত্মানুসন্ধান ও আত্মদোষদর্শনে অনুতাপ প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল। ইহাতে আমার বিশেষ উপকার হইয়াছিল। আমি কখনও কুসঙ্গে যাইতাম না। এই ভাবে বহুকাল গেল। রাজসাহী আসিলাম। এখানে আসিয়া নিজের কায করি আর পড়ি। এই সময়ে পাতঞ্জল দর্শন পড়িয়া আমার যোগে বড় বিশ্বাস হইল; এবং আসনাদির সহজসাধ্য অঙ্গ নিজে নিজে অভ্যাস করিলাম। আমার মনে হইত, ঋষিগণ মিছা কথা কেন বলিবেন। কি স্বার্থ? আর বলিতেছেন, এই কর, এই হইবে। না হয়, তখন বিশ্বাস করিও না। গন্ধ প্রতিষ্ঠায় দিব্য গন্ধানুভব হয়। চেষ্টা কর, হইবে। কিন্তু যোগের কৈবল্য আমার ভাল লাগিত না। তারপর সাংখ্যদর্শন ও কারিকা দুইই কিছু কিছু পড়িলাম। গুণত্রয় বুঝিবার চেষ্টা করিতাম কিন্তু পারিতাম না। আর জড় হইতে জগৎ একথাও মনে ধরিত না। ত্রিগুণ কি, গীতার শঙ্করভাষ্য পড়িয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম। তখন দেখিলাম সাংখ্যেরস্থষ্টিপ্রক্রিয়া বেশ সুন্দর। আর দুঃখের দিক হইতে সংসার টাকে দেখিলে তাঁর দর্শন মন্দ নয়। কিন্তু এত করিয়া দুঃখের উচ্ছেদ করিলে যদি তাহাতে সুখ না হয়, তবে সে দুঃখোচ্ছেদটা ত বাঞ্ছনীয় বলিয়া বোধ হয় না। এই সময়ে আমাদের একজন বন্ধু আমাকে একখানি গীতা পড়িতে দেন। অবশ্য লজ্জার কথা যে, আমি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র হইয়াও এ পর্য্যন্ত গীতা পড়ি

নাই। কিন্তু ধর্ম্মগ্রন্থ হাতে করা তখন রেওয়াজই ছিল না। যৌবনের আরম্ভে গৃহিগণের পাঠ্য কাব্যনাটকের সঙ্গ যে কি কুসঙ্গ তা এখনও মনে আছে। তখন একখানা গীতা হাতে পড়িলে হয়ত জীবনের অনেক দুঃখ, অনেক প্রমাদের হাত এড়াইতে পারিতাম। ছাত্র জীবনের এই সব দুঃখের জন্য সমাজই প্রধান দোষী। আমি পুস্তক খানি বার বার পড়িলাম। বড়ই ভাল লাগিল। বোধ হইল যেন যা কিছু মানুষ চায়, তা ইহাতেই পাইতে পারে। আমি গত ১৫ বৎসর কাল প্রত্যহ গীতা পড়িয়াছি, ও তাহার বিষয় ভাবিয়াছি এবং অনুবাদ করিয়াছি। যত প্রকারে তাহা বুঝা যায় তাহার চেষ্টা করিয়াছি। পরে দেখিলাম, বেদপথ কেবল এক গীতাতেই বুঝা যায় না। গীতা সংগ্রহগ্রন্থ। উপনিষৎ, বেদান্ত ও বেদ পড়া দরকার। আমি সাধ্যমত তাহা কিছু কিছু পড়িয়াছিলাম। বাবার ঈশ, কেন, কঠ প্রভৃতি শঙ্কর ভাষ্য সহিত ১০ খানি উপনিষৎ ছিল। আমি তাহা পড়িয়াছিলাম। ইহার কতক গুলি আদি সমাজের ছাপা। বাড়ীতে আদি সমাজের স্বামীর টীকা সহ ছাপা একখানা গীতাও পাই। এই গীতাই সর্ব্বদা পড়িতাম। উপনিষদের মধ্যে কঠ হইতে প্রথম শিখিলাম—ঈশ্বরকে দুই ভাবে জানিতে হয়। অস্তিত্ব ভাব আর তত্ত্বভাব। সোপাধিক বা সাকার আর নিরুপাধিক বা নিরাকার ভাবে জানিতে হয়। কিন্তু সাকার জানিলে, নিরাকার আপনি আসে; এই মন্ত্র পড়িয়া আমি বড় আনন্দিত হইলাম। ইহার পূর্ব্বে অহংকারে নিরাকার নিরাকার করিতাম।

ব্রহ্ম জানিতে চাহিতাম। দেখিলাম তাহা হয় না। আরও একটী কথা, তাহাও জানিলাম যে, ধাতু প্রসন্ন না হইলে স্থির ইন্দ্রিয় ধারণা হয় না। তাঁকে জানা যায় না। এই "প্রসন্ন" কথাটা বড় সুন্দর।

ঘোলাজলে ফটকিরি দিলে জল যেমন প্রসন্ন হয়, নির্ম্মল হয়, তেমনি শরীরের সপ্তধাতু নির্ম্মল হইলে ইন্দ্রিয় স্থির হয় ও মন ঈশ্বরদর্শন-যোগ্য হয়। ক্রমে আহার শুদ্ধিতে চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধিতে, "ধ্রুবা স্মৃতি"—পড়িলাম। মৎস্য মাংস ত্যাগ করিলাম। রোগের জন্যও আমাকে আহার বিষয়ে খুব সংযত হইতে হইত।

ক্রমে রামায়ণ, মহাভারত, যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি গ্রন্থ যখন যা মনে হইত লাইব্রেরী হইতে আনিয়া অবসর মত পড়িতাম ও নোট করিতাম। নোট করা আমার একটা স্বভাব। আমি কিছু পড়িয়া তাহার বিষয় কিছু মন্তব্য না লিখিয়া ছাড়িতাম না। পরে দেখিয়াছি তাহার মধ্যে অনেক ভূল আছে।

গীতা ও রামপ্রসাদের সঙ্গীত এই দুই খানি আমি বিশেষ আলোচনা করিতাম। সন্ধ্যায় এবং রাত্রি ৩টা হইতে ভোর পর্য্যন্ত উপাসনা করিতাম। উপাসনার মন্ত্রের মধ্যে ওঁ মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ এবং সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি এই মন্ত্র আমি প্রত্যহ পড়িতাম—যাতে মনে ভাব হয়। ভাব জন্মান ও প্রার্থনা এই আমার উপাসনার মূল উদ্দেশ্য ছিল। গীতার অনেক অংশ আমার মুখস্থ ছিল। তাহা সুর করিয়া অনুভব করিয়া পড়িতাম। আর ঐ সংগীত। অমন মধুর প্রাণের প্রার্থনা, যেন ঋগ্বেদের মন্ত্র,—আমি আর কোথাও দেখি-নাই। কমলা কান্তের ও বৈষ্ণব কবিদিগের কয়েকটী প্রার্থনা আমার খুব প্রিয় ছিল।

আর আমার চিরদিনই এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, ঈশ্বর যখন সত্য, তখন আমি যদি সত্য বলি তবে তিনি তাহা শুনিবেন। কাঁদিয়া যাহা বলা যায় তাহা মিথ্যা হইতে পারে না। কপটতা হইতে পারে না। এই জন্য আমি মনে করিতাম যে, যেদিন আমার চক্ষুর জল পড়িল না

সে দিন আমার প্রার্থনা ঈশ্বর শুনিলেন না। উহা অকপট হয় নাই। যা অকপট, যদি দুঃখের কথা হয়, তবে তাহাতে চোখের জল পড়িবেই পড়িবে। আমার সাধনের এই মূল কথা।

প্রত্যহ উপাসনার পর কিছু নূতন তত্ত্ব জানিতাম। ভোরে যত নূতন ভাব উদয় হয় দেখিয়াছি, এমন আর কখনও হয় না। হয়ত গীতার একটী শ্লোকের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারি নাই, বহুকষ্টে ও পারি নাই, আজ উপাসনার পর বেশ বুঝিলাম। রামপ্রসাদের কত কথা অমনি করিয়া বুঝিয়াছি। "ইহজন্ম পরজন্ম বহুজন্ম পরে, প্রসাদ বলে আমার জন্ম হবে না জঠরে"। এই "পরজন্ম" যে শ্রেষ্ঠ জন্ম, ইহা বহুকাল কিছুতেই বুঝিতে পারি নাই! উপাসনার পর মনের যখন উর্দ্ধগতি হয়, প্রকাশধর্ম্ম হয়, তখন অনেক কথা খুলিয়া যায়। ধর্ম্ম গ্রন্থ ঋষিবাক্য। সাধকের গান ও বেদ আমি এইরূপে পড়িতাম।

জজ অম্বিকাচরণ সেন মহাশয় যখন এখানে আসেন তখন প্রথম ঋগ্বেদ পড়ি। তাঁহার কাছে অনেক কথা শুনিলাম। কিন্তু আমার মনে ধরিল না। আমার ইচ্ছা ঋষিগণ যে ভাবে ভাবিয়াছেন, আমি কেমন করিয়া সেই ভাবটা পাই। তবে বেদ বুঝিতে পারিব। ঋক্‌বেদের মন্ত্র সময়ে সময়ে ভোরে গাইতাম (পিতৃগণ হৃদয়ে এক)—

গূঢ়ং জ্যোতিঃ পিতরো অন্ববিন্দন্ সত্যমন্ত্রাঃ অজনয়ন্ উষাসম্

গূঢ় জ্যোতিঃ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অকপট স্তব করিতেন, তাই উষা জন্মাইয়াছিলেন। এটী আমি এই ভাবে বুঝিতাম। ইন্দ্র ও আঙ্গিরসদিগের সহিত বল ও ঋষিগণের যুদ্ধ ও গোগণের উদ্ধারও রূপক। আমার মন ঐদিকে লইয়া যাইত; যেন আমার পিতৃগণের পথে লইয়া যাইত। তাই বড় মিষ্ট লাগিত। এমন দিন যায় নাই যে উষাকালে দয়েলের প্রথম সংগীত আমার কর্ণে

প্রবেশ করে নাই। আমি ঋগ্বেদে ত্রিতের কথাটী পড়িয়াছি। মনে বড় আকাঙ্ক্ষা কিন্তু কিছু হইল না। এই সময়ে আমি একটী গান মুখে মুখে রচনা করিয়া গাইতাম ও কাঁদিতাম। গানটীর অক্ষর মিল নাই, ছন্দ মিল নাই, কিন্তু ইহাতে বড় ভাবোচ্ছ্বাস হইত। উপাসনা কালে আমি কেবল ভাবোচ্ছ্বাসের চেষ্টায় থাকিতাম। মনকে কেবল ঠেলিয়া উপরদিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতাম।

যেখানে যে সুন্দর প্রার্থনা, যাহাতে ঈশ্বরের হৃদয়ে খুব আঘাত লাগে, আমি তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখিতাম ও উপাসনা কালে তাহাই গাইতাম। আমার গানটী এই—

একবার গারে পাখি অমৃত জ্যোতি দেখি
নয়ন ভরিয়ে তোর আনন্দ দেখি,
এ ত্রিতের অন্ধকূপে উঠবেনা রবি।
আমি জেগে স্বপ্নদেখি তোর মন্ত্রে উঠবেন রবি
ও তোর পাখীর প্রাণ এত মহাপ্রাণ
সে যে উঠায় জগৎপ্রাণ ডাকি ডাকি ডাকি॥
(সে যে উটায় বিবস্বান ডাকি ডাকি)
পাখি
তুমি নাচিছ গায়িছ অনন্তে ছুটিছ
পাশরি আপনা আপন হেরি
আমি অন্তর বাহিরে তিমির সাগরে
ক্ষণেক আপনা ভুলিতে নারি।
যখন তার স্বরে মেঘে আগুন ধরে
গোলাপে গোলাপ হয়ে যায় নভ

আকুল হয় প্রাণ, না যায় বুঝান
শিশু যেন কাঁদে চাঁদের লাগি।

আজ

শুনিলাম কিরে সেই সাম স্বর
জাগিত যাহাতে হিম গিরিবর
তরুকেশ দেহ হতো রোমাঞ্চিত
গিরি নদী ছলে ঝরিত আঁখি।

কিন্তু আমার একদোষ, আমার যেদিন যে ভাব, লেখাটা সেই দিকে চলিয়া যাইত। উষাদর্শনে পাখীর আনন্দ দেখিয়া নিজের জন্য কাঁদিতেছি। হয়ত স্বদেশের কথা দুদিন খুব চলিতেছে। ঐ পাখীর গানেই স্বদেশ আসিয়া পড়িল। হয়ত মধুর কথাটা জোরে মনে পড়িয়া গেল, অমনি ঐ গানের কয়েক লাইন সেই দিকে চলিয়া গেল।

আমার ইচ্ছা হইত একবার সরস্বতী তীরে যাই। দিন কতক সেখানে থাকি। ঋষিদের দেশে গেলে তাহাদের ভাবও কিছু পাওয়া যাইতে পারে। আমার নিকট ঋগ্বেদ বড় মিষ্ট লাগিত, বিশেষ দীর্ঘতমার কথাগুলি। অমন জ্ঞানের কথা, আর অমন সরল! আর কি ভক্তি! বেদের ভক্তি অপার্থিব ধন। আমরা তাহা চক্ষুর অভাবে হারাইয়াছি। মধু বলিত "খা'লে খাওয়া আসে" "ঠা'সে খা'লে মিঠা লাগে"; তাই ঠিক। পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিলে, শাস্ত্র—আনন্দময়ীর কথা—আনন্দ দেয়। বাছুর যদি বাঁট চাটে তবে গাই পানাইয়া দুধ ছাড়িয়া দেয়। চাই পিপাসা। বাবা বলিতেন, রাগ। আমার তান্ত্রিক দীক্ষা হয় নাই। দাদারাই দীক্ষিত হন নাই; গুরুকুলে কেহ নাই। আমি ফুল জল দিয়া কোনও দিন পূজা করি নাই। কেবল দুইবৎসর শিব চতুর্দ্দশীতে শিবের পূজা

করিয়াছি। আমি ভাগবত ও বড় ভালবাসিতাম। ভাগবতকারের ন্যায় একাধারে ভক্ত, পণ্ডিত, কবি, দার্শনিক ও বেদজ্ঞ নাই বলিলেই হয়। আমি সব রূপক মনে করিয়া পড়িতাম। গোপীরা পরম ভক্ত, ঈশ্বরের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন। কৃষ্ণ ও আনন্দময়ের আকার কল্পনা মাত্র। যেখানে গোল হইত, যেমন কুব্জা প্রভৃতির বিষয়, তাহা আমি পড়িতাম না। আমি মানুষবুদ্ধিতে ওপুস্তকের কোন চরিত্রই বুঝিতাম না। কালিয় নাগ, গজেন্দ্র ও কুচেলা এ তামস, রাজস ও সাত্ত্বিক অবস্থা বুঝাইবার চেষ্টা; কালিয় তামস। ঈশ্বরের হাতে মার খাইয়া মর মর হইয়াও তাহার হিতবুদ্ধি হইল না। গজেন্দ্র রাজা—রাজস—যখন প্রাণ যায় তখন রক্ষা কর বলে, তার আগে নয়। আর কুচেলা দুঃখে পড়িয়া ঈশ্বরের কাছে গেল, কিন্তু ধন চাহিতে মনেই হইল না। ভাগবত অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

ভাগবতে পড়িয়াছিলাম, ভক্তি জন্মাইবে স্তব পড়িয়া ও "মদ্রনানুচিন্তয়া"। সৃষ্টির অনুচিন্তা করিয়া। আমি তাই করিতাম। আমার গাই ছিল। দেখিতাম দুটী, শীত আসিলে গায়ের লোম ঠিক কম্বলের মত পুরু হয়। আবার গ্রীষ্ম আসিলে সে গুলি ঝড়িয়া যায়, ঠিক গরদের কোটের মত চিক্কণ আবরণ উপস্থিত হয়। যখন বাছুর হয়, তখন তাহার মাথাটা হুকার মত গোল থাকে, পরে বড় হইলে কপাল চেপ্‌টা হইয়া যায়। আর প্রসবের সময় বাছুরের ক্ষুরের তলায় মাংসের গদি লাগান থাকে। যখন গর্ভে বাছুর বড় হয়, তখন পা ছোড়ে। ওগদি না থাকিলে গর্ভাশয় ছিড়িয়া যাইতে পারে। মাথা চেপ্‌টা হইলে প্রসবই হয় না, দুইটীই মরে। লেজটা দেখিতে সামান্য, কিন্তু গরুর আটআনা দুঃখ উহাতে যায়। আবার ভাবিতাম, যে চোরকে চুরি করিতে বল্‌ছে সেই আবার গৃহস্থকে জেগে থাকতে

বলুছে। যে ডাঁশ, মশা, মাছি পাঠাচ্ছে, সেই লেজ নাড়াইয়া তাড়াচ্ছে। আর অহৈতুকী ভক্তি, গাই বিয়াইলে বসিয়া বসিয়া দেখিতাম। বাছুর লেজ নাড়িয়া মা'র দুধ খাইত, আমি এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতাম। ঋগ্বেদে আছে "সা চিত্তিভিঃ নিহি চকার মর্ত্যম্" ধেনু ভালবাসায় মানুষকে হারাইয়াছে। তা ঠিক। গাই বাছুরের গা চাটিয়া পরিষ্কার করিয়া দিতেছে, আর সে অর্দ্ধ মুদ্রিতনেত্রে দুধ খাই-তেছে, যেন "আঁখি ঢুলু ঢুলু রজনীদিনে কালীনামামৃত পীযূষ পানে" "ভাব সেই সে পরমানন্দ যেজন পরমানন্দময়ীরে জানে"। একজন রামানুজী বৈষ্ণব আমাকে একদিন বলেছিলেন, ভগবান্ ভক্তের দোষও উপাদেয় ব'লে গ্রহণ করেন। গাই বাছুরের ব্যাপার ঠিক তাই। চোখের আড়াল হলে গাই আর খায় না। তদ্গত প্রাণ হইলে এমনই হয়। গৃহস্থ লোভী হইলে গাই তাকে আর সব দুধ দেয় না। এই সব দেখে আমি মনে বুঝিতাম, সাংখ্যের প্রকৃতি বা বিলাতী First Cause জগৎকারণ হইতে পারে না। জগৎকারণ দয়াময়। তাঁর যেমন জ্ঞান ও শক্তি তেমনি দয়া। লতাটী দেখিলে তাহার বিশেষত্ব অনুসন্ধান করিতাম এবং আমার দৈনন্দিন লিপিতে তাহার ফল লিখিয়া রাখিতাম। ইহাতে আমার সূক্ষ্ম দেখিবার শক্তি বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

এইরূপ সূর্য্য ও পৃথিবী-পৃষ্ঠের স্থল ও জলের বিভাগ ও পরিমাণ দেখিয়া ঈশ্বরের জ্ঞানশক্তি ও দয়ার উপলব্ধি করিতাম। দীর্ঘতমা বলিয়াছেন, একটী চাকার উপর ভুবনের ভার চাপান আছে। নাভি ও তাতে না, ধুরাও ভাঙ্গে না। একই চাকা (সূর্য্য) এত বোঝাই লইয়া চিরদিন ঘুরিতেছে। তা কেন! এত বড় এত বড় গ্রহ মহাবেগে ঘুরিতেছে শব্দ হয় না। একটী হাতী যেতে দেখে একটী পশ্চিমাছেলে

বলেছিল, "এত্তাবড়া জানোয়ার চল্‌তা শব্দ না হোতা"। আমিও গ্রহগণের নীরব গতিতে তেমনি বিস্মিত হইতাম। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, বসন্ত একের পর এক যায় আসে, তা কে দেখে। ঊষা আসে অন্ধকার যায়, কে দেখে। পৃথিবীর ৩ ভাগজল একভাগ স্থল কেন, কে দেখে। ফুল ফোটে, ঝরে, পাখী গায়, কে দেখে। নদী অবিরামগতিতে কোথা যায়, কেন যায়। নীল আকাশের গায় নক্ষত্র রাজি। সে দেশে বায়ু নাই, ইথারের মধ্যদিয়া তাদের জ্যোতিঃ আসে। কারো জ্যোতিঃ আজিও মনুষের চক্ষুতে পৌঁছে নাই। এসব কে দেখে।

আর ছোটকালে দিলীপ রাজার একটী গুণ পড়ে ছিলাম, "ধর্ম্মং অনাতুরঃ" দুঃখ না পেয়ে হরিবলা যে গুণ তা বুঝিতাম না। এখন দেখি, দুঃখ না পাইলে অল্প লোকেই ঈশ্বরকে ডাকে। তাই গীতায় আছে আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, যে টাকা কড়ি কিছু চায়, আর জ্ঞানী এই চারিজন হরি ভজে। তা ঠিক। দুঃখ না পাইলে হয়ত এদিকে মতি গতি হইত না। ভাগবতের টীকায় স্বামী বলিয়াছেন, জ্যৈষ্ঠ মাসে বিলে যেমন পদ্মফুল প্রায় কুঁড়ি। দুই চারিটা কিছু কিছু ফুটেছে। দুই একটী একেবারে ফুটেছে। সেইরূপ মানুষের হৃদপদ্ম অজ্ঞানে কুঁড়ি হয়ে থাকে। জন্মান্তরের কর্ম্মফলে যার যেমন চিত্তশুদ্ধি তেমন আলো পায়, ততটুকু হরিকে ডাকে। যত ডাকে, তত মনের শুদ্ধি ও ভক্তি। যত ভক্তি, তত শুদ্ধি। যখন ১৬ আনা শুদ্ধি তখন ১৬ আনা ভক্তি। সেই ভক্তিতে তাঁকে জানা যায়। জগতের অধিকাংশ লোক ঐ কুঁড়ি অবস্থাতেই চলিয়া যায়। ঈশ্বরের খবর লয় না। সংসার লইয়া বেশ সুখে থাকে। তাদের ভিতর দিকের দরজাটা একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। তাই "পরাক্‌ পশ্যতি ন অন্তরাত্মন্‌" বাহিরে দেখে, অন্তরাত্মা দেখেই না। একদিন একজন বড়পদের লোক একজন

গরীব পণ্ডিতকে বলিয়াছিলেন, মহাশয় লোকে ঈশ্বর ঈশ্বর করে, ঈশ্বর আমাকে যদি কেউ দেখাতে পারে তবে মানি। তিনি আমাকে ছোট ছোট করে বলেছিলেন, মশায়, দেখুন ত ঈশ্বর ওকে দেখাবে, তবে ও মানবে। ঈশ্বর দেখে, ওকে দেখাতে তার ভারিদায় পড়েছে কিনা? আমরা যেন ওর চাকর অধান। চাকরী না করিলে হাঁড়ি চড়েনা। আমাদের যা বলে তাই করি। যে ঈশ্বর দেখে সেত আর ওর চাকর নয়। আর তার হাঁড়িও চড়াতে হয় না। সে ওর কি ধার ধারে। বুঝেনা। আর ও ঈশ্বর মানল আর না মানল, তার বয়ে গেল। না মানবে মরবে। "ন শ্রোধ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি"। আমি বলিলাম, আজ্ঞা হাঁ। তাঁরই নাগর দলায় চড়ে পকেট হ'তে পয়সা দিয়ে ঘুর পাক খাচ্চ।

পরকাল বালকের চোখে পরে না। আর একটা দেখিতাম যে, ধর্ম্মরাজ্যে কার্য্যকারণ নাই। লোকে কার্য্যকারণই খোঁজে। কিন্তু এদেশে তার কিনারা হয় না। বলে, জ্ঞানে ভক্তি; আবার বলে ভক্তিতে জ্ঞান। বিবেকে বৈরাগ্য, বৈরাগ্যে বিবেক। ভক্তিতে, বৈরাগ্য, বৈরাগ্যে ভক্তি। বৈরাগ্যে জ্ঞান, জ্ঞানে বৈরাগ্য। এই সব বিচার করিতে করিতে পাগল হয়ে যেতে হয়। কখন মনে হয়, পুরুষকারই উপায়। কখন মনে হয়, কৃপা বই গতি দেখি না। কখন মনে হয়, তিনি নিরাকার না সাকার, না অবতার। এ জগৎ দ্বৈত না অদ্বৈত। না দুই। সব কথাই কি সত্য? হতেওপারে। কার্য্য কারণ বিচারে শেষ হয় না। এই জীব ভবসাগরে অকর্ণধারা নৌকার মত হয়ে পড়ে। যখন যেদিকে বাতাসে নিয়ে যায়, তখন সেই দিকেই ভেসে যায়। তখন দেশিক গুরু দেখা দেন। এই অবস্থায় রামপ্রসাদ বলেছেন—

এসব মাগীর খেলা। মাগীর আপ্তগুণে গুপ্ত লীলা।
সগুণে নির্গুণে বাধায়ে বিবাদ, ঢেলা দিয়ে ভাঙ্গে ঢেলা।
মন দিয়াছ মনেরি তোমার সৃষ্টি পোড়া মিষ্টিবোলে ঘুরে মরি।

* * * *

কিন্তু এইরূপ বিচার করিতে করিতে সাধন পথে এগিয়ে পড়ে। সে তা টের পায় না। ব্যাকুলতা ক্রমে বেড়ে যায়। ভক্তি বাড়িতে থাকে। উপাসনায় আনন্দ হয়। অশ্রুপুলক হয়। উপাসনার পর মনের সত্বগুণ হয়, বিকাশধর্ম্ম হয়, কিছু উপরের তত্ব দেখে। সত্য আঁট হয়। ১১ টা ১৫ মিনিটে স্কুলে এসে, ১১ টা লিখিতে পারে না। জীবে দয়া হয়।

ঈশ্বরের মহিমা ও দয়া অনুভব করে। কাহাকে ও কটু বলিলে, কি ছেলে পিলেকে মারিলে ও বড় অনুতাপ হয়। মনে ভাবে স্বভাব দুস্ত্যজ্য। পরেরও, আমারও। তবে ওরে মেরে ফল কি। জ্ঞান বুদ্ধি হলে, ও ভাল হবে। আর যার হবার নয় তাকে আমি দিতে পারিব না। আর নিজের প্রকৃতির দুর্ব্যবহারে নিরন্তর তাঁর শরণাগত হয়ে থাকা অভ্যাস হয়ে আসে। দেখে "হৃদি রূপং মুখে নাম"বই গতিই নাই। আর নাম নিলে, মন ভিতরে রূপের দিকে যায়। "কশ্চিৎ ধীরঃ প্রত্যাগাত্মানমৈক্ষৎ। আবৃত্যচক্ষুঃ অমৃতত্বম্ ইচ্ছন্" দৃষ্টি ঘুরাইয়া ভিতরে না নিলে গতি নাই। কিন্তু আত্মার প্রতি ইচ্ছা হইলে,তবে মন ভিতরে যায়। যে ধীর, যার প্রকৃতই বুদ্ধি আছে, সে আত্মাকে দেখিতে চায়। সে এদিকে সুখ পায় না। কিন্তু সবই ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তাঁর কৃপাই জীবের একমাত্র ভরসা।

এ শরীরটা একটা যন্ত্র। কর্ম্ম করিবার জন্যই এটা পাওয়া গেছে। শাস্ত্রে বলে, শরণাগত হয়ে কাজ করিতে হয়। আগে প্রভুকে ধর,

তারপরে কাজ কর। অধ্যাত্মচেতা হলে অর্থাৎ আমি ঈশ্বরের সম্পূর্ণ অধীন, এই ভাব এলে তবে আসক্তি ও ফল ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করা যায়। কিন্তু তা সহজে আসে না। অহং যায় না। কিন্তু তাঁর সঙ্গ করিতে করিতে, তাঁর গুণ ও দয়ার অনুভবে নির্ভর আসে। ভার না দিলে তিনি ভার নেন না। মধু বলেছিল, "সংসারে আমার মত থাক" "অসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্মসমাচর" আমি কোন বিপদে পড়িলে রাত্রিতে উপাসনাকালে কাঁদিয়া বলিতাম, একটা করে দাও; মা আমাকে এ অশান্তিতে রাখিও না। তখন দেখিতাম একটা হইয়া যাইত। কাজ কিন্তু সব করিতাম। তিনি বুদ্ধি দিতেন। আজু গোঁসাই রামপ্রসাদকে বলেছিলেন—

ওহে সেন, অল্প জ্ঞান বুঝ কেবল মোটামুটী
ভাব না কেন,শ্যামা মায়ের চরণ দুটী।
তুমি শিবের ভাবে অর্থাৎ শিব যেমন অনাসক্ত

গৃহস্থ, সেইরূপ অনাসক্ত হয়ে গার্হস্থ্য কর। কথা সহজ, কাজ সহজ নয়। তবে উপাসনার জোরে অনেকটা হয় দেখিয়াছি।

পাতঞ্জল দর্শন পড়িয়া সাধনে সত্যই ফল হয় এবং দেহ মনের সম্পূর্ণ অধীন, মনই সব এই ধারণা যেমন হয়, উপনিষদ পড়িয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও জগৎকারণত্ব সম্বন্ধে সেইরূপ বিশ্বাস হয়। কঠোপনিষদে "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্, নিবোধত" যখন আমি প্রথম পড়ি, তখন হাঙ্গেরির স্বদেশ প্রেমিক কসেথের বিষয় অধ্যয়ন করিতে ছিলাম। ভাবিলাম "ওঠ" "জাগ" কথাটা দেশবিশেষের এক চাটিয়া নহে। যে ভালবাসে, যারই প্রাণ অপরের দুঃখে কাঁদে, সেই বলে ওঠ জাগ। কসেথ যখন স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন, তখন জন্মের মত মাতৃভূমিকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া জননীর শেষ নিদর্শন

এক অঞ্জলি ধূলি পকেটে লইয়াছিলেন। তাঁহার তৎকালের কাতরোক্তি ও ভক্তিপূতমূর্ত্তি চিন্তা করিলে পাষণ্ডের চক্ষুতেও জল আসিবে। কিন্তু ঋষির উদ্দীপনা—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত"—পড়িয়া, তাঁহাদের মহাপ্রাণতা ও বিশ্বজনীন কল্পনায় স্তম্ভিত হইয়া কজন লোক কাঁদে? কজন ভাবে, কবিগণ যে পথকে নিশিতক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম বলিয়াছেন, সে পথে কিরূপে হাঁটিব? কিরূপে সংসারে কর্ম্ম করিয়া ব্রহ্ম পাইব? কিরূপে বিশ্বাস, ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করিব? যদি সেই পথে একবার হাঁটিতে পারি, তবেই অন্যকেও সেই পথে লইয়া যাইতে পারি। তবেই অন্নপূর্ণা হইয়াও অনশন কৃশা, ধর্ম্মজননী হইয়াও তমোশীলা, বিদ্যার জননী হইয়াও অজ্ঞাননিমগ্না, অসীমশক্তিমতি হইয়াও অবলা, অনন্ত কল্যাণগুণধরা হইয়াও অগৌরবলাঞ্ছিতা **জননীর সেবাধর্ম্মে** দীক্ষিত হইবার উপযুক্ত হইতে পারি।

প্রথম জগৎকারণ সম্বন্ধে মনে স্বতঃই আলোচনা আরম্ভ হয়; ঋষিগণ বহু পূর্ব্বে এ আলোচনা করিয়াছিলেন; তাঁহারা মনে মনে বলিয়াছিলেন—

জড় কি এ জগতের কারণ? কোথা হ'তে এলাম? কেন বাঁচি? কোথা যাব? কার অধিষ্ঠানে সুখদুঃখের ব্যবস্থার জন্য সারা জীবন ব্যস্ত থাকি?

কিং কারণং ব্রহ্ম? কুতঃ স্ম জাতাঃ?
জীবাম কেন? ক চ সম্প্রতিষ্ঠা?
অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু।
বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্॥

কালঃ স্বভাবো নিয়তি র্যদৃচ্ছা
ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যম্।
সংযোগ এষাং ন, তু+আত্মভাবাৎ
আত্মাপি+অনীশং সুখদুঃখহেতোঃ ॥

কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা (অকস্মাৎ হ'য়ে যাওয়া), ভূতগণ ও পুরুষ কি জগৎ কারণ ? ইহা চিন্তার বিষয় (অর্থাৎ তাহা হইতে পারে না) ; এদের সংযোগ ও জগৎ কারণ নয়।

কারণ, আত্মা ব্যতীত কেহ সংযোগ ঘটাইতে পারে না। সংযোগ আত্মা সাপেক্ষ ; তবে জীব ইহার কারণ হউক ? না, তাও হ'তে পারে না। সুখদুঃখের কারণ যে সৃষ্টি, তাহাতে সে অসমর্থ—অপ্রভু। ঘরে আলু রাখিলে, কালক্রমে তাহাতে আপনি অঙ্কুর বাহির হয়। সে, কালের কাজ। সেইরূপ জগৎ কালের কার্য্য কি ?—এই সন্দেহ। এইরূপ—

স্বভাবং একে কবয়ো বদন্তি
কালং তথা+অন্যে পরিমুহ্যমানাঃ।
দেবস্য এষ মহিমা তু লোকে
যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্ ॥

কতকগুলি পণ্ডিত ভ্রমে প'ড়ে বলেন স্বভাবই কারণ, কেহ বলেন কালই কারণ ; কিন্তু এই যে ব্রহ্মচক্র ঘুরিতেছে অর্থাৎ হইতেছে, যাইতেছে, চলিতেছে—এদেবের মহিমা।

ঋষিগণ ধ্যানদ্বারা জানিলেন—

তে ধ্যানযোগানুগতাঃ অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তানি অধিতিষ্ঠতি+একঃ ॥

তাঁরা ধ্যানে দেখিলেন—একটী স্ত্রী আর একটী পুরুষ। মায়াও ঈশ্বর। মায়া কেমন? দেব যে আত্মা তাঁহার আত্মভূত (অস্বতন্ত্রাং)—তাঁহা হইতে ভিন্ন নয়।

এমন এক শক্তি। তিনি স্বগুণ নিগূঢ় অর্থাৎ তাঁহার কার্য্য স্বত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের দ্বারা প্রচ্ছন্ন। আর এক পুরুষ দেখিলেন, তিনি একা কাল, স্বভাব প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কারণগুলির নিয়ন্তারূপে অবস্থিতি করিতেছেন। ব্যাস ভাগবত রচনার পূর্ব্বেও এই দুইটী ধ্যানদ্বারা দেখেন—

> যয়া মাং মোহিতো জীবঃ
> আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
> পরোপি সমুতেত্বনর্থং
> তৎকৃতং চ অভিপদ্যতে॥

জীব স্বয়ং ব্রহ্ম হইলেও এই মায়ায় সংমোহিত হইয়া আপনাকে ত্রিগুণাত্মক মনে করে। তাই ভাবে আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা; তাই জীব মায়ার হাতে পড়িয়া দুঃখ পায়।

ঋষিগণ বলিয়াছেন—

> যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহতে চ
> যথা পৃথিব্যাম্ ওষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
> যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি
> তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥

অর্থাৎ যেমন মাকড়, সূতা নিজ দেহ হ'তে বাহির করে আবার গুটাইয়া লয়; যেমন পৃথিবীতে যব গম জন্মে; যেমন জীব ও মানুষের কেশ লোম বাড়ে, সেইরূপ অক্ষর ব্রহ্ম হইতে বিশ্ব হয়। মাকড়ের পেটের মধ্যে সূতার গুঁটি নাই। রস আছে। সে রস যেই বাহির

হয়, অমনি সুতা হয়ে যায়। বিশ্বও আদিভাগে ব্রহ্মে থাকে, তাঁর ইচ্ছায় ব্যক্ত হয়। আর মানুষ যতদিন বেঁচে থাকে, চুল, নখ হয়। ম'লে আর তা বাড়ে না। কেন? আত্মা নাই বলে। এইত আত্মার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আর মাটিতে জীবনী শক্তি—আত্মা—না থাকিলে কে গাছ হয়?

ঈশ্বর কেমন—

তম্ ঈশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দৈবতানাং চ দৈবতম্।
পতিঃ পতীনাং পরমং পরস্তাৎ (১)
বিদাম (২) দেবং ভুবনেষু মীড্যম্ (৩)॥

তাঁর শরীর নাই, ইন্দ্রিয় নাই। তাঁর সমান কেউ নাই। তাঁর বড় ত হইতেই পারে না।—

ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে
ন তস্য সমশ্চ অভিাঅধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ॥

তাঁর বিচিত্র পরাশক্তি আছে। স্বাভাবিক জ্ঞান, বল ও ক্রিয়াও আছে। অর্থাৎ হাত, পা, নাই ব'লে তিনি কাজ করিতে পারেন না তা নয়। তাঁর আশ্চর্য্য শক্তি আছে; তা তাঁর স্বাভাবিক, তাই সব কাজ হয়। আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন,—সূর্য্য স্বয়ং প্রকাশ; জগৎ আলোকিত করিতে তাঁর আর কোন সাহায্য প্রয়োজন হয় না।

(১) ব্রহ্মাণ্ড স্রষ্টা।

(২) জানি।

(৩) পূজ্য।

এইরূপে ঈশ্বরের স্বশক্তিতেই সব হয়। এই মন্ত্রটী অবতার তত্ত্বের মূল। জ্ঞানীরা বলেন, তিনি যেমন জীব হন, তেমন অবতারও হন।

একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষীচেতা কেবলো নিগু র্ণশ্চ॥

সেই অদ্বিতীয় দেব সর্বভূতে গূঢ়রূপে আছেন। তিনি সর্বব্যাপী, সকলের অন্তরাত্মা, কর্ম্মের অধ্যক্ষ, সর্বপ্রাণিতে বাস করেন। সাক্ষী—কেবল দেখেন, কিছু করেন না। তিনিই দেহে চৈতন্য দেন, তাঁর উপাধি বা শরীর নাই। তাঁর গুণও নাই, দোষও নাই—গুণাতীত।

একোহংসো ভুবনস্যাস্য মধ্যে
স এব অগ্নিঃ সলিলে সন্নিবিষ্টঃ।
তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুম্ এতি
নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়॥

এই ভুবন মধ্যে তিনি এক হংস। জলে তিনিই অগ্নি, অবিদ্যায় যেন চাপা, অন্ধকারে যেন ঢাকা।

স বিশ্বকৃৎ বিশ্ববিৎ আত্ম যোনিঃ
কালকারঃ বশী সর্ববিৎ যঃ।
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞ পতিঃ গুণেশঃ
সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ।

তিনি বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্ব তিনি জানেন। তিনি আত্মা ও কারণ, কালের কর্ত্তা, তিনি সর্ববিৎ, প্রকৃতি ও পুরুষের পতি। সত্ব, রজ ও তম গুণের নিয়ন্তা; এবং সংসার, মোক্ষ, স্থিতি ও বন্ধনের হেতু।

বিশ্বাসে তাঁকে জানা যায়—

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা
অস্তীতি ব্রুবতোহন্যত্র কথং তৎ উপলক্ষ্যতে ;

মন বাক্য বা চক্ষু দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না। যে বিশ্বাস করে, বলে তিনি আছেন সেই পায়। বলিলে কেমন ক'রে পাবে? শাস্ত্রই প্রমাণ।

ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্তে জীবতি কশ্চন।
ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্ এতৌ উপাশ্রিতৌ॥

মানুষ প্রাণবায়ু বা অপানবায়ু দ্বারা বাঁচে না। কিন্তু প্রাণাদি বায়ু যাঁর আশ্রয়ে দেহে থাকে, তিনি দেহে আছেন বলিয়াই মানুষ জীবিত থাকে।

তিনি কেমন?

অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ম্
তথা অরসং নিত্যং অগন্ধবৎচ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥

তাঁকে জানিলেই মৃত্যু অতিক্রম করা যায়। মৃত্যু গেলে, দুঃখ ভয় গেল। সুধু তা নয়—তিনি আনন্দময়।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

ব্রহ্মানন্দ পাইলে আর ভয় থাকে না। উপনিষদে সর্ব্বত্র একই কথা।—

ব্রহ্ম—সচ্চিদানন্দ।

রসো বৈ রসঃ। রসং হি এব অয়ংলব্ধ্বা আনন্দীভবতি। কঃ হি এব অন্যাৎ, কঃ প্রণ্যাৎ, যদি এষঃ আকাশঃ (ব্রহ্ম). আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হি এব আনন্দয়তি।

ভৃগু বরুণের উপদেশক্রমে তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে আনন্দময় বলিয়া জানিলেন।

•আনন্দো ব্রহ্মোতি ব্যজানাৎ। আনন্দাৎ হি এব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ান্তি অভিসংবিশন্তি।

আনন্দ হইতে জীব জন্মে। জাতপ্রাণী আনন্দ হেতু বাঁচে। আনন্দের দিকে যায় এবং অন্তে আনন্দে প্রবেশ করে। একথা সত্যই যে ব্রহ্ম যদি আনন্দ না হইতেন, তবে জগতে জীব বাঁচিত না। বাঁচিতে ইচ্ছা ও করিত না। সম্ভাবনা ও হইত না। একটী বেদান্ত-সূত্র আছে—"আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ।" উপনিষদে পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে আনন্দময় বলা হইয়াছে, এজন্য তিনি আনন্দময়। অর্থাৎ তিনি আমন্দময় না হইলে ঋষিগণ এমন করিয়া বার বার তাঁহাকে আনন্দ-ময় বলিতেন না। এই আনন্দের জগৎ সেই আনন্দময়েরই স্থুল শরীর!

অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ
দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্ বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য
পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্বভূতান্তরাত্মা॥

স্বর্গ (সূর্য্যের উপরস্থিত তপ, জন, মহ ও সত্য লোক) তাঁহার মস্তক; চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার চক্ষুদ্বয়। দশদিক তাঁহার কর্ণ। উদ্ঘাটীত বেদ তাঁহার বাক্য। বায়ু তাঁহার প্রাণ, বিশ্ব তাঁহার হৃদয়। এবং পৃথিবী তাঁর চরণদ্বয় (তাঁর চরণদ্বয় হ'তে পৃথিবী হইয়াছে)। এই বিরাট পুরুষ, এই বিশ্বরূপ সকলের অন্তরাত্মা।

অতঃ সমুদ্রাঃ গিরয়শ্চ সর্বে
অস্মাৎ স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্বরূপাঃ।

অতশ্চ সর্ব্বা ওষধয়ঃ রসশ্চ
যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা॥

শৈল, সমুদ্র, সবনদী এই ব্রহ্ম হইতে হইয়াছে। সব ওষধি ও রস এই ব্রহ্ম হইতে জাত,—যে রসহেতু পঞ্চভূতে বেষ্টিত অন্তরাত্মা দেহে অবস্থান করেন।

তস্মাৎ চ দেবাঃ বহুধা সম্প্রসূতাঃ
সাধ্যাঃ মনুষ্যাঃ পশবঃ বয়াংসি। (১)
প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ
শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চ॥ (অনুবাদ নিঃপ্রয়োজন)
বিশ্বতশ্চক্ষু উত বিশ্বতোমুখঃ
বিশ্বতোবাহুঃ উত বিশ্বত স্পাৎ।
নরং বাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈঃ
দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেবএকঃ॥

তাঁহর সর্ব্বত্র চক্ষু, সর্ব্বত্র মুখ। সর্ব্বত্র বাহু ও চরণ। সেই একদেব স্বর্গ ও পৃথিবী জন্মাইয়াছেন। তিনি মানুষকে হাত ও পক্ষীকে পক্ষ দিয়াছেন।

অপানি পাদো জবনোঃ গ্রহীতা
পশ্যতি+অচক্ষুঃ স শৃণোতি+অকর্ণঃ।
স বেত্তি সর্বং ন চ তস্য বেত্তা
তম্ আহুঃ অগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥

তাঁহার হস্ত নাই, গ্রহণ করেন। পদ নাই, গমন করেন। চক্ষু নাই, দর্শন করেন। কর্ণ নাই, শ্রবণ করেন। তিনি সব জানেন। তাঁকে কেউ জানে না। তিনিই অগ্র্য মহান্ পুরুষ।

(১) পক্ষী।

অণোরনীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাগুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ
তমক্রুত পশ্যতি বীতশোকঃ
ধাতুপ্রসাদাৎ মহিমানম্ ঈশম্ ॥

তিনি অণু অপেক্ষাও অণুতর, মহৎ অপেক্ষাও মহত্তর। সেই আত্মা প্রাণীর হৃদয়ে নিহিত আছেন। রস রক্তাদি নির্ম্মল হইলে অকাম ব্যক্তি তাঁহার মহিমা দর্শন করেন এবং বিগত শোক হন।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ
নায়ং কুতশ্চিৎ ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥

হন্তা চেৎ মন্যতে হন্তুং, হতশ্চেৎ মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতঃ, নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥

গীতা দেখ।

তেলেষু তৈলং দধিনীব সর্পিঃ
আপঃ স্রোতঃসু অরণীষু চ অগ্নি।
এবম্ আত্মা আত্মনি গৃহ্যতে অসৌ
সত্যেন এনং তপসা যঃ অনুপশ্যতি ॥

তিলের যেমন সর্ব্বত্র তেল আছে, দধির যেমন সর্ব্বত্র ঘৃত আছে, নদীর যেমন সর্ব্বত্র জল, কাষ্ঠের যেমন সর্ব্বত্র অগ্নি, এইরূপ আত্মা সর্ব্বত্র আছেন। যে তালাস করে, সে সত্য ও তপস্যা (উপাসনা) দ্বারা নিজের দেহেই তাঁহাকে পায়।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতঃ বৃত্বা অতি+অতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলম্ ॥

এই পুরুষ পৃথিবীর সর্ব্বত্র বেষ্টন করিয়া দশাঙ্গুল প্রমাণ হৃদয়ে স্থিতি করিতেছেন।

পুরুষঃ এব ইদং সর্বং যৎভূতং যৎ চ ভব্যম্
উত অমৃতত্বস্য ঈশানঃ যৎ অন্নেন অতিরোহতি ॥

যাহা হইয়াছে ও হইবে সে সমস্ত এই পুরুষই। তিনি অমৃতত্বের প্রভু এবং অন্ন খাইয়া যাহারা বৃদ্ধি পায়, তিনি তাহাদেরও প্রভু।

সর্বতঃ পাণি পাদংতৎ, সর্বোতোক্ষি শিরোমুখম্
সর্বতঃ শ্রুতিমৎ লোকে, সর্বম্ আবৃত্য তিষ্ঠতি ॥
সর্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয় বিবর্জিতম্।
সর্বস্য প্রভুম্ ঈশানং সর্বস্য শরণং মহৎ ॥

গীতা দেখ।

নবদ্বারে পুরে দেহী
হংসো লেলায়তে বহিঃ।
বশী সর্বস্য লোকস্য
স্থাবরস্য চরস্য চ ॥

স্থাবর ও জঙ্গমের সর্বলোকের নিয়ন্তা হংস (অবিদ্যা হনন করেন—পরমাত্মা); নবদ্বারবিশিষ্ট দেহপুরীতে দেহী হইয়া—জীব হইয়া, বাহিরের বিষয় ভোগ করেন।

সর্বানন শিরো গ্রীব
সর্বভূত গুহাশয়ঃ।
মধ্যব্যাপী স ভগবান্
তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ ॥

জগতে যত মুখ, যত মস্তক, যত গ্রীবা সব তাঁর। সর্ব হৃদয়ে তিনি আছেন। সেই ভগবান্ সর্বব্যাপী। তাই শিব সর্বগত।

মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ
সত্বস্য এষঃ প্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলাম্ ইমাং প্রাপ্তিং
ঈশানঃ জ্যোতিঃ অব্যয়ঃ ॥

তিনি **মহান্** প্রভু। তিনি মনের প্রবর্ত্তক। তিনি হৃদয়ে আছেন বলিয়া মন নানা বিষয়ে ধাবিত হয়। তিনি এই সুনির্ম্মল পদ প্রাপ্তির নিয়ন্তা। তিনি অব্যয় ও জ্যোতি।

তিনি কেমন জ্যোতি ?

কথং নুতং বিজানীয়াং কিন্নুভাতি বিভাতি বা ?

আমরা তাঁহাকে কিরূপে জানিব ? তিনি কি দীপ্তিমান ?

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং
ন ইমাঃ বিদ্যুতঃ ভান্তি কুতঃ অয়ং অগ্নিঃ
তম্ এব ভান্তম্ অনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বম্ ইদং বিভাতি ॥

সূর্য্য তাঁহার কাছে প্রকাশ পায় না, চন্দ্রতারা ও প্রকাশ পায় না। এই দৃশ্যমান্ বিদ্যুৎ ও প্রকাশ পায় না। এই আমার সমীপস্থ অগ্নি কিরূপে প্রকাশ পাইবে ? তিনি দীপ্তিমান বলিয়া ইহারা সকলে তাঁহার একটু আলো পাইয়া দীপ্তি পায়। তাঁহার দীপ্তিতেই এই চন্দ্র সূর্য্যাদি দীপ্তি পায়। তিনি ভাসকের ভাসক। তিনি ধ্রুব জ্যোতির জ্যোতি।

"তৎ এতৎ" ইতি মন্যন্তে, অনির্দ্দেশ্যং পরং সুখম্।

ঋষিগণ সেই অনির্দ্দেশ্য পরমানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে "সেই এই" এইরূপ প্রত্যক্ষ ভাবে বলিয়া থাকেন।

পাঠক এখন মনে মনে ভাব—

তৎবিষ্ণোঃ পরমং পদং সদাপশ্যন্তি সূরয়ঃ
দিবীব চক্ষুরাততম্। জিনিষটী কি !

প্রণাম—

যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্‌সু
যো বিশ্বং ভুবনম্ আবিবেশ
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

তুমিইসব—

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমান্ অসি
ত্বং কুমার উত বা কুমারী
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চয়সি *
ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতো মুখঃ।
নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষঃ
তড়িদ্‌গর্ভঃ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ
অনাদিমৎ ত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে
যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বাঃ।

অর্থাৎ ভ্রমর তুমি, লালচক্ষু টীয়াপাখী তুমি, তড়িদ্‌গর্ভমেঘ তুমি, ঋতু ও সমুদ্র তুমি। তুমি অনাদি, তুমি সর্ব্বব্যাপী হ’য়ে আছ; তোমা হ’তে বিশ্বভুবন জন্মিয়াছে।

ঋষি বলিতেছেন—

স যশ্চায়ং পুরুষে, যশ্চাসৌ আদিত্যে, স একঃ।

---

* লাঠী ধ’রে বেড়াও, এমন বৃদ্ধ।

পুরুষে যে এই আত্মা আর সূর্য্যে যে ঐ আত্মা, তা এক।

মৃত্যুকাল উপস্থিত; ঋষি সূর্য্যকে বলিতেছেন—

পূষণ্, একর্ষে, যম, সূর্য্য, প্রাজাপত্য, ব্যূহরশ্মীন্।
সমূহ তেজঃ; তৎ তে রূপং কল্যাণতমং তৎ পশ্যামি।
যঃ অসৌ, অসৌ পুরুষঃ সঃ অহম্ অস্মি।

হে জগৎপোষক, হে এককগামী, হে লোকদিগের সংযমনকারী, হে রশ্মিমান্, হে প্রজাপতিপুত্র সূর্য্য, তোমার করজাল অপগত কর; তোমার তেজ সংহৃত কর; তোমার যেটী কল্যাণতম রূপ সেইটী আমি দর্শন করিব। তোমার মণ্ডলস্থ ঐ যে পুরুষ তিনি আমিই।

কিন্তু এই আত্মতত্ত্ব শুনিয়াও লোক মিলে না—

শ্রবণয়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ।

শুনিয়াও লোকে ইহাকে বুঝিতে পারে না—

শৃণন্তোপি বহুবঃ যং ন বিদ্যুঃ।

বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।

নৈষা তর্কেণ মতিঃ অপনেয়া। নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ।

যে পাপ ছাড়ে না, সে তাঁকে পায় না।

ন অয়ং আত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

দুর্ব্বল তাঁকে পায় না।

ন নরেণ অবরেণ প্রোক্তঃ, এষ সুবিজ্ঞেয়ঃ বহুধা চিন্ত্যমানঃ।

যে তাঁকে দর্শন করে নাই, এমন লোকের উপদেশে তাঁকে জানা যায় না; তিনি আছেন, না আছেন প্রভৃতি নানা তর্ক উপস্থিত হয়।

যে খায় সেই পায়।

নায়ম্ আত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন
যম্ এব এষঃ বৃণুতে তেন লভ্যঃ
তস্য এষঃ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥

অর্থাৎ অনেক বেদ পড়িলেও তাঁকে পাওয়া যায় না; কথা মুখস্থ করিলেও না; অনেক শুন্‌লেও না; **যে চায় সেই পায়**; সেই সাধকের নিকট তিনি আপনার শরীর (স্বরূপ) প্রকাশ করেন। এক ভক্তিতেই পাওরা যায়।

ঋষি ব্রহ্মদর্শন করিয়া বলিতেছেন—

বেদ+অহম্ এতম্ পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
তম্ এব বিদিত্বা অতিমৃত্যুম্ এতি
ন+অন্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায় ॥

অর্থাৎ অবিদ্যা অন্ধকারের পারে এই আদিত্যবর্ণ স্বপ্রকাশ মহান্ পুরুষকে আমি জানিয়াছি; ইঁহাকে জানিয়াই মনুষ্য মৃত্যু অতিক্রম করে। ঐ গতি (অমৃতত্ব) লাভের আর অন্য পথ নাই।

এই সব ঋষিবাক্য আলোচনা করিয়া আনন্দ লাভ করিতাম। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস; তাঁহার বিশ্বরূপে অনুরাগ এবং তাঁহার প্রাপ্তির উপায়ের অন্বেষণপ্রবৃত্তি মনে আসিত।

আমার আত্মা সচ্চিদানন্দ, তাকে অসৎমায়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে। সতোবন্ধুং অসতি নিরবিন্দন। ঋষিগণ সতের বন্ধক অসতে পাইলেন।

গীতায় আছে—

দৈবী হি এষা গুণময়ী মমমায়া দুরত্যয়া।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়াং এতাং তরন্তি তে॥

আমার এই ত্রিগুণময়ী দৈবীমায়া অতিক্রম করা বড় কঠিন। যে আমাকে ধ'রে থাকে, সেই এ মায়া পার হয়। মায়ীকে ধরিলে মায়া অতিক্রম করা যায়।

যে নাগরদোলা ঘুরায়, তাকে রাজি করিলে আর ঘুরায় না। ঈশ্বর কৃপা করিয়া জ্ঞানদীপ জ্বালিয়া দিলে মায়ার অন্ধকার দূর হয়।

ত্রিগুণের বিষয় সাংখ্যকারিকার একটী চরণে বেশ বুঝা যায়—

দীপবৎ চ অর্থতো বৃত্তিঃ। সত্ত্ব, রজ, তম একত্র থাকে, কখনও ছাড়ে না। পরস্পরকে জন্মায় ও অভিভূত করে। যেমন দীপে দেখা যায়; শিখা—সত্ত্বস্থানীয়। তেল—তম; সলৃতে—রজ। শিখা প্রকাশ, আলো জন্মায়,—সব দেখাইয়া দেয়। সত্ত্বগুণের এই কাজ ভাল মন্দ, পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ সব স্পষ্ট ক'রে ব'লে দেয়। রজ—আসক্তি। সলৃতের টানে তেল আসে। তেল—তম; তাতে ডুবলে শিখাও নিভে। আবার তেল ও সলৃতে বেশী পুড়লে খুব আলো হয়,—খুব সত্ত্ব বাড়ে। অর্থাৎ এ দুটা ঐ একটীকে জন্মায়। এইরূপ সরু সলৃতের আলো কম,—তেল পুরে কম আর এরা ক্ষণকালও চুপ ক'রে থাকে না,—একটী পরিণতি হইতেছেই। শিখাটী যে দেখা যায়, এক থাকায়; কিন্তু তাও নয়—প্রতিক্ষণে ভিন্নরূপ, সূক্ষ্ম ধরা যায় না।

রজ ও তমতে ডুবে থাকিলে ঈশ্বরের রাজ্যের দিকে যাওয়া যায় না। এ জন্য সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত করিতে হয়। গীতায় ত্রিগুণের কথা বড়ই হৃদয়গ্রাহিনী। উহা পড়িলে আত্মানুসন্ধান বর্দ্ধিত হয়,

ভাল হইতে ইচ্ছা হয়। সাধনের ইচ্ছা হয়। নিজের অসামর্থ্যে ও অধঃপাতে মনে শান্তি থাকে না। চিত্ত-ব্যায়ামভূমিতে পাপপ্রলোভনের সহিত এবং রজ ও তমগুণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়; হিতেচ্ছা ক্রমেই জন্মিতে থাকে।

মোক্ষদ্বারের দ্বারপালদিগকে প্রীত করিতে ইচ্ছা হয়,—সৎসঙ্গ, বিচার, সন্তোষ ও শম। অদৃষ্টক্রমে আমি মধুর সঙ্গ পাইয়াছিলাম। আমি অনেক সময় তাহা হইতে বঞ্চিত হইতাম। আমি শাস্ত্রসঙ্গ করিতাম। বিচারও করিতাম। মনকে জয় করা বড় কঠিন; তা পারিতাম না। সন্তোষ অগত্যা হ'য়েছিল। এক একটা ধ'রে থাক্‌লেই হয়—একথা শাস্ত্রে আছে। শেষে চারিটীই অনুকূল হয় ও পথ ছেড়ে দেয়।

আর চেষ্টা ছাড়িতে নাই—

সর্ব্বস্বে জীবনায় অলং নিখাতে পুরুষস্য যা।
চেষ্টা তাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা যোগিনঃ কৃতকৃত্যতা॥

অর্থাৎ সর্ব্বস্ব গেলেও পুরুষের কেবল চেষ্টা থাকিলেই বাঁচিতে পারে; দুটী খেতে পায়। চেষ্টাই জীবের একমাত্র ভরসা। সৎসঙ্গে সাধক কাঠুরের মত গাছ কেটে পথ ক'রে চ'লে যায়—

যৈস্তু সৎসঙ্গ পাষাণ-শিতেন মমতাতরুঃ।
ছিন্না বিদ্যাকুঠারেণ তে গতা তেন বর্ত্মনা॥

যদি অশক্যং ইতি জ্ঞাত্বা
ন করিষ্যন্তি মানবাঃ
কর্ম্মণি উদ্যমং উদ্‌যোগ
হাস্যাঃ হানি স্ততঃ পরং॥

উৎযোগ নাই, পুরুষকার নাই ; হবে না ভেবে যদি না করে, ও আমার অসাধ্য এই ভেবে যদি কাজে উগ্যম না করে, তবে উদ্যম অভাবে অত্যন্ত হানি হয়।

আরভেত নরঃ কর্ম্ম
স্বপৌরুষং অহাপয়ন্।
নিষ্পত্তিঃ কর্ম্মণঃ দৈবে
পৌরুষে চ ব্যবস্থিতাঃ।

মানুষ পুরুষকার না ছেড়ে কার্য্য আরম্ভ করবে। কর্ম্ম সমাপ্তি দৈব ও পুরুষকার উভয়ের উপর নির্ভর করে। এসব আমি মার্কেণ্ডেয় পুরাণে পড়িয়াছিলাম।

চৈতন্য দেবের একটী কথা বড় মনে লাগিল—

নামাণি অকারি বহুধা, নিজসর্বশক্তিঃ
তত্রার্পিতা, নিয়মিতঃ স্মরণে নকালঃ,
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্, মমাপি
দুর্দ্দৈবম্ ঈদৃশম্, ইহ অজনি ন অনুরাগঃ॥

তোমার অনেক নাম। সেই নামে তোমার সর্বশক্তি আছে। নাম স্মরণের কোন কাল নিয়ম নাই। হে ভগবান্, তোমার এমনই কৃপা। কিন্তু আমার এতই মন্দ ভাগ্য যে ইহাতে অনুরাগ জন্মিল না। নামে পাপক্ষয় হয়। তবে ভক্তি হয়, আনন্দ হয়। নানক বলিয়াছেন "প্রভুকা সুমিরণ মন্‌কা মলু যাই। হৃদ্‌মে অংমৃত সখাই"। না ডাক্‌লে ভজ্‌লে, ওজগতের কিছু জানা যায় না।

গোবিন্দদাসের কর্‌চায় আছে—

পর্বতের গুহা মধ্যে কি আছে কে জানে।
বাহির হইতে তত্ত্ব জানিবে কেমনে?

সেইরূপ জড় জগতের সূক্ষ্মভাব।
কার সাধ্য স্থূল ভাবে (১) করে অনুভব॥
জড়ভাব ছাড়ি যবে চৈতন্যময় হবে
তখন কৃষ্ণের মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে॥
স্বতন্ত্র (২) কৃষ্ণের ইচ্ছা জড়ে (৩) দিলা শক্তি।
সেই দেখিবারে পায় আছে যার ভক্তি॥
জড় আর চৈতন্যে গাঁইট্ লাগা আছে।
সে খুলিতে পারে যার রজতম গেছে॥

ভাগবতে— পরাভবঃ তাবৎ অবোধ জাতঃ
যাবৎ ন জিজ্ঞাসতে আত্মতত্ত্বম্।
যাবৎ ক্রিয়াঃ তাবৎ ইদং মনঃ বৈ
কর্ম্মাত্মকঃ যেন শরীরবন্ধঃ॥

আত্মা চৈতন্যময় হইয়াও দেহের মধ্যে ঢোকে এই পরাভবটী অজ্ঞান হতে হয়। আত্মাকে যতদিন জানিতে না চায়, ততদিন এ পরাভব থাকে। কারণ যতদিন কায থাকে, ততদিন এই মনের কর্ম্ম স্বভাবতা থাকে। সেই কর্ম্মাত্মক মনে বন্ধন হয়।

১ ৩ ২ ৪ ৫
এবং মনঃ কর্ম্ম বশং প্রযুঙ্‌ক্তে। এইরূপে পূর্ব্বজন্মকৃতকর্ম্ম মনকে বশীভূত রাখিয়া কর্ম্মনিষ্ঠ রাখে। ঈশ্বরকে ধরিয়া কর্ম্ম করিলে, এই কর্ম্ম স্বভাবতা যায়। কর্ম্মে কর্ম্মক্ষয় হয়।

---

(১) চিত্তশুদ্ধির পূর্ব্বে।
(২) স্বাধীন।
(৩) মনে।

সৃষ্টি অনাদি।

একটা প্রশ্ন স্বতই মনে হয়—এজগতের আদি কোথায়? কবে প্রথম সৃষ্টি হইল? মানুষ প্রথম কবে হয়? কেন হয়। গীতায় আছে “প্রকৃতিং পুরুষং চৈব, বিদ্ধি অনাদী উভৌ অপি।” প্রকৃতি ও পুরুষ (জীব) দুই অনাদি। শাস্ত্রের কথায় এই বুঝি, যে অজ্ঞানের মধ্যে থাকিয়া জগতের মূলতত্ব জানিবার উপায় নাই। তবে শাস্ত্রে যে কয়েকটী যুক্তি আছে, তাতে খুব প্রীত হওয়া যায়। মনের শান্তি হয়। মানুষ দুরকম; জ্ঞাননিষ্ঠ ও ভক্ত। জ্ঞাননিষ্ঠেরা বিচারপ্রিয়; তাঁহাদের সন্দেহ মিটে না। ভক্তেরা অল্পেই সন্তুষ্ট। তাঁরা বিনা বিচারে শান্তি পান।

জগৎ বীজাঙ্কুর ন্যায় হইয়াছে। যেমন বীজ আগে কি গাছ আগে বলা যায় না, সেইরূপ সৃষ্টির মূল বলা যায় না। জগৎ অনাদি কাল হইতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হইতেছে। একই জীব প্রবাহ “ভূত্বা ভূয়ঃ প্রলীয়তে।” ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতেছে। তাই বেদের পুরুষসূক্তে আছে—“সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বং অকল্পয়ৎ”। পূর্ব্বকল্পে যেমন ছিল, পর কল্পেও বিধাতা সূর্য্য চন্দ্র সেইরূপ সৃষ্টি করিলেন।

হিন্দু কর্ম্মবাদী। কর্ম্ম করিলেই ফল ভোগ করিতে হয়। না করিলে হয় না। যদি ঈশ্বর প্রথম কোন জীব সৃষ্টি করিতেন, তবে সে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে “আমি কি করিয়াছি যে আমাকে কর্ম্মফল ভোগের জন্য দেহের মধ্যে পুরিলেন?” ইহার নাম “অকৃতাভ্যাগম।” আর এরূপ সৃষ্টি করিলে, স্রষ্টাকে নির্দ্দয় ও পক্ষপাতী বলিতে হয়। কারণ কাহাকেও তিনি, পুণ্যবান্, সুখী, নিরোগ ও ধনী করিয়াছেন, কাহাকেও বা তাহার বিপরীত করিয়াছেন। যে ঈশ্বর এরূপ সৃষ্টি

করিতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই বৈষম্য ও নৈর্ঘ্ণ্য বিশিষ্ট। মঙ্গলময় ঈশ্বরের এ বৈষম্যও নৈর্ঘ্ণ্য দোষ নিতান্ত অসম্ভব। তৃতীয় কথা এই যে, ঈশ্বর অকারণে সৃষ্টি করিলে মুক্তিশাস্ত্র-বেদাদি-প্রকাশ করা, তাঁহার নিষ্প্রয়োজনে হইয়াছে। কারণ বহু কষ্ট করিয়া মুক্তিলাভ হইল। ঈশ্বর আবার তাহাকে সংসারে পাঠাইয়া দিলেন। তবে আর মুক্তিতে লাভ? যাঁহারা মুক্তি মানেন, তাঁহাদের কাছে বেদান্তের এ যুক্তিগুলি অকাট্য।

যে তাঁহার উপর ষোল আনা ভার দেয়, তাঁহার ষোল আনা ভার ঈশ্বর নেন,—বাবার মুখে শুনিয়াছি।

গোয়ালপাড়ায় একটি ভদ্রলোক চাকরি করিতেন। তিনি জাতিতে বৈদ্য, নাম মনে নাই। তাঁহার কাছারী আসিতে প্রত্যহ দেরী হইত। সন্ধ্যা আহ্নিকে তাঁহার অনেক সময় যাইত। তাহাতেই সময় মত আসিতে পারিতেন না। কয়েকদিন সাহেব তাঁহাকে তাড়া দিলেন। কিন্তু তাঁহার অভ্যাস সুধ্‌রিল না। সাহেব দেখিলেন, এ নিয়ম মানে না। তখন একদিন তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন "তুমি আমার হুকুম সত্ত্বেও দেরী করিয়া আইস কেন?" তিনি বলিলেন "হুজুর, সন্ধ্যাপূজা হিন্দুর অবশ্যকর্ত্তব্য নিত্যকার্য্য। তাহাতেই আমার বিলম্ব হয়।" সাহেব বলিলেন "তা বেশ, তুমি হয় চাকরীই কর; আর না হয় সন্ধ্যাপূজাই কর। তুমি চাকরী করিবে কি না, আমাকে বল।" তিনি একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন "সাহেব আমি ইহার উত্তর কাল দিব।" সাহেব বলিলেন "আচ্ছা"।

ঐ ভদ্রলোক বাড়ী গিয়া কাহাকেও কিছু বলিলেন না। সমস্ত রাত্রি ভাবিলেন। অনেক প্রার্থনা করিলেন। শেষে বলিলেন "মা, এত কাল পরে অর্থের জন্য তোমায় ছাড়িব? তা ত পারিব না।"

চাকরী না করাই স্থির করিলেন। পরদিন কাচারী আসিয়া সাহেবকে বলিয়া গেলেন "সাহেব, আমি পূজা ছাড়িব না। চাকরীই ছাড়িলাম।" সাহেব বলিলেন "সে বেশ কথা।"

ভদ্রলোক বাসায় গিয়া পূজা সন্ধ্যার মাত্রা আরও বাড়াইয়া দিলেন। সংসারে যৎপরোনাস্তি কষ্ট উপস্থিত হইল। দিনপাত হয় না। কিন্তু তাঁর ভ্রূক্ষেপ নাই। তাঁর স্ত্রী বাঁধাবিক্রি দিল। কোন প্রকারে আহার সংস্থান করিতে লাগিলেন। বসিয়া খাইলে রাজার ধন ফুরায়। তাঁহাদেরও আর চলিল না। এক আহারে, এক উপবাসে দিন যাইতে লাগিল। শেষে আর অন্ন জোটেই না। তখন তাঁর স্ত্রী তাঁকে বলিলেন "একটি উপায় কর; আর ত দিন যায় না। কেহ যে চাউল-ধারও দেয় না।"

ঐ ব্যক্তি খুবই উপাসনানিষ্ঠ ও ঈশ্বরে নির্ভরশীল ছিলেন। বড়ই দুঃখে দিন যাইতেছে। শেষ রাত্রিতে নিদ্রা নাই। একদিন শেষ রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলেন—একটী স্ত্রীলোক, সধবা, বলিতেছেন "কাল ভোরে উঠিয়া আকাশের দিকে তাকাইও। যা দেখিবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। তিনি আর ঘুমাইলেন না। প্রভাতে দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন—একটী শকুনি উঠিতেছে। পাখী ক্রমে পাহাড়ের দিকে উড়িয়া চলিল। ঐ ব্যক্তি তাহার অনুসরণে হাঁটিয়া চলিলেন। পাখী তাঁহাকে ফেলিয়া যায় না। সে তাঁহাকে লইয়া চলিল। তিনি ক্রমে দুর্গম বনে প্রবেশ করিলেন। মনে ভয় হইল। সে বনে বাঘ ভালুক থাকে। বন্যজন্তুর গমনাগমনের পথ দেখিতে পাইলেন। আরও কিছু অগ্রসর হইলে মৃত জন্তুর গলিত দেহের দুর্গন্ধ আসিল। মনে করিলেন, নিকটেই হয়ত বাঘ কোন জন্তু মারিয়া খাইয়াছে। তাহারই পচাগন্ধ বাহির

হইতেছে। কিন্তু তিনি ফিরিলেন না। উপরে তাকান, আর অগ্রসর হন। শেষে শকুনিটী ঘুরিয়া ঘুরিয়া নামিল। একটী মড়া গাছের ডালের উপর বসিল। ভদ্রলোকটী তথায় গিয়া দেখেন, চারিদিকে জঙ্গল, মধ্যে একটী স্থান পরিষ্কার। একটী মড়া দাঁতাল হাতী পড়িয়াআছে। ঐ স্থানে অনেক হাতীর পায়ের দাগ। পাহাড়ের কোন কোন স্থানের মাটী অতিশয় লবণাক্ত। বনের হাতী দল বাঁধিয়া নোনামাটী খাইতে আসে। ভদ্রলোক বাসায় ফিরিয়া গিয়া লোকজন সঙ্গে করিয়া আনিয়া দাঁত দুটী কাটিয়া লইলেন এবং হাতীটীকে পুঁতিয়া ফেলিলেন। ঐ পাহাড় মেছপাড়ার জমিদারদিগের জমিদারী। ভদ্রলোকটী উক্ত জমিদারের নিকট গিয়া ঐ পাহাড়ের কয়েক বিঘা জমিতে পত্তন হইবার ইচ্ছা জানাইলেন। জমিদার পতিত জঙ্গলজমি আগ্রহ করিয়া সামান্য খাজানায় তাঁহাকে দিলেন। তারপর ঐ ভদ্রলোক ধার করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া, ঐ স্থানে একটী হাতী ধরার খেদা প্রস্তুত করিলেন। তাহাতে অনেক হাতী ধরা পড়িত। তিনি তাহা বিক্রয় করিয়া বেশ ধনী হইয়া উঠিলেন। তখন যে সাহেব তাঁহাকে সন্ধ্যা আহ্নিক করিতে বলিয়াছিল, সেই তাঁহাকে বলে,—তোমার খেদায় অনেক হাতী পড়ে; সে গুলি সরকার বাহাদুরের নিকট বিক্রয় কর না কেন? তিনি বলিলেন, প্রয়োজন হইলে আপনারা সব হাতী নিতে পারেন। ঈশ্বর কৃপা করিরা এইরূপে তাঁহার দারিদ্র্য মোচন করিলেন।

সাধন করিলে যে সিদ্ধ হয়, বাবার কথাতেই আমার বিশ্বাস হইয়াছিল। তিনি তাঁহার মাতার সাধনের কথা বলিতেন। পিতামহের মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার মালা লইয়া দিনরাত্র এমন জপ করিলেন যে পাগলের মত হইয়া উঠিলেন। তিনি রাত্রিতেও প্রদীপ

জ্বালিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া জপ করিতেন। তন্ত্রে এরূপ সাধনের কথা আছে। বৈদ্যনাথ দাস আমাদের প্রাচীরের নিকটে বিল্বমণ্ডপে তীব্র সাধন করিতেন। নদীতে * যখন তাঁহার আসন ভাঙ্গিয়া লয়, তখন লোকে পঞ্চমুণ্ড নদীর জলে পড়িতে দেখিয়াছিল।

একদিন বাবার কাছে বসে আছি। রমেশ বাবুর বেদের বঙ্গানুবাদ বাহির হইয়াছে। বাবা কিনে এনে পড়েন। আর আমার সঙ্গে আর্য্যগণের কথা বলেন। দুঃখের বিষয় আমি তখন মূল ঋগ্বেদ পড়ি নাই। অগ্নির উপাসনার কথা, হোমের কথা হইল।

বাবা বলিলেন, যেটী যার দরকার, নাহলে প্রাণ বাঁচে না, সে তাকে ভালবাসে। সকলের আগে ভালবাসে। আর্য্যগণ দেখিলেন,—সূর্য্য, বিদ্যুৎ, অগ্নি, সব এক। আর এ না হলে, সৃষ্টি থাকে না। আর তাঁদের বাসস্থান যেরূপ শীত প্রধান ছিল, শীতকালে গাছে একটী পাতা থাকিত না, (হিমেবপর্ণা মুধিতা বনানি) যেখানে আগুন ছাড়া বোধ হয় এক মুহূর্ত্ত থাকা যাইত না;—এ অবস্থায় অগ্নিকে ভক্তিকরা, অগ্নির উপাসনা করা, আপনি আসে।

আমি বলিলাম—পিতৃগণ জড় অগ্নির উপাসনা করিতেন না। তাঁহারা অগ্নির অধিষ্ঠিত দেবতার উপাসনা করিতেন; আর তাঁহারা দেখিতেন যে, অগ্নি যখন সর্ব্বত্র আছেন, তখন সেই দেবতাও জলে, স্থলে, আকাশে, সর্ব্বত্র আছেন! তিনি সর্ব্বব্যাপী—স্বপ্রকাশ। দয়াময়। ভক্ত বৎসল। কামনা পূরক।

বাবা বলিলেন—তা সত্য; হিন্দু জড়ের উপাসনা করিবেন কেন। হিন্দু, উপাধিতে ব্রহ্মেরই উপাসনা করেন। আমরা এই যে প্রতিমা গড়িয়া পূজা করি, এ পৌরাণিক উপাসনা পদ্ধতিও উপাধিতে

* পদ্মা নদী।

উপাসনা। আর উপাধির অন্ত নাই। তিনি এক উপাধি বশত, এত ভেদ। শঙ্করের কথা কেমন সুন্দর—

উপাধৌ যথা ভেদতা সন্মনীনাং
তথা ভেদতা বুদ্ধিভেদেষু তেষু।
যথা চন্দ্রকানাং জলে চঞ্চলত্বং
তথা চঞ্চলত্বং তবাপীহ বিষ্ণো॥

তিনি এক, উপাধি ভেদে ভেদ। বুদ্ধি ভেদে ভেদ। তুমি আমি বাস্তবিকই একই চৈতন্য। জলে ঢেউ উঠলে চন্দ্রবিম্ব অনেক দেখায় ঢেউএর জন্য। চন্দ্র কিন্তু এক।

তারপর বাবা বলিলেন—আমি যখন গোয়াল পাড়ায় ছিলাম, তখন কড়ুই বাড়ীতে একজন পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর নাম বোধ হয় কালীচরণ অগ্নিহোত্রী। নামটী আমার ঠিক মনে নাই। তিনি নিত্য হোম করিতেন। যাকিছু উপকরণ থাকিত, সবই আহুতি দিতেন। শুনিয়াছি, কাপড় পর্য্যন্ত আহুতি দিতেন।

এইরূপ কিছুদিন যায়। তাঁর আরো দুই ভাই ছিল। তাঁহারা ব্যবসা বাণিজ্য করিতেন। তিনি একদিন তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা দোকানপাট উঠাইয়া দেও। আমার সময় উপস্থিত। আমার অভাবে তোমরা এ সব কাজ করিয়া সুবিধা করিতে পারিবে না।" তাঁহারা দেখিলেন, অগ্রজের কোন ব্যারাম পীড়া নাই, বেশ সুস্থ বলিষ্ঠ; এজন্য তাঁর কথা বিশ্বাস করিলেন না। তাঁহারা বলিলেন, আপনি কি করে জানিলেন যে আপনার সময় নিকট। আপনার তো কোন অসুস্থতা নাই।

তিনি বলিলেন—তা না থাক্। সবাইকে কি রোগ ব্যাধিতে ভুগে মর্তে হবে? আমি অগ্নির উপাসনা করিয়া আসিয়াছি। অগ্নিই

আমার ইষ্ট-দেবতা। আমার ইষ্ট-দেবতা প্রত্যক্ষ হইয়াছেন। আমি চারিদিক অগ্নিময় দেখি। ইষ্ট-দেবতা প্রত্যক্ষ হইলে, সেই ব্যক্তির জীবনের কাজ হইয়া যায়। সে আর বেশী দিন সংসারে থাকে না। চল আমরা বাড়ি যাই, এখানে আর থাকিয়া দরকার নাই।

তাঁহারা অগ্রজের কথায় তেমন বিশ্বাস করিলেন না; কয়েকদিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

এই সব কথায় আমার বড় বিশ্বাস হইত। বাবা হিন্দুযুগ ও ইংরেজ যুগ, দুইই দেখিয়াছেন। হিন্দু সাধন দ্বারা যে সিদ্ধ হইতেন, সিদ্ধির চেষ্টা যে বাতুলতা নয়, বাস্তবিক ফল হয়, তাতে বাবার কথায়ই আমার ধারণা হইয়াছিল। আর বাবা প্রায়ই বলিতেন সাধনা কি, তা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আমাদের বাড়িতেই দেখিয়াছি। সে বড় শক্ত ব্যাপার। আজকাল কেবল কথা আর কথা। সাধন এ মুখ ভারতীর কথা নয়।

মধু পাগল।

এইরূপে দিন যায়। পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে একবার বাড়ী গেলাম। তখন সোমবার করিতাম। একদিন বেলা ৩টার সময় বাড়ীর পশ্চিমে জামগাছ তলায় বসিয়া আছি। মধু পাগ্লা আসিয়া উপস্থিত। আসিয়া বলিল "বাবু চাড্ডা ভাত দেন্, ভাত মাত দেন"। আমি বলিয়া উঠিলাম্, এত বেলায় তোকে কে ভাত দিবে। একি ভাতের সময়। সময়ে আসিল ন্যা। এখন ভাত নাই। মধু বলিল "রাগেন

ক্যান? ভাত মাত কি আপনি দেন। আপনি যেখান থিকে পান, আমিও সেখান থিকে পাই। তয় পাই আপনার হাত দিয়ে”।

আমি মরমে মরিয়া গেলাম। একি পাগল? পাগল কি এমন কথা কয়। অতি নরম হইয়া বলিলাম, মধু, তুমি একটু বসো। আমি দেখিয়া আসি। এই বলিয়া আমি বাড়ীর ভিতরে গেলাম। ভাত বাড়িতে যেটুকু বিলম্ব। আসিয়া দেখি, মধু আর সেখানে নাই।

আমার জীবনের সহিত যাহাদের জীবন বড় সংস্পৃষ্ট তার মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান মধু পাগ্‌লা; মধু জাতিতে নমঃশূদ্র; বাড়ি আমাদের গ্রামের আধক্রোশ উত্তরে হাটখালী। ওর বাপের নাম নবীন প্রামাণিক। জেঠার নাম শুকচাঁদ প্রামাণিক। তারা খুব ভাল মানুষ ছিল। তার মা মাসী ছিল। তারাও খুব ভাল মানুষ ছিল। ওর দু ভাই এখন ও জীবিত আছে। আমাদের গ্রামে একটী হাট আছে। মধু সেই খানে প্রায় থাকিত। যৌবনেই সংসার ত্যাগ করিয়াছিল। বিবাহ করে; কিন্তু স্ত্রী মরিয়া যায়। মধুর শ্বশুরের নাম চৈতন্য প্রামাণিক। মধু হাটে বাজারে পড়িয়া থাকে। আগে ভিক্ষা শিক্ষা করিয়া হাটের উপরে রাঁধিয়া খাইত। পরে দশদ্বারে যা পাইত তাই খাইত। মধু আমাকে ভালবাসিত এবং ভালবাসিয়া ভালবাসা শিখাইয়াছিল। তাই মধুকে আমি বড় ভালবাসি। অহৈতুকী ভালবাসা—অকারণ স্নেহ যে জিনিষটা কি, তা মধুর শরীরেই দেখিয়াছি। এজীবনে আর ভূলিতে পারিব না।

মধু কেন পাগল, তাহা কেহ জানে না। ভারতে যে এমন কত পাগল বনের ফুলের মত আপনি ফুটে আপনি ঝরিয়া যায়—তা কে বলিতে পারে? তাহারা কি কিছু রাখিয়া যায়, কে বলিতে পারে? এত জ্ঞান, এত ভক্তি, এত শক্তি—অমূল্যরত্নরাজি—শুক্তির মধ্যে

মুক্তার মত কেহ দেখিতে পায় না। ঈশ্বরের ব্যাপার কিছু বুঝি না। যে রাজ্যে তৃণগাছটী নষ্ট হওয়ার নিয়ম নাই, সেখানে কি এরা নষ্ট হয়? মধুর পাগলামী এই যে, মধু গৃহ ত্যাগ করিয়াছে; যেখানে সেখানে নিদ্রাভিভূতের ন্যায় পড়িয়া থাকে। আর তিনটী কথা সে প্রায়ই বলে। এই তার পাগলের লক্ষণ। নতুবা তার ব্যবহারে হিন্দু মুসলমান, স্ত্রী পুরুষ, সকলেই অতি সন্তুষ্ট। কোন স্ত্রীলোক ভাত দিতে আসিলে, মধু দশ হাত সরে বসে। মধু সময়ে সময়ে অনেক হাসি তামসার কথাও বলে।

সেই তিনটী কথা,—ভগে মালী, মনে ভাঙ্গী, কুদী নারী।

ভগেমালী অর্থঃ— ভগবান ঈশ্বর। তিনি ঠিক মালাকার। মালাকার এক জাতি আছে ; তাহারা সোণার ফুল, আতস বাজি প্রভৃতি বানায়। মধুর মতে ঈশ্বরও তাই।

তিনি মায়াদ্বারা এই বিচিত্র সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন। বাস্তবিক ইহা অসত্য। মধু সততই বলিত, "বাবু. এসব মিছা" কেবল ঈশ্বরই সত্য। মধু একদিন বলেছিল, "ভগে মালী মানুষটা ভালই, আমাদের খাতে দেয়, খাড়া রাখে, ঘুম পাড়ায়। সূর্য্যের দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া—ঐ দেখেন আকাশে একটা ফানশ উড়াইতেছে। ওটা আপনারাই রাখেন। (অর্থাৎ এ জ্ঞানটা আপনারা শিখেন) আজ্ঞা আচ্ছা। আর ভগে মালীকে ডাক্‌বেন। একটা ভাল মেয়ে (ভক্তি) রাখে দেবেন। (ঈশ্বরকে ভক্তি করিলেই পুরুষ যেমন স্ত্রীর বশ হয়, সেইরূপ বশ হন) আমি মনে করিতাম মধু ভক্ত। কিন্তু ভক্তের লক্ষণ দেখিতাম না। মনে করিতাম ওরা প্রচ্ছন্ন। জড় উন্মত্ত পিশাচের মত থাকে। সে আর একদিন বলিয়াছিল "ভগে আমাগেরে দিয়া আপনার মানুষ করে। আবার আপনার

দিয়া আর একজনের জ্ঞান বুদ্ধি দেয়। এই রকমই তার কাম (কায)। তাতো কারো বোঝার যো নাই। সে সোলার তাদিয়ে সব (পুতুল টুতুল) বানায়ে বাতাস করে, আর মোট চল্‌তি থাকে।" আকাশের দিকে আঙ্গুল দিয়া "এই যে ঘুন্নী (ঘুড়ী) যেমন আকাশে থাকে ঐ রকম। এই দুইটি কথায় দুইটি ইঙ্গিত আছে। এই সূর্য্যটা আপনি রাখেন অর্থাৎ সূর্য্য যেমন জগৎ প্রকাশ করেন, সেইরূপ জগৎরহস্য জানিবার একটা জ্ঞান আছে, জানিবার উপায় আছে; সেটা আপনি আমার নিকট শিক্ষা করুন। আবার ভগে আমার দ্বারা আপনার মুক্তিসাধন করে, অবিদ্যা অন্ধকার ঘুচাইয়া ব্রহ্মজ্ঞান দেয়। আবার আপনার দ্বারা অপরের মুক্তি সাধন করে। মধু তাহার বিদ্যাটি আমাকে দিবার জন্য ঐ সময় হইতে ইচ্ছুক। সেই সাধিলাম, কিন্তু যদি তখন সাধন করিতাম কি হইত, মাই জানেন। তবে হইলে, ভিতরের তত্ত্ব অনেক জানা যাইতে পারিত। মনে ভাঙ্গী :—মন মাতাল। মত্তকরী যেমন আমরা বলি। দুর্দ্দমনীয় মনের নামই মনে ভাঙ্গী। দুঃখের বিষয় আমাদের গ্রামের এক ক্রোশ দূরে মনে ভাঙ্গী নামে একজন লোক আছে। লোকে মনে করে, মধু তারই নাম বার বার করে। সুতরাং মধু পাগল। মধু বলে, মনে ভাঙ্গী মস্ত লাঠেল, তার সাথে পারা শক্ত লাঠেলের কাজ। আমিই কোন মতে মনে ভাঙ্গীর সাথে পারি; আর কেউ আর পার্‌লো না। আমারই সে কীল দিতে আসে। আমি আবার তার নাকের উপর ২।৩টা দেই, তবে থামাই।

কুদী নারী :—কুদী নামক রাঁড়ী, বিধবা কুদী। কুদী পার্শী শব্দ, মেয়ে বুঝায়। পাবনা জেলার হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির মধ্যে ইহা খুব প্রচলিত। আর লোক প্রায়ই বিধবার মায়ায় পড়িয়া

যায়। কুদী নারী অর্থ মায়া, অবিদ্যা, অজ্ঞান। দুঃখের বিষয়, মধুর স্বগ্রামে কুদী নামে একটি নমশূদ্র জাতীয়া বিধবা ছিল। মধুর পাগলামী এইরূপ—কুদী নারী কুদী নারী, থু থু থু কলাম ১টা মন্তর। কুদী নারী কুদী নারী, থু থু থু কলাম ২টা মন্তর। কুদী নারী কুদী নারী, থু থু থু কলাম ৩টা মন্তর। এই মধুর ক্ষিপ্তভাব। এই পুস্তকের শেষভাগে ইহার অর্থ পরিস্ফুট হইবে। ইহার আসল কথা এই যে, এই জগৎ ঘৃণিত অবিদ্যার কাণ্ড। ইহা খুলিয়া দেখিলে অতি ন্যক্কারজনক।

লোকে বলে, মধু মন্ত্র লইয়া জপ করিত। তাহা ভুল হওয়ায় পাগল হইয়া গিয়াছে। আমি হাটখালীর অনেক লোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি; তাহারা ঐ কথাই বলে।

মধু আমাদের বাড়ীতে প্রায় রোজই আসিত। আমাদের বাড়ীর দক্ষিণে প্রায় ৩ বিঘা জমী পড়িয়া আছে। তাতে ৫।৬ টা আমের গাছ আছে। পূবে একটা পুকুরের মত বড় গর্ত্ত। প্রায় ১২ মাস জল থাকে।

মধু আসিয়া একটি গাছের তলায় বসিত। কখন বাহির বাড়ীর উপরে আসিয়া বাবার সহিত কথাবার্ত্তা বলিত। মধু একদিন বাবাকে বলিয়াছিল,—"কত্তা আমার এটু হাগার জায়গা দিতে পারেন?" সকলে হাসিয়ে উঠিল। বাবা বলিলেন, তোমরা হাসিও না। উহার কথার অর্থ আছে; ও এমন কোন নির্জ্জন স্থান চায় যেখানে ঈশ্বরকে ডাকিতে পারে।

বাবা একদিন মধুকে জিজ্ঞাসা করেন, মধু তুমি পাগল হ'লে কেমন ক'রে? মধু বলিল—"কত্তা, কাত্তিক মাসে ভুঁইতে নাঙ্গল দিতি গিছি। ত জমি গেছে থরায়ে (শুকাইয়া)। গরু আর নাঙ্গল টানবের পারে

না। পীঠ ব্যাহা (বাঁকা) হয়ে যায়। তার উপর মারা লাগে। আমি একবার করে নরি (পাঁচন বারি) উঠেই, আর নিজির গায় চিমটিদিয়ে দেখি। দেখি যে নিজির গায় ৮০ মন দুক্ পাই। তয় আর মারব কেমন করে? নাঙ্গল গরু মাঠেই পড়ে থাক্‌ল। আমি চলে আলাম। সেই ইস্তকই (হইতে) মধু পাগল।”

মধু দেখিল, নিজের শরীরেও যত ব্যথা, গরুর গায়ে তত ব্যথা, কাজেই মারা হইল না। ঐ দিন হইতে মধুর সংসার ত্যাগ। বাস্তবিক বৈরাগ্য হইলে, সেই দিনই প্রব্রজ্যা। মধুর সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি। বাবা বলিতেন, মধুর ভাষা পবিত্র, মন পবিত্র, দৃষ্টি পবিত্র। কখনও উহার কুভাব বা কুকথা মনে পড়ে না। মেয়ে মাত্রকেই মাঠাকুরাণী বলে। একদিন আমি বলিলাম, মধু এত বেলায় কোথা হতে এলে? মধু বলিল—“কত্তা পেশাকার মা ঠাকুরুণ দের বাড়ী এট্টু গাঁজা খাতে গিছিলাম। গাঁজার দোকান আজ বন্ধ। আশুকত্তা (গাঁজা বিক্রেতা) আজ দোকানে নাই।

মধুর সর্ব্বজীবে দয়া। ছেলেরা তামাসা দেখিবার জন্য একটা কুকুর কি ছাগল ধরিয়া মধুর সম্মুখে লইয়া মারে। আর মধু দোহাই থাহই পাড়ে। যখন তারা কথা শুনেই না, তখন মধু তাড়া করে। তাহারা হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পালায়। মধুর অহংকার নাই। মধুর দৃষ্টি পবিত্র ; সকল স্ত্রীতে মাতৃজ্ঞান, মাতৃসম্বোধন। ইতর জাতীয় একটি ছোট মেয়ে কে ও সে মাঠাকুরাণী বলে। আবার ছোটছোট মেয়েদের নাম কুদী মাতাঠাকুরানী অর্থাৎ তোমরাই ভুবনমোহিনী মায়া। মধুকে সকলেই ভালবাসে। এসব সহজ গুণ নয় ; বাবা বলিয়াছিলেন—”মধু খুব উঠিয়াছে। তুমি বাড়ীর ভিতর বলিয়া দিও, মধুকে যেন উচ্ছিষ্ট দেওয়া না হয়।” মধু যে একজন ভাল লোক,

তাহা প্রথম বাবার নিকট জানিতে পাই। তাহার ভাষার সঙ্কেত ও ভাবও তাঁহার নিকটই প্রথম শিখি।

মধুর ভাষা বুঝা বড় কঠিন। আমি শুনিতে শুনিতে ক্রমে শিখিতে লাগিলাম। আর মধু কিছু বলিলেই তাহা লিখিয়া রাখিতাম। আমার পকেটে কাগজ ও পেন্সিল সর্ব্বদাই থাকিত।

মধু আমাকে বড় ভালবাসিত। সে মাঝে মাঝে বলিত "বাবু গাঁজা ত খালেন না। এমন মিঠা গাঁজা"। আমি বলিতাম, মধু, গাঁজা কি মিঠা? উত্তর—"বড় মিঠা বাবু; দিনকতক খাইয়াই দেখেন। মিঠা না লাগে ছাড়ান যেন ছান। তয় আট্যা টান দিলি সেন, গাঁজা মিঠা লাগে, আস্তে টান দিলেই তিতা লাগে। আমারই কি আগে মিঠ্যা লাগ্‌তো?" আপনারা তামুক খান। ও তামুক টামুক খায়ে আর কত সুখ হবি (হবে)? অর্থাৎ রীতিরক্ষার সন্ধ্যা আহ্নিকে ঈশ্বরে অনুরাগ, প্রেম হয় না। ঈশ্বরের জন্য পাগল হওয়া চাই; তবে হয়।

আমি বলিলাম—মধু, গাজা খাওয়া ত শিখালে না? মধু বলিত—"আচ্ছা গাঁজা খাওয়াব। খুব ভাল গাঁজা। আগে একটা কল্কী বানাই। তাতেই যে কত যুগ লাগবি তার ঠিক কি?" আমি ক্রমে বুঝিলাম গাঁজা অর্থ—হরিনাম। ইহা ছোট্ট, অল্প কিন্তু টানিলে খুব নেশা হয়। তামাক—নিত্য উপাসনা। ওতে কিছু হয় না। ঈশ্বরের জন্য পাগল হওয়া চাই। তারই নাম গাঁজা আটিয়া টানা। আর কল্কী—বিশ্বাস। গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস না হইলে কেহ তাহার অনুষ্ঠান করে না। এজন্য গুরুর প্রথম ও প্রধান কাজ শিষ্যের বিশ্বাস জন্মান। কিছু নুতন, কিছু আশ্চর্য্য দেখিলে ত বিশ্বাস হয়। কাজেই ইহা গড়ান সময় সাপেক্ষ। অনেক যুগলাগে। কথাগুলি বেশ আমি গীতার

সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছি। ঠিক মিলে। গীতায় আছে "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।" যার গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাস আছে, সেই ঈশ্বর জ্ঞান লাভ করে। কেবল বিশ্বাসে হয় না। তৎপরতা চাই। অর্থাৎ গুরু যা বলেন সেইটি প্রধান কাজ হওয়া চাই। দিবানিশি তাই লইয়া থাকিতে হইবে। আর সর্ব্বোপরি ইন্দ্রিয় সংযম চাই। নতুবা ও দুটি থাকিলেও কিছু হয় না। গুরু বলিলেন, রাত্রিতে জপ করিতে। শিষ্য হয়ত পেটুক। খেল অনেক ভাত। শেষ নিদ্রা। এই কাণ্ডের উপসংহারেও এইটি বেশ বুঝিতে পারিবেন।

বিশ্বাসের পর, কাম, ক্রোধ ও লোভ জয়ই সাধনের প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন। এরা নরকের দ্বার। সাধক এই তমোদ্বার ছাড়াইলে আত্মহিতানুষ্ঠান করিতে পারে। ইহা ভিন্ন জীবে দয়া, সংসারে বৈরাগ্য প্রভৃতি নানাকথা নানাভাবে বলিত। নিত্য নূতন ভাব। যার দৃষ্টি মূলে, সেই এমন সব বলতে পারে।

আমার সাথে মধুর যে কথাবার্ত্তা হইত, তাহার বিশেষত্ব এই যে আমি মুখে কোন প্রশ্ন করিতাম না। আমার কথা মনেই থাকিত। মধু উত্তর দিত। আমি ইহা বহুবার নানাবিষয়ে পরীক্ষা করিয়াছি। তবে মধুর উপর আমার বিশ্বাস হয়। আমার ভাইয়েরা বলিত, ও হয়ত thought reading জানে।

ক্রোধ জয়ের উপায়বিচার ও জীবে দয়া।

মধু একদিন আমতলায় আসিয়া বসিয়াছে। একটি রাখালের পায়ের উপর গরুর পা পড়ায়, সে গরুটিকে মারে; ইহা দেখিয়া মধু

বলিল—"বাবু, গরুতে পাঁড়ালেও আমি কিছু বলি না। তার যখন চারখান পা; আর আমার গায় আশীমণ তুকু, তার গায় হাত দিব কি বলে?" অর্থাৎ আমাদের দুইখানা পা সামলাতে পারি না। ওর ত চারখানা। তাতে বুদ্ধিহীন গরু। আর নিজের শরীরে যখন এত ব্যথা, তখন ওর গায়েও ব্যথা আছে। একদিন মধু খাইতেছে, পেছনে একটা কুকুর বসিয়া আছে। মধু দেখিতে পায় নাই। মধু যখন উঠে যায়, তখন কুকুরটিকে দেখিয়া বলিল—"আহা, পাছে বসে আছিস্। চাতে হয়। কিছুই রাখি নাই। তোকে দেখিই নাই। ছিষ্টিকত্তার কিছু বুঝি না। জ্ঞান বুদ্ধি দেছে, কথা দেয় নাই। চাতে পারে না। তা হলে খাতে দিতে হয়। কি, কথা কয়ই?—আমরা বুঝি না।" এই কুকুরটী মধুকে এত ভালবাসিত যে মধুর কথা শুনিবা মাত্র ভাত ফেলে মধুর কাছে ছুটিয়া যাইত।

রস ও লোভ জয়ের উপায়।

মধু প্রায়ই আমাকে বলিত—"বাবু, একদিন পিঠ্যা মিঠ্যা পায়েস্ টায়েস্ খাওয়ান না ক্যা (কেন)?" আমি মাঝে মাঝে মধুকে পায়েস পিঠা খাওয়াইতাম। একদিন প্রচুর পিঠা পায়েস দেওয়া হইয়াছে। প্রথমেই ২।১ খানা মালপুয়া পিঠা কুকুরকে দিল। খাইতেছে আর মাঝে মাঝে চাখিতেছে ও থুথু করিতেছে। অর্থাৎ মানুষ এইরসে আসক্ত হইয়া ব্রহ্মরসে বঞ্চিত হয়। ভাগবতে আছে—রসটা বড়ই দুর্জেয়। সকল ইন্দ্রিয়ের চেয়ে এ বলবান। "জিতং সর্ব্বং জিতে রসে",—রসজয় করিলে সব জয় করা হইল। রসের বলবৃত্তা এজন্য যে, অন্য ইন্দ্রিয় ভোগাভাবে দুর্ব্বল হয়। রস বৃদ্ধি পায়। তার পর সব পিঠা খাওয়া হইল। অনেকটা পায়েস পাতে থাকিল। আর

খাইতে পারে না। তখন বলিতে লাগিল—য়ঁ্যা অ্যামন্ পাপ করবো ক্যান্? খাতে না পারে আর একজনের দেব ক্যান? এই বলে গপ গপ করে মুখে গুঁজে দিয়ে গিলিয়া ফেলিল। মধু এইপ্রকারে ঠাসিয়া খাইয়া মাঠের মধ্যে গিয়া বমি করিয়া তুলিয়া ফেলিত। লোকে এজন্য মধুকে লোভী পেটুক ভাবিত। সে কিন্তু লোক শিক্ষা দিবার জন্য ঐরূপ করিত। মধু শিখাইল, খাইতে না পারিয়া অন্যকে দেওয়ায় মনের উন্নতি হয় না।

একবার পৌষ মাসে আমি বাড়ী গিয়াছি। মধু প্রাতে আসিয়া বলিল—বাবু একটু খাজুর রস খাব। আমি খেজুরের রস আনিতে গেলাম। মধু ইতি মধ্যে অন্য বাড়ীতে রস খাইয়া চলিয়া গিয়াছে। ঘণ্টা খানেক পরে আসিলে আমি বলিলাম, মধু আমি রস আনিয়াছিলাম; খাইলে না? মধু বলিল; "না বাবু—রস কেতু কত্তার বাড়ী খাইয়াছি। তাও রস খাওয়া গেল না। ভোরে উঠে, কেতুকত্তা বলে, সব রসের হাঁড়িতি মুতে থোয়। এট্টু এট্টু মিঠ্যা আর সবই মুৎ। (মুখ বিকৃত করিয়া) উয়ে কি খাওয়া যায়?" অর্থাৎ রস এত মিষ্ট কিন্তু এক ঘণ্টা পরে দেখ যে উহার অধিকাংশরই পরিণাম প্রস্রাব। বুঝাইল আমরা যে বিষয় রসের জন্য পাগল, তার এই পরিণাম। মধু তাহার ভাষার অর্থ আমাকে বলিয়া দিত না। আমি ভাবিয়া ভাবিয়া অর্থ বাহির করিতাম। আমি যতই তাহাতে সমর্থ হইলাম, সে আমাকে ততই স্নেহ করিতে লাগিল।

ব্রহ্মানন্দ।

বাবার শ্রাদ্ধ হইয়া গেল। কলিকাতা হইতে রসগোল্লা টীনে করিয়া আনা হইয়াছিল। মধু চাহিয়া লইয়া গেলাসে গেলাসে ঐ রস

খাইত। "বাবু, একি ছাই! আমি ভোর রাত্রে বড় মিঠ্যা রস খাই!"

সর্ব্বজ্ঞতা ঃ—একবার জ্যৈষ্ঠ মাসে বাড়ী গিয়াছি। বাবার মৃত্যুর পর। বাহিরের আঙ্গিনায় বসে খোকাকে অঙ্ক কষাইতেছি। যেটা দেই, সেইটাই পারে না। রাগ হইল; দিলাম ঘাকতক খুব করে। মধু খাইয়া দাইয়া চলিয়া গিয়াছে। দেখি, দৌড়িতে দৌড়িতে আসিতেছে। চক্ষু দুটি লাল, গাঁজা খাইয়াছে, বলিল "ওকি? ওকি?" আমি বলিলাম "কি কি?" সে মাথা নাড়িয়া বলিল "একটা আঁড়ে বাছুরকে রোজ দামড়া কল্লি কতদিন বাঁচে?" আমি বলিলাম আর মারিব না।

রাম কৃষ্ণ পরমহংস বলিয়াছেন "যাদের চৈতন্য হয়েছে, যাদের ঈশ্বর সৎ, আর সব অসৎ—অনিত্য বলে বোধ হয়ে গেছে, তাদের আর একরকম ভাব। তারা জানে যে ঈশ্বরই একমাত্র কর্ত্তা, আর সব অকর্ত্তা। যাদের চৈতন্য হয়েছে, তাদের বেতালে পা পড়ে না। তাদের হিসাব করে পাপ ত্যাগ কর্ত্তে হয় না। ঈশ্বরের উপর তাদের এত ভালবাসা যে, যে কর্ম্ম তারা করে, সেই কর্ম্মই সৎ কর্ম্ম। তারা জানে একর্ম্মের কর্ত্তা আমি নই। আমি ঈশ্বরের দাস। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। তিনি যেমন করান তেমনই করি, যেমন বলান তেমনই বলি, তিনি যেমন চলান তেমনই চলি।"

যাদের চৈতন্য হয়েছে, তারা পাপ পুণ্যের পার। তারা দেখে ঈশ্বরই সব করেন।

এখন মধুর কথার সহিত এগুলি মিলান যাউক। মধু বলে "ভগে মালী মা মাসীর দিয়ে চড়্‌ডা থাবড়্‌ডা মারে। আবার কোলে কাঁকেও করে। সেই ভাত-টাৎ দিয়া আমাগেরে রক্ষা করে। সেই ভেদ্ টেদ্ (ওলাউঠা) দিয়ে মারে ফেলায়।"

মধু যখন প্রথম সংসার ছাড়িল, তখন তাহার ভাইরা তাহাকে বড় মারিত। সয়তানি করিয়া কায করে না ভাবিয়া ভয়ানক যন্ত্রণা দিত। পচা পাটের জাগের নিকট জলের মধ্যে পায়ে শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিত ও বলিত—"চাষ করবি না; পাট ধো ও পাগলামী ছাড়্।"

মধু ভাইদের কথা বলিত ;—দুয্যুর (দুর্য্যোধন মধুর ছোট ভাই) আমি কোলে কাঁকে করিয়া মানুষ করিছি। এখন ও ভালবাসি। ভালবাসেই মরে যাব। নাজিরগঞ্জের হাটের থ্যা (হইতে) ইলসা মাছ আনিছি; তাই দিয়ে ভাত খাওয়াইছি। তার পর দুধ দিয়ে ভাত খাওয়াইছি। তার পর জল খাওয়ায়ে আঁচায়ে কাঁথা কাপড় গায়ে দিয়ে শোয়ায়ে থুইচি। তয়গে জল টল খাইছি। ভগে মালী এখন সেই দুয্যুর দিয়ে কুঞ্চি কাটায়ে আমার মারে। ওরা আগে আমার চিন্‌তো, এহন (এখন) আর য়্যাহে বারেই (একেবারেই) চিনব্যার পারে না।"

দেখুন পরমহংসের কথা আর মধুর কথায় কোনই ভেদ নাই। মায়ার সীমার ওপারে গেলে সবাই, এইরূপ দেখে আর বলে। ওতে বামন আর চাঁড়াল বলে কোন কথাই নাই।

মধু একদিন বলেছিল "আমি জ্ঞানী"। কিন্তু ত্রৈলিঙ্গস্বামী প্রভৃতি জীবন্মুক্ত যেরূপ মৌনাবলম্বনে থাকিত, মধু সেরূপ থাকিত না। গীতায় আছে— প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।

আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্ট স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥

মধুও আত্মানন্দে বিভোর হইয়া যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিত। সে অশান্তি ভয় ক্রোধ ও সুখ দুঃখের পারে চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু

কথা বলিত এবং চাহিয়া লইত। লোকে মনে করিত তাহার স্পৃহা আছে, লোভ আছে বাস্তবিক তাহা নহে, লোক শিক্ষার্থ এরূপ করিত। সংসারীকে দিতে হয়, এইটিই সে বুঝাইত। সে বলিত মানুষধর্ম্মটা মোটেই একটা চাউল। বেদের অন্নদান এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদে যেরূপ অন্নদ্বারা সাধু গৃহস্থের সংসারধর্ম্ম করিবার ব্যবস্থা আছে, মধু ঠিক তাহাই বলিত। এই উপনিষদের উপদেশের সহিত তাহার অনেক কথার মিল হয়। উক্ত উপনিষদে আছে অন্নই পুরুষ। অন্নই ব্রহ্ম। অন্নই ধর্ম্ম।

"যয়া কয়া বিধয়া বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াৎ"। যে কোন উপায়ে বহুঅন্ন লাভ করিবে।

"শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্।" শ্রদ্ধার সহিত দিবে। অশ্রদ্ধার সহিত দিবে না। বুদ্ধির সহিত দিবে। বিনয়ের সহিত দিবে। ধর্ম্মভয়ে দিবে। মিত্রভাবে দিবে।

ইহার গল্পটি এই যে ভৃগুতাঁর পিতা বরুণের নিকট ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করেন। বরুণ বলেন "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্তি, অভিসংবিশন্তি তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব। তৎ ব্রহ্ম ইতি।" যাহা হইতে এই প্রাণী সকল জন্মে এবং জাতজীব যাঁহাদ্বারা জীবন ধারণ করে, প্রলয়ে যাঁহাতে গমন করে এবং মুক্তিতে যাঁহাতে প্রবেশ করে, তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছাকর। তিনি ব্রহ্ম। তিনি আরো বলিলেন, অন্ন প্রাণ চক্ষু কর্ণ মন ও বাক্য তাঁহাকে জানিবার উপায় বা দ্বার স্বরূপ। ভৃগুতপস্যা করিলেন; তপস্যা করিয়া জানিলেন অন্নই ব্রহ্ম। কারণ অন্ন হইতেই এই সমস্ত প্রাণী জন্মে, অন্নেই জীবিত থাকে, প্রলয়ে অন্নে গমন করে এবং মুক্তিতে অন্নে প্রবেশ

করে। তিনি অন্নই ব্রহ্ম জানিয়া আবার পিতার নিকট আসিলেন। তিনি বলিলেন, প্রাণই ব্রহ্ম। প্রাণ হইতেই প্রাণী জন্মে, প্রাণে বাঁচে ইত্যাদি। ভৃগু তপস্যা করিয়া তাহাও জানিলেন। তারপর পুনরায় পিতার নিকট গেলে তিনি বলিলেন, মনই ব্রহ্ম। মন হইতে প্রাণীকুল জন্মে ইত্যাদি। ভৃগু আবার পিতার নিকট গেলেন; তিনি বলিলেন, বিজ্ঞান ব্রহ্ম। ভৃগু তপস্যা দ্বারা তাহা জানিলেন। বরুণ বলিলেন, আনন্দই ব্রহ্ম। ভৃগু তপস্যাদ্বারা জানিলেন,—আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাৎ হি এবখলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে! আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্তি, অভিসংবিশন্তি।" কিন্তু অন্নই এই আনন্দময় ব্রহ্মের প্রথমদ্বার। অন্ন, দিয়া না খাইলে অন্নময়কোশই অতিক্রম করা যায় না। মন বালকের মত খাওয়ার জন্যই ব্যস্ত থাকে; দেহ সুখের জন্যই ব্যস্ত থাকে। ইন্দ্রিয় সুখই পরম সুখ মনে করে। মনের উর্দ্ধগতি হয় না। অন্নময়কোশই ছাড়াইতে পারে না। আনন্দময় অনেক দূরে। তাই মধু বলিত মানুষ ধর্ম্ম একটা চাউল। মধুবলিত, যে খাতে পারে একসের সে যদি তিনপোয়া রাঁধে তবে আবার খিদে লাগলে খাবে কি? মানুষ মাত্রের খিদেই এক খিদে। ক্ষুধার্ত্তকে দিবার জন্য হাঁড়িতে কিছু থাকা চাই। পেট মাপিয়া বাঁধিতে নাই।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের মতে পুরুষ অন্নরসের বিকারমাত্র। (স বা এষঃ পুরুষঃ অন্নময়রসঃ)। অন্নাৎ বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে যাঃ কাশ্চ পৃথিবীং শ্রিতাঃ। অথো অন্নেনৈবজীবন্তি অথ এন্য অপি যন্তি অন্ততঃ॥

অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠং তস্মাৎ সর্ব্বৌষধং উচ্যতে।
সর্ব্বং বৈ তে অন্নং আপ্নুবন্তি, যে অন্নং ব্রহ্ম উপাসতে॥

অন্নাৎ ভূতানি জায়ন্তে জাতানি অন্নেন বর্দ্ধন্তে

অগ্যতে অত্তি চ ভূতানি তস্মাৎ অন্নং তদুচ্যতে ॥

পৃথিবী আশ্রিত যত প্রাণী, তাহারা অন্ন হইতে জন্মে। তাহার পর অন্নদ্বারা বাঁচে। আবার শেষে অন্নেই প্রবেশ করে। অর্থাৎ যে পিতৃদেহ হইতে হয়, তাহা অন্নের বিকার; আবার শেষে পৃথিবী বায়ু জল তেজ ও আকাশ এই পাঁচটিতে মিশিয়া যায়; ইহারা অন্নের কারণ। সুতরাং অন্নেই গমন করে বলা হইল। বেদান্তমতে এজগৎ অগ্নিও সোমের খেলা। অগ্নি ভোক্তা, আর সোম অন্ন। আবার আগুনকে যখন জল দিয়া নিভায়, তখন অগ্নি অন্ন, জল অন্নাদ; এইরূপ যে অত্তা সে কখন অন্ন। যে অন্ন সে কখন অত্তা। আবার অন্নও অত্তা এই ব্রহ্ম। তিনি ভক্ষক ও ভক্ষ্য হইয়া বিবিধরূপে বিরাজ করিতেছেন। খাদ্য প্রাণীগণের জন্মের পূর্ব্বে জন্মে। এজন্য ইহা সর্ব্বৌষধ। নতুবা প্রাণীক্ষুধারোগে মরিয়া যাইত। যাহারা অন্নকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে, তাহারা সকল অন্ন প্রাপ্ত হয়। অন্ন হইতে প্রাণীগণ জন্মে। উৎপন্ন প্রাণী অন্ন খাইয়া বড় হয়। প্রাণীগণ ইহা খায় এবং প্রাণীগণকে ইহা খায়। এজন্য ইহাকে অন্ন বলে। এই অন্নময় কোষ অর্থাৎ অন্নদ্বারা পুষ্ট দেহের কথা বলা হইল। ইহার মধ্যে একটি কোষ আছে; তারনাম প্রাণময়। পঞ্চপ্রাণবায়ু শরীরযন্ত্র চালাইতেছে। তার মধ্যে মনোময় কোষ সে দেহের করণ; তারমধ্যে বিজ্ঞানময় সে দেহের কর্ত্তা; তার মধ্যে আনন্দময় কোষ। তারপর ব্রহ্ম বা আত্মা। অন্ন সম্বন্ধে এইরূপ অনেক কথা আছে—

অন্নং ন নিন্দ্যাৎ। তৎ ব্রতং। প্রাণো বা অন্নং ইত্যাদি।

অন্নের নিন্দা করিও না। তাহা ব্রত। প্রাণই অন্ন। শরীর

অন্নভোক্তা। প্রাণ শরীরে গমন করে। শরীর প্রাণে গমন করে। এরই নাম অন্নে অন্ন প্রতিষ্ঠিত।

অন্নংন পরিচক্ষীত। তৎব্রতম্। আপোবা অন্নং—ইত্যাদি।

অন্নত্যাগ করিওনা। তাহা ব্রত; জলই অন্ন। জ্যোতি অন্ন ভোক্তা। জলে জ্যোতিও জ্যোতিতে জল প্রতিষ্ঠিত। এরনাম অন্নে অন্ন প্রতিষ্ঠিত।

অন্নং বহু কুর্ব্বীত। তৎব্রতম্—ইত্যাদি।

বহু অন্ন অর্জ্জন করিও। তাহা ব্রত। পৃথিবীই অন্ন। আকাশই অন্নভোক্তা। পৃথিবীতে আকাশ ও আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত। এরই নাম অন্নে অন্ন প্রতিষ্ঠিত।

ন কঞ্চন বসতৌ প্রত্যাচক্ষীত। তৎব্রতম্। যয়া কয়া বিধয়া বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াৎ।

গৃহে আসিলে কাহাকে ফিরাইও না। তাহা ব্রত। অতএব যে কোন উপায়ে বহু অন্ন অর্জ্জন করিবে। সাধু গৃহস্থেরা অভ্যাগতকে বলেন, আমরা অন্ন প্রস্তুত করিয়াছি। যিনি শ্রেষ্ঠভাবে তাঁহাকে অন্ন দেন, তাঁহার নিকট শ্রেষ্ঠভাবে অন্ন উপস্থিত হন। যিনি মধ্যমরূপে অন্ন নিবেদন করেন, তাঁহার নিকট মধ্যমরূপে অন্ন উপস্থিত হন। যিনি অধমভাবে এই অন্নদেন, তাঁহার নিকট অধমভাবে অন্ন উপস্থিত হন। যিনি এরূপ জানেন, তিনি ব্রহ্মবাক্যে ক্ষেমরূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন—এইরূপে উপাসনা করেন ইত্যাদি।" ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি বলেন,—অহম্ অন্নম্। অহম্ অন্নাদঃ। আমি অন্ন। আমি অন্নভোক্তা। যে আমাকে অন্ন দেয় সে আমাকে রক্ষা করে। যে অন্নার্থীকে অন্ন না দিয়া নিজে খায়, আমি সেই অন্নরূপী

ব্যক্তিকে খাই। বরুণকথিত এবং ভৃগুদ্বারা বিদিত বলিয়া এই জ্ঞানের নাম ভার্গবীবারুণী বিদ্যা।

এই বই লেখা প্রায় শেষ হইলে আমি কুলার্ণব তন্ত্র পড়ি। তাহাতে কৌলের যেরূপ লক্ষণ দেওয়া আছে, তাহার প্রায়গুলিই মধুর অবস্থার সহিত মিলে। এখানে তাহার কতকগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—পাঠক মধুর ব্যবহার ও কথার সহিত তাহা মিলাইয়া দেখিবেন। কুল অর্থ শক্তি। কুলং শক্তিঃ প্রকীর্ত্তিম্। আবার আছে—কুলং গোত্রং সমাখ্যাতং তৎচ শক্তিশিবোদ্ভবম্। শক্তি উপাসনায় সিদ্ধ ব্যক্তির নাম কৌল। শিব অর্থ ব্রহ্ম।

অস্তি দেবি পরব্রহ্মস্বরূপী নিষ্কলঃ শিবঃ।
সর্বজ্ঞঃ সর্বকর্ত্তাচ সর্বেশো নির্মলোদয়ঃ॥
অয়ং জ্যোতি রনাদ্যন্তো নির্বিকারঃ পরাৎপরঃ।
নির্গুণঃ সচ্চিদানন্দ স্তদংশা জীব সংজ্ঞকাঃ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশেরও নাশ আছে—তাঁরা সগুণ। যার "আমি" আছে সেই মরে।

ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশাদি দেবতা ভূত জাতয়ঃ।
নাশম্ এব অনুধাবন্তি, তস্মাৎ শ্রেয়ঃ সমাচরেৎ॥

কুলধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা—

যোগী চেৎনৈব ভোগী স্যাৎ ভোগী চেৎ নৈব যোগবিৎ।
ভোগযোগাত্মকঃ কৌলঃ তস্মাৎ সর্বাধিকঃ প্রিয়ে॥

কুলধর্ম্ম প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ—

প্রত্যক্ষংচ প্রমাণায় সর্বেষাং প্রাণিনাং প্রিয়ে।
উপলব্ধিবলাৎ তস্য হতাঃ সর্বে কুতার্কিকাঃ॥

পরোক্ষং কোস্থ জ্ঞানীতে কস্থ কিংবা ভবিষ্যতি।
যদ্বা প্রত্যক্ষফলদং তৎএব উত্তমদর্শনম্।

কুলজ্ঞানী চণ্ডাল হইলে বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—

চতুর্বেদী কুলাজ্ঞানী শ্বপচাৎ অধমঃ প্রিয়ে।
শ্বপচোপি কুলজ্ঞানী ব্রাহ্মণাৎ অতিরিচ্যতে॥

নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি মধুতে ছিল—

সদা মাংসরসোল্লাসী সদাচ পরিচিন্তকঃ।
সদা সংশয়হীনো যঃ কুলযোগী স উচ্যতে॥

মাংস খাইতে যেন ভালবাসে এমন দেখাইত। কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে তার দ্বিধা হইত না।

পিবন্ মদ্যং বমন্ খাদন্ স্বেচ্ছাচারপরায়ণঃ।

সে মদ খাইত না। কিন্তু গাঁজা খাইত এবং আহার করিয়া মাঠে গিয়া বমন করিত।

কৌল—উন্মত্ত মুক জড়বৎ নিবসেৎ লোক মধ্যমে। উন্মত্ত, বোবা ও কালার ন্যায় সংসারে বিচরণ করেন।

যোগিনঃ বিবিধৈঃ বেশৈঃ নরাণাং হিতকারিণঃ।
ভ্রমন্তি পৃথিবীম্ এতাম্ অবিজ্ঞাত স্বরূপিণঃ॥

বালকের মত লোভী দেখায় এবং জ্ঞানী হইয়াও উন্মত্তের মত কথা বলে।

লুব্ধঃ বালকবৎ ক্রীড়েৎ কুলেশো জলবৎ চরেৎ।
বদেৎ উন্মত্তবৎ বিদ্বান্ কুলযোগী মহেশ্বরি॥

একদিন মধু এসে বলে বাবু পাটালী গুড় (খেজুরের গুড়) খাব; এই বাড়ী বানাইতেছে। আমায় কিছু পয়সা দেন। আমি বলিলাম হাটে কিনিয়া দিব। মধু বলিল না—এই গুড়ই আমি খাব। এই বেশ গুড়; এখনই খাব; শেষে তাই খেল।

এমন কথা বলে যে লোকে হাসে বা লোকের ঘৃণার উদয় হয়। অথবা তাকে দেখে দূরে যায়।

যথা হসতি লোকোঽয়ং জুগুপ্সতি চ কুৎসিতঃ।

বিলোক্য দূরতঃ যাতি তথা যোগী প্রবর্ত্ততে॥

একদিন একটী হিন্দু একটা বলদ কিনিয়া লইয়া যাইতেছে। একজন মুসলমান বলিল গরুটী ভালত? মধু সেখানে বসিয়াছিল—বলিল "তা আর উনিও খায়ে দেহেন নাই। সে লোকটা "রাম" "রাম" বলিতে বলিতে চলিয়া গেল।

জুলে সেখের কাছদিয়া একদিন কতকগুলি বৈরাগী ও বৈষ্ণবী হাটের উপর দিয়া যাইতেছে। মধু বলিল—আচ্ছা ভিক্ষা করবি, কর। উয়েগেরে এ মেয়ে মানুষ গুলো নষ্ট করবের কৈছে কেডা। এডা কি ধর্ম্ম? আচ্ছা দাদামশায় কন ত, বরেগী শালারা মাগীগুলে নষ্ট করে কি জন্যি?

একজন বৈষ্ণবী—গোলামের বেটা পাগল, মুখ গুরেয়ে ভাঙ্গে দেব। মধু হাসিয়া বলিল—দেখ্চেন, মাঠাকুরণরা রাগিছেন। ইহা শুনিয়া বৈষ্ণবীরা চলিয়া গেল।

ইজ্জাতুল্লা—কেন মধু, বৈষ্ণব ধর্ম্মও ত হিন্দুর একটা ধর্ম।

মধু—হেঁ, বষ্ণম ধর্ম্মডা ভাল। আমিও বৈরেগী হবের চাইছিলাম। তা মাগীরা নষ্ট করে ফেলায়ে দিছে। বরগী টরগী আর হব না।

ইজ্জাতুল্লা—ক্যা নষ্ট কল্লো কেমন করে?

মধু—তাও শুন্‌বেন। যত বজ্জাত বতেল মাগীরে আর যার টাহা পয়সা জোটে না, বিয়ে কব্‌বের পারে না, তারাই এক কপ্‌নী ঠেলে দিয়ে মস্ত তিলক করে ভিক্ষা করা ধরে। আর হয়ে গেল এক

মাঠাকরণ আর বাবাজী। ওডাকি ধর্ম্ম নাকি? ওডা কেবল ফিকির করে কোন মতে বাঁচা। ভিক্ষা করে কি পেটই ভরে?

জুম্মার নামাজ—

আচ্ছা দাদামশায়, এই যে সাত দিন আট দিন পরে এই যে সকল মুছুল্লীরা ঠেলে আসে জুটে পরে, এরা সত্যিই নামাজ পড়ে নাকি? আর ইয়েগেরে নেমনতন্ন দেওয়া লাগে নাকি?

জুলা—ঐ রাজা মশায়ের (ইজ্জাতুল্লা) কাছে জিজ্ঞাসা কর।

মধু—আপনি ত ভাল, আপনার কাছে নিচ্চুপি জিজ্ঞাসা কল্লাম; উয়েগেরে ছিন্নিডা মিন্নিডা খাই। আচ্ছা ঐ যে জলচহির পর খারায়ে, আর হাত এবে করে থাহে ও কি করে?

জুলা—ওই হলো প্রেধান। ও যা করে সগলেরই তাই করা লাগে। ওডা নিয়ম।

মধু—(ছোট করিয়া) দাদা মশায়, ওরা সকলে কোল মুছুল্লী না? যে পাঁচ ওকথ নামাজ পড়ে সেই জুম্মার নামাজ পড়বের পারে।

জুলা—তুমি ইয়ে শিখ্‌লে কোহানে?

মধু—আমি উয়ে আলফু খোনকারের কাছে শুনাছ। ছোট কালে লাঠী খেলতাম, লাঠী খেলার মন্তর শিখ্‌তি আলফু খোনকারের কাছে যাতাম, তারি কাছে শুনছি। নামাজ যে পড়া, তা জুম্মার ঘরে গেলেই নামাজ পড়া হয় না। সে দিন রাত তছবি হাতে করে বসে থাকৃত: তার নামাজ পড়তি পড়্‌তি কপালে দাগ হইছিল।

জুলা—আচ্ছা সে যে সারাদিন নামাজ কর্‌তো, তার কায কাম করে দিত কেডা?

মধু—মানুষিই দিত। কত টাহা পয়সা দিয়ে আসত। আমরাই তার কত কাম করে দিছি। সে কি কামকর্‌তো, সে তছবী হাতে

করেই থাক্‌তো ; সে জুম্মার ঘরে যাতোই না। বাজারের উপর বলা কামারের ঘর। মধু সময়ে সময়ে সেখানে গিয়া বসিত। তামাক খাইত। আগুণের দিকে তাকাইয়া থাকিত। একদিন বলাকে বলিল, আচ্ছা দাদামশায়, আগুণ যে লাল হয় কও ত কি জন্যি ?

বলা বলিল—ঐ ভাতিতে বাতাস হয়, তাতি।

মধু—তা না, তানা। ও ভগে মালী দেয়। ভগে মালী যদি না দিবি, তয় ও কত ফুঁ জোটায়ে রাখিছিল। অর্থাৎ দেহে আত্মা আছে বলে, হাত ভাতির দড়ি টানে ; আত্মাই কারণের কারণ ; শেষ কারণ। তা হলেই ভগে মালীরই ফুঁ দেওয়া হইল।

জুলা (গল্প করিল)—বলা কামার একবার পাগল হয়ে পেল্লাদ সিংএর দোকানেথ্যা ঢুয়ের ঘুচেয়ে খাগ্‌ড়াই আনে। মধুর শিয়রে বসে খায়, আর মধুর সাধে। মধু কলো, তুই খা ; তোর তা আমি খাই না। বলা মুড়কী খায়ে শেষে মধুর মাথা ভরে মুতে দিল। মধু উঠে বসে কলো—আরে বারে পাগোল, কল্লোকিরে, দেহিচনি ?—তারপর মিন্নতি করে কলো, কত্তা, আপনি এহান তে যান, আর আবস্থা করবেন না। ইয়েই কয়ে মাঠেল থ্যা ধুয়ে টুয়ে আসে আমাগেরে বাড়ী তামুক খালো আর বলার কীত্তির কথা কলো।

শেষে কলো—কন্‌ত দাদামশায়—বলাদাদা আগে কত তামুক খাওয়াতো, ও ক্যা মাথা ভরে মুতে দিল ?

জুলা—কি জেনি। তুমি কি কও ?

মধু—ভগে উয়ের জ্ঞানবুদ্ধি কাড়ে নিছে। দেহেন ত ভগে উয়ের করছে কি ?

জুলা—(আমি কলাম) তুমি উয়ের কিছু কলে না ?

মধু—না। আমি আবার উয়ের কব কি? ও এই এহেক নোয়া বাড়েয়ে চেপ্টা করে ফেলায়। কিছু কলি এক বাঁশ দিয়ে যদি আমার চেপ্টা করে ফেলায়, সেহন? ভগেই সগল করে। বলাদাদা কি যোতে? ভগেই উয়ের বুলে আমার মাথা ভরে যোতায়।

জুলের মুখে শুনিয়াছি—কোন পয়সাওয়ালা লোক যাইতেছে দেখিলে মধু বলিত—এই যে রাজা মশায় যায়, এ মলি ভারি দৈ চিড়ে লুচী পুরী দিবি।

জুলে—তুমি কিসি জান্‌লে?

মধু—এত বড় রাজা; ও যদি দৈ চিড়ে লুচী পুরী না দেয়, তব আর এত বড় হইছে কেন?

জুলে—আচ্ছা ও যে মরবি তা জান কেমন করে?

মধু—দাদামশায়, মানুষ কে না ম'রে বাঁচে? সব মরে যাবি। কেবল মরব না আমি। (আমি অমৃতত্ব লাভ করিয়াছি; যমে আমাকে ছুতে পারবে না,

"আমায় ছুয়ো না শমন, আমার জাত গিয়াছে,
যেদিন কৃপাময়ী আমায় কৃপা করেছে"।)

জুলে—মধু, তুমি মলি শ্রাদ্ধ কর্‌বি কেডা?

মধু—এত শ্রাদ্ধ আমি খাই আরো আমার শ্রাদ্ধ লাগবি? আমার আর শ্রাদ্ধ লাগবি না।

মধু খাইত কিন্তু সঞ্চয় করিত না। একদিন শ্রাদ্ধের বাড়ী খাইয়া আসিল। আমি বলিলাম মধু—শ্রাদ্ধ খালে কিছু আন্‌লে না ক্যা? কাল খাতে।

মধু—না, আমি টোপ্‌লা করে কিছু আনি না। কাল ভগেই দিবি।

গ্রামে সময় সময় বাঘের ভয় হয়। মধু হাটেই থাকে। বাঘ ডাকিলে ঐ বাসায় শুইয়াই বলিত—দাদা মশায়, আমার যদি নেয়, ঠেহান যেন।

জুলে—ভয় যদি করে, তয় ঘরের মধি আসো।

মধু—না। আমি বড় ম্যালোচ (ম্লেচ্ছ); ছ্যাপ কাশ ফেলান লাগে, ওহানথেই ঠেহাবেন। মন্‌তোর টোন্‌তোর দিয়ে ওহানথেই ঠেহাবেন।

মধু যে বাঁশের ঝাড়ের নীচে থাকিত, সেখানে একটী ছোট গর্ত্ত করিয়া লইয়াছিল। দিনেরবেলা কাঠ কুড়াইয়া রাখিত। কার্ত্তিক হইতে চৈত্রমাস পর্য্যন্ত রাত্রিতে খাওয়া দাওয়ার পর এই গর্ত্তে আগুন জ্বালিত। শীতেই বেশী আগুণ থাকিত, অন্য সময় কম। মধু আগুণের কাছে বসিয়া থাকিত। কখন ছোট ছোট করিয়া কি বলিত। কখন একখানা কাঠ তুলিয়া চোখের সামনে নিয়া এক দৃষ্টিতে আগুণ দেখিত। নিকটে লোক গেলেই বলিত,—যান যান আপনারা এখানে আসবেন না। আমি হাগে মুতে ছুঁচি না। আমার কাছে আসবেন না। আপনারা আগুণে হাত দেবেন না। হাত দিলেই এ আগুণ নিবে যাবিনি। যদি কেহ কাঠে হাত দিত, মধু অমনি উঠে যাত। যদি কেহ বলিত, মধু গেলে যে ?

মধু বলিত—না আর ও আগুণ পোয়ান মিছা। উপস্থিত লোক বলিত ক্যা ?

মধু বলিত—ও আগুনির আর গরম নাই।

মধু আর ও আগুণের কাছে আসিত না, তফাতে গিয়া বসিয়া থাকিত। পরদিন কাঠটাট সব ফেলিয়া দিত। মধু প্রাচীন ঋষিদের ন্যায় অগ্নির জ্যোতিতে ব্রহ্মজ্যোতি দেখিত। মধু যে বৈদিক

কবি ছিল, নীড়স্থ অগ্নি হৃদাকাশে উত্তোলনই তাহার প্রমাণ। দীর্ঘতমা বলিয়াছেন, সাঙ্গবেদ পরব্রহ্মে স্থিত। সর্বদেবতা পরব্রহ্মে আশ্রিত রহিয়াছেন। যে তাঁহাকে জানে না, সে কতকগুলি শব্দের দ্বারা কি করিবে?

তিনিও ইন্ধন দ্বারা অগ্নি সন্দীপিত করিয়া বলিয়াছেন—

সমানং এতৎ উদকং উৎ চ এতি অব চ থহোভি।
ভূমিং পর্জ্জন্যাঃ জিন্বন্তি দিবং জিন্বন্তি অগ্নয়ঃ॥

একই জল কখন আকাশে উঠে, কখন মাটীতে পড়ে। মেঘ ভূমি তর্পিত করেন। অগ্নি স্বর্গ তর্পিত করেন।

দিব্যং সুপর্ণং বায়সং বৃহন্তম্
অপাং গর্ভং দর্শতম্ ওষধীনাম্।
অভীপতঃ বৃষ্টিভিঃ তর্পয়ন্তং
সরস্বন্তম্ অবসে জোহবামি॥

আকাশস্থ সুরশ্মিবিশিষ্ট, গমনশীল, বৃহৎ, বৃষ্টির উৎপাদক, ও ঋষিগণের নয়নাভিরাম, অভিমুখে আগমনকারী, সলিলধারা দ্বারা তড়াগাদির তৃপ্তিকারী (সরস্বন্তম্) জল বিশিষ্ট সূর্য্য দেবকে—আমাদের রক্ষণার্থ পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছি।

যাঁহারা বিষ্ণুর অনাময় পদ স্বহৃদয়ে সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বদা দর্শন করেন, তাঁহাদের নিখিল কর্ম পরিসমাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের ব্যবহার অতি গূঢ়। তাঁহারা ঈশ্বর। কে বলিতে পারে, তাঁহারা কি করিতে পারেন বা কি করিতে পারেন না? তাঁহাদের ব্যবহার কে বুঝিবে? জনক জ্ঞানের পরও কর্ম করিয়া জীবন কাটাইয়াছেন। তাঁর এক মুহূর্ত্ত অবসর ছিল না। সীতা লঙ্কা হতে এলেন; তাঁকে দেখেও এক দিন থাকতে পারিলেন না। অনুষ্ঠানসাত্তত্বাৎ

স্বাতন্ত্র্যমপকৃতি"। বাবা বলিতেন, আমি ত্রৈলিঙ্গ স্বামীকে গঙ্গায় দীপ দিবার জন্য সল্‌তা পাকাইতে দেখিয়াছি,—মনে করিতাম জীবন্মুক্তেরও কি তবে কর্ম্ম আছে? জ্বলন্ত অগ্নিকে পূজা ক'রে খুব প্রীতি হয়। কাঠে আগুণ ছিল, তা বাহির হইয়াছে। কার্য্যের মধ্য হইতে কারণ স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। এইরূপ দেহাগ্নি নীড়স্থ বৈশ্বানর, চিদগ্নি দেহের কারণ। তাঁকে ধরিয়াই ব্রহ্মে যাওয়া যায়। সৎ চ অসৎ চ পরমে বিওমন্। সৎ ও অসৎ ব্রহ্ম হইতে হইয়াছে—চিদগ্নি সেই ব্রহ্মের সক্রিয় ভাব।

মধু গাঁজা খাবে। একবাড়ী আগুন আনিতে গিয়াছে। মেয়েরা ভাত খাইতেছিল। তাহারা বলিল,—মধু এখন কে আগুন দেবে, আমরা খাচ্চি। একধারে একটী বউ বসিয়াছিল—সে বাহির হয় না—পাড়াপড়সীই তাকে চিনে না। মধু বলিল, ক্যা ঐত জুলে দাদার বউ বসে আছে, উনি দিক্। মেয়েরা হাসিতে লাগিল।

যোগী লোকের উপকার করিবার জন্য গৃহস্থের অন্ন খান,—লোভে নয়।

যোগী লোকোপকারায় ভোগান্ ভুঙ্‌ক্তে ন কাঙ্ক্ষয়া
অদন্ গৃহ্নন্ কুলান্ সর্বান্ ক্রীড়েৎ চ পৃথিবীতলে ॥

সূর্য্য যেমন সব জল পান করেন, যোগীও সেইরূপ—

সর্বপায়ী যথা সূর্য্যঃ সর্বভোগী যথাঅনলঃ।
যোগী ভুক্ত্বা অখিলান্ ভোগান্ তথাপাপৈঃ ন লিপ্যতে ॥

ম্লেচ্ছের অন্নে ও যোগীর হাত পড়িলে শুচি হয়—

যথা গ্রামগতং তোয়ং নদীযুক্তং ভবেৎ শুচিঃ।
তথা ম্লেচ্ছগৃহান্নাদিঃ যোগিহস্তগতঃ শুচিঃ ॥

অহংকার ক্রোধাদি হীন, সত্যবাদী—

(অমদক্রোধদম্ভাশাহংকারাঃ সত্যবাদিনঃ)

কুলাচার্য্য দর্শন দুর্লভ—

দুর্লভং সর্বলোকেষু কুলাচার্য্যস্য দর্শনম্।
বিপাকেনৈব পুণ্যানাং লভ্যতে নান্যথা প্রিয়ে॥

চণ্ডালকৌলিকও স্মৃত, কীর্ত্তিত, দৃষ্ট, বন্দিত ও ভাষিত হইলে পবিত্র করেন—

সংস্মৃতঃ কীর্ত্তিতঃ দৃষ্টঃ বন্দিতঃ ভাষিতোপি বা।
পুনাতি কুলধর্মিষ্ঠঃ চাণ্ডালোপি যদৃচ্ছয়া॥

কৌলিকযোগী বিধিনিষেধের পার—

ন বিধিঃ ন নিষেধঃ স্যাৎ ন পুণ্যং নচ পাতকম্।
ন স্বর্গঃ নৈব নরকঃ কৌলিকানাং কুলেশ্বরি॥

তাঁদের বংশের গুণগান করিলে—রোমাঞ্চ ও গদ্গদস্বরতা হয়—

কীর্ত্ত্যমানে কুলেতেষাং রোমাঞ্চঃ গদ্গদস্বরঃ।

নিম্নের শ্লোকের অর্থ ভাল বুঝা যায় না। ছাপার ভুল থাকতে পারে।

তত্ত্বত্রয় শ্রীচরণ মূলমন্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ।
দেবতা গুরুভক্তস্য কৌলিকস্যানুদীক্ষয়া॥

তত্ত্বত্রয় কি? ভগেমালী, মনে ভাঙ্গী, কুদীনারী? ঈশ্বর, জীব, মায়া?
শ্রীচরণ—আমি যে গুরুপাদপদ্ম দেখিয়াছিলাম, তাই?
মধুকে খাইতে দিলেই বলিত—"তপস্যা, মহাতপস্যা"

নৈবেদ্যং পুরতো ন্যস্তং দর্শনাৎ স্বীকৃতং ময়া।
সাধুভক্তস্য জিহ্বাগ্রাৎ অশ্নামি কমলীক্ষণে॥

নৈবেদ্য দর্শনমাত্রই খাওয়া যায়; ভক্তের জিহ্বাগ্র হতে আমি অন্ন খাই।

শক্তি অনুসারে শিষ্য অনুগ্রহের যোগ্য,—মধু ঠিক তাই করিত—

শক্তিমাত্রানুসারেণ শিষ্যঃ অনুগ্রহম্ অর্হতি।

গুরু কৃপাই মূল—

যথা মহানিলোদ্ধূতং তূলং দশদিশঃ ব্রজেৎ।

তথৈব গুরুকারুণ্যাৎ পাপরাশিঃ প্রলীয়তে॥

বায়ুবশে তুলা যেমন দশদিকে উড়ে যায়, গুরুকৃপায় শিষ্যের পাপ তেমনিভাবে দূর হয়। পাঠক, পরে ইহার প্রমাণ পাইবে।

মধুর গুরু কে, এ বিষয় নিশ্চিত কিছু জানিতে পারি নাই। এবারে বাড়ী আসিয়া জানিলাম যে রামনগর নামে একখানি গণ্ডগ্রাম আছে; আমাদের গ্রামেরই নিকট। তার উত্তরে একটা পতিৎ নির্জন ভিটা আছে। শুনিলাম যে একবার একটী নগ্ন সন্ন্যাসী ঐ ভিটার উপর থাকিতেন। হাটখালীর মধু, কামার হাটির গোবিন্দ বৈরাগী ও রামনগরের এলাম খাঁ তাঁহার নিকট যাতায়াত করিত। ইহারা তিন জনই অত্যন্ত বলবান্। একদিন ঐ ভিটার নিকটে কোন বাড়িতে একটী স্ত্রীলোক মরে। লোকের কান্না শুনিয়া সন্ন্যাসী ঐ বাড়ী আসেন এবং ঐ মৃতা মুসলমান স্ত্রী যে ঘরে ছিল, সে ঘরে যাইতে উদ্যত হন। ইহাতে পাড়ার লোকেরা বাধা দেয়। বাধা না মানায় শেষে তাঁহাকে মারে—এবং ধরিয়া গ্রামের বাহিরে লইয়া যায়। তখন সন্ন্যাসী অদৃশ্য হন। এলাম খাঁ সেই সময় হইতেই পাগল হইয়া যায়। কিছুদিন পরে গোবিন্দ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে। মধুই ভাল পাগল হয়। এলাম খাঁর স্ত্রী ও আত্মীয়েরা এবং গোবিন্দের স্ত্রী ও পুত্রাদি এখনও বর্ত্তমান আছে। এ কথা অনেকে জানে।

মধু ১৩০৫ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে আমাদের গ্রামের বাজারে নিয়ত থাকিতে আরম্ভ করিয়াছিল; ইহাও এবারে জানিলাম।

মধু বলিত, আমি জ্ঞানী। তাহার প্রেমোন্মাদ না হইলেও ভক্তির খুব আবেশ হইত, তাহা অনেক লোক দেখিয়াছে। মধু কখন কখন গান করিত নাচিত; তাহার চক্ষু হইতে জল পড়িত। স্বরভঙ্গ ও কণ্ঠরোধ হইত, তখন গাছ বা খুঁটি যা নিকটে পাইত তাই জড়াইয়া ধরিত। তারপর সেইখানেই বসিয়া ও নির্নিমিষনেত্রে মাটীর দিকে তাকাইয়া থাকিত। একদিন আমাদের বাড়ীতে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া একটী গাছ জড়াইয়া ধরে। এবং অনেকক্ষণ বিহ্বলের মত থাকিয়া গাছ তলায় বসেছিল। কে বলেছিল,—মধু গাছ ধর্‌লে কেন? মধু বলিল, তয় কারে ধরব? আমার কি বউ আছে যে তার ধরব। আপনাগেরে ধল্লি মার্‌লেন্ আনে, আর কতিন আনে, বেটা তোর গায় গু মুত; তুই আমার জরায়ে ধর্‌লি! (বউ—ভালবাসার লোক; যারা ক্রিমি তারাই বলে তোর গায় গু মুত)।

উদয়পুরগ্রামে গিরি ভুইমালী নামে একটী লোক আছে। তাহার বিহারী নামে ৪ বৎসর বয়সের একটী ছেলে। মধু তাহাকে বড় ভালবাসিত। তাঁহাকে বঁধু বলিত। কোলে করিয়া লইয়া বেড়াইত।

মধু ৫।৬ বৎসরের শিশুদিগকে বড় ভাল বাসিত। দেখিলেই একখানা নেকড়া পাতিয়া দিত এবং বলিত—আসেন্ আপনাগেরে সাথে বঁধু পাতপো, খুব্ খাওয়াবো।

উপস্থিত লোকের মধ্যে একজন বলিল—তুমিই খাতে পাওনা, উয়েগেরে খাওয়াবে কোহান থে?

মধু বলিল—ভগেমালী দিবি।

লোকটী বলিল—ওরা কি তোমার বঁধু হবের পারে; ওরা এহেবারে ছোট।

মধু বলিল—মানুষই ত ওরা, ওরাই ত মানুষ। আমরা মিছ্যা মানুষ। আপনাগেরে সাথে বঁধু পাতবের চালি, চড় তুলে মারবের আসতেন। কতেন, ব্যাটা পাগল আমি তোর বঁধু হব? কউ, ওরা ত কিছু কলোটলো না।

একটী ছেলে কতকগুলি পাটকাঠী মাথায় করিয়া যাইতেছে। মধু ঐ গ্রামের পথে যাইতেছিল; দেখিয়া বলিল—আহা হা, বঁধু আমার এত দুক্কু পাতেছে। ইহা বলিয়া তাহাকে কোলে করিল এবং তাহার পাঠকাঠীগুলি নিজে লইয়া চলিল। মধু ছেলেটী হাটের উপর লইয়া আসিত আবার বাড়ী দিয়া আসিত।

মধু আমাকে বলেছিল,—পরের ছেলেকে আপনার ছেলের মত ভালবাসা লাগে, পরের ভাইকে আপনার ভাইর মত ভালবাসা লাগে, তারই নাম মানুষধর্ম্ম। মধু মানুষধর্ম্ম মানুষকে শিখাইত। কে শিখিবে? মধুর প্রাণ প্রকৃতই মধুর উৎস ছিল।

মধু বড় মধুরকণ্ঠ ছিল। সে মাঠে যখন মুক্তকণ্ঠে গান করিত, তখন তার প্রতিধ্বনিতে ও স্বরে মাঠের লোক মোহিত হইত। মধু কোন গানেরই দুই এক অন্তরার বেশী গাইত না। তাহাতেই ভাবে তাহার কণ্ঠরোধ ও স্বরভঙ্গ হইয়া আসিত; তখন আর না গাইয়া বসিয়া পড়িত। আমি আমাদের গ্রামের তমির মণ্ডলের নিকট কয়েকটী গান সংগ্রহ করিয়াছি; তাহা নিম্নে দিলাম—

১। গাছ (১) নাই তার পাতা (২) আছে
তিন ডালে (৩) জগৎ ঘিরেছে।
তার ফুল ফলের (৪) কি অভাব আছে
যে জন (৫) বৃক্ষমূলে বসে আছে॥
বসে আছে রে বসে আছে।
যে জন সেই ফলের আশায়
এক মনেতে বসে আছে॥
ও তার ফুলফলের কি অভাব আছে॥
কত যোগীঋষি মুণিগণে
কেউ পালো না ফলের মানে।
গাছতলায় বসে রে আছে॥

২। ও তাই বল্‌রে স্বরূপ ব্রজের তত্ত্ব॥ এই একপদ প্রায় গাহিত।

৩। কত কষ্ট করে মন্ত্র শিখেছি।
চাক্ ভাঙ্গিব বলে আশয় করে বসে রয়েছি॥
সে আশা নৈরাশ হলো, আপন কর্ম্মদোষেতে।
মধু খালো মধুর মাছিতে॥

বোধ হয়—ইন্দ্রয়ই মত্ত মাছি। তারাই মধু খেল। আমার মন্ত্র শিখা বৃথা হইল। মধু বলিত, কালা গাইডা যেন আপনার সা'রে নেয় না। (ইন্দ্রিয় সংযম করিতে হয়)।

১। গাছ=ঈশ্বর। ২। পাতা=বিশ্বভূবন।
৩। ডাল=ত্রিগুণাত্মক মায়া। ৪। ফল=অমৃতত্ব।
৫। যে জন=মধুর মত মানুষ।

৪। বড় আশা ছিল মনেতে
নিদানকালে গোপালকে দেখিব।
দেখে নিকটেতে বসাব, ননী খাওয়াব॥
আসন্নকাল যখন হবে, কর্ণমূলে হরিনাম শুনাবে॥
নামের সহিত এ প্রাণ যাবে, আমি বৈকুণ্ঠবাসী হব॥

ক্রোধের দাঁত ভাঙ্গিবার উপায়।

কোন জীবজন্তু মধুর সন্মুখে মারিয়া বা অন্য কোন প্রকারে যদি কেহ তাহাকে বিরক্ত করিত, তাহা হইলে সেখানে কোন লাঠী পড়িয়া থাকিলে তাহা দূরে রাখিয়া আসিত। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত, মধু লাঠীখান তফাতে থুয়ে আলেযে?

মধু বলিত,—যদি রাগে কারো মাথায় বারিটারি দিয়ে মারে ফেলাই, তয় তো পেরমাদ হবি, তাই ভাবলাম সরায়ে থোয়াই ভাল।

উপাসনা (ধোয়া কাচাই) জীবনের কাজ।

মধু বাঁশের ঝাড়ের মধ্যে বাহ্য যাইত। হয় ত এক প্রহর গালে হাত দিয়া বসিয়াই আছে। নিজে নিজে কথা বলিতেছে। ছেলে পিলে ভূতে কথা বলিতেছে ভাবিয়া অনায়াসে ডরাইতে পারে। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মধু তুমি অতক্ষণ বাহ্য যাও কেন?

মধু বলিল,—তাইত করা লাগে; সব কায কাম সারে নিজ্জঞ্জালি বসে মনের সুখে হাগা লাগে। এদিক শেষ রাত্তিরি উঠে ৪ দণ্ড বেলা তাকাত। আবার সাঁজে গোরুবাছুর উঠেয়ে সব সারেসুরে বসা লাগে, আর এক পহর রাত্তির তক হাগা লাগে। হাগাই সুখ। (হাগা অর্থ উপাসনা; উপাসনা এ দুই সময় খুব ভাল, এ কথা আমাকেও বলিয়াছিল)।

মধু বাহ্যে গিয়া ডান হাত দিয়া জলশৌচ করিত এবং এক দুই তিন করিয়া গণিয়া পঞ্চাশবার ধোওয়া হইলে শেষ করিত। (এক ধোয়াই জীবনের কায)।

মধুর খুব কথা যোগাইত। একবার একটী স্ত্রীলোক একটী ছোট ছেলে সাথে করিয়া বাজারের উপর দিয়া যাইতেছিল। তার বাড়ী মধুদের গ্রামে। মধু তাকে চিনিত। মধু ঈশ্বরবণিকের হাটুরে ঘরে থাকিত। ঘরখানিকে "বাসা" বলিত। দিনে যেখানে থাকুক, সন্ধ্যাকালে বাসায় আসাই চাই। মধু বলিল—মাঠাক্‌রণ, কোথায় গিছিলেন? স্ত্রীলোকটী বলিল, বরখাপুর মেয়েবাড়ী গিছিলাম। মধু সে মেয়েটীকে চিনিত; তার নাম বিন্ধ্য। মধু বলিল, বিন্ধ্য মাঠাক্‌রাণীর কেমন দেখে আলেন? স্ত্রীলোকটী বলিল, কি জানিরে বাপু, আমি ওদুয়ারে যাই নাই। মধু বলিল,—"তয় কি, তয় কি দেখবের গিছিলেন?" সেখানে আমি ছিলাম। মধু বলিল,—দাদামশায় একিটী কল্লো সেই যো। বড়পূজায় বিসর্জ্জনের দিন পিত্তিমা (প্রতিমা) দেখপের গিছে। দেখপি কেমন মুখ বানাইছে। মুখ হাস হাস কিনা। কেমন গড়ন সোষ্ঠব হইছে। দেখে শুনে রাত্তিরি বাড়ী আলো; একজন কলো, পিত্তিমা দেখলে কেমন? সে ক'লো ওদিক নজরই করি নাই। দেখত, গেল মেয়ে দেখবের। তা তার দুয়েরই গেলনা!! যার যেমন মন সেই দিকই নজর থাকে।

নন্দ বা যশোদার গান—

৫। কাল মানিক কোলের ধন, দিয়ে বিসর্জন, রয়েছি বেঁচে।
গোপাল বিনে কপাল ভেঙ্গেছে, ভেঙ্গেছে।
যায় না এপ্রাণ কঠিন এত,
পাষাণ হলে অমনি গলে যেত,

শত বৎসর হলো গত, তবু এদেহেতে প্রাণ রয়েছে।
হায় বল দেখিরে দ্বারি, প্রাণের কৃষ্ণ কেমন আছে।
এতদিন তাই ছিলাম চেয়ে, মথুরার পথ নিরখিয়ে
আসবে গোপাল ফিরে।
হলো সে আশা নৈরাশ, একি সর্ব্বনাশ,
ব্রজের আশা আমার ভেঙ্গে গেছে।
বল দেখিরে দ্বারি, প্রাণের কৃষ্ণ কেমন আছে॥

৬। গুরু বিষয়ক—
এবার ঠিক রাখ মন, গুরুর পদে নিরিখ ছাড়োনা।
ওরে মন এক নিরিখে ধল্লে পাড়ি, জলের বাড়ি লাগবে না।
নিরিখ ছাড়লে পরে, পড়বে ফেরে,
অধরচাঁদকে * পাবে না।
এবার ঠিক রাখ মন, গুরুর পদে নিরিখ ছেড় না॥

৮। মন গেল তোর মানব জনম, একবার মুখে হরি বল্লে না।
মনরে এসেছ এই ভবের বাজারে, ওরে গুরুর চরণ অমূল্য ধন,
নেওরে সাধন করে।
যেদিন দেহ হতে প্রাণ ছেড়ে যাবে, ভাইবন্ধু সবে হরির নাম
কর্ণে দিবে।
ওরে সে নামে আর গাছ হবে না।
সঙ্গে দিবে মেটে ঘড়া, ওরে কড়ি দিবে অষ্ট কড়া।
ও তোর জাতকাহারে করবে কাঁধে, নদীর তীরে দিবে পোড়া॥
ওরে সে নামে আর গাছ হবে না—গেয়ে

---

* অধরচাঁদ = কুণ্ডলী।

কাঁদিয়া ফেলিত। অর্থাৎ গুরুদত্ত বীজের অঙ্কুর হবে না। চতুর্বর্গফল দূরের কথা। রামপ্রসাদ সিদ্ধাবস্থায় গেয়েছেন—

কালীকল্পতরুবরে রে ভাই চতুর্বর্গফল ধরেছে।

মধু সর্ব্বজাতির ভাত খাইত। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিল,—বাবু, একদিন ভিক্ষাশিক্ষা করে (মধু প্রথম প্রথম ভিক্ষা করিত) বাজারের উপর তলেয় (হাঁড়ি) করে ভাত রাঁধ্‌তেছি। খড়ি (কাঠ) আনবের গিছি, আসে দেখি যে মোমৃতা (একটি মুসলমানের মেয়ে) আথায় জ্বাল দিতেছে। আমি কলাম—আরে বারে, আমি হলাম নমশুদ্দূর, তুই হলি মোছলমান, তুই ক্যা আমার ভাতে জ্বাল দিলি? আর করব কি, পাতিল ধরে ভাঙ্গে ফেল্‌লাম। সেই ইস্তক আমার চাড্ডে চাড্ডে ভাত দেয়। ভগেমালী সকলিরি ভাত খাবের কয়, তয় মুচি কত্তাগেরে ভাত চাবান আসে, গেলন আসে না।

আমি নাপিত, কি নমশুদ্দূর, কি ধোপা, কি মুছলমান, তাত জানি না। সকলই এক মানুষ, এইত জানি।

পরমহংস বলিয়াছেন—তিনি একদিন কামারদের ডাইল খাইয়াছিলেন, তাতে "কামারে গন্ধ" পাইয়াছিলেন।

ব্যাধি ও উপবাসের ফল।

মধু—ব্যাম হওয়া ভাল, কি কন্ বাবু?

আমি—হাঁ, ভালই ত।

মধু—কন্‌ত ক্যা?

আমি—সাবধান হয়।

মধু—হয়, হয়; ব্যাম ট্যাম দিলি জ্ঞানবুদ্ধি হয়।

মধু—আর উপেস করা?

আমি—তাও ভাল, রস্ টস্ শুকায়। ক্ষিদে হয়।

মধু—হয় হয়; দুড়ে খাওয়াও যায়, ভালও লাগে। আর পরের দুক্কু দরদ বোঝা যায়।

আমি—মাসে কটা উপেস করা ভাল?

মধু—একটাই ঢের, তাই পারে না।

আমি—আমি উপোস্ করবো?

মধু—আর কি কাম (কায)? এবার বেশী কিছু হবি না।

মধু—দুক্কু ভাল, ভাল দেখেই ভগেমান্ তা দেয়। ভ্যাদ্ ট্যাদ্ দিয়ে সেই সকল মারে ফেলে। আবার সেই ভাতমাত দিয়ে রক্ষা করে। জ্ঞান বুদ্ধি সেই দেয়। মোল্লার বেটার (যাদু নামে একটী মুসলমান) আর জ্ঞান বুদ্ধি হলো না। তামুক খাবেরও দেয়; শেষে কয় কি কক্কে তোর……। তা উয়ের দোষ কি? ভগে জ্ঞানবুদ্ধি দিলি সেন হবি। "হু', আমার কয়—মধু মন্তর দিয়ে নি আমার ভাল করবের পার? আমি কলাম, ভগে তোর করছে নাঙ্গল। তোর কি সিদে হওয়ার যো আছে? ব্যাম দুক্কু দিয়ে ভগে তোর সিদে করবি। সে জ্ঞান বুদ্ধি না দিলি, কারও জ্ঞান বুদ্ধি পাওয়ার যো নাই। ওরা ভাত দেয়, আপনার মনে দেয় না।

মধু যেমন অল্পকে বহু মনে করে, এমন লোক দেখি নাই। খায় পচা পান্তা,—দেখে মন। কৃষ্ণ কুচেলার ভিক্ষালব্ধ চিড়ে নিজে নিয়ে খেয়ে পরম প্রীত হইয়াছিলেন। মহতের এম্নি গুণ।

কুচেলা বলেছিলেন, সেই মহানুভব গুণার্ণবের সহিত যেন আমার জন্মে জন্মে সখ্যদাস্য ও মিত্রতা হয়; যিনি স্বয়ং রাজেশ্বর হইয়াও বন্ধু

বিবেচনায় এই দীনের বস্ত্রমধ্যে লুক্কায়িত একমুষ্টি চিপিটক লইয়া পরম আনন্দে ভক্ষণ করেছিলেন।

কৃষ্ণ প্রকৃতির দুর্নিগ্রহতা বিষয়ে বলিয়াছেন—

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতে র্জ্ঞানবানপি
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥

জ্ঞানবান্ ব্যক্তি স্বকীয় প্রকৃতির সদৃশ কার্য্য করে। জীবগণ প্রকৃতির অনুবর্ত্তন করে; অতএব ইন্দ্রিয়নিগ্রহ কি করিবে? জীবগণের প্রাক্তন কর্ম্মের সংস্কার পরজন্মে উপস্থিত হয়। এজন্য জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও স্বভাবের অনুরূপ কার্য্য করেন। সাত্বিকের সাত্বিক প্রবৃত্তি দেখা যায়; রজ ও তমোগুনীর রাজসিক ও তামসিক প্রবৃত্তি দেখা যায়। এজন্য আত্মহিতেচ্ছা যাহাদের জন্মিয়াছে, তাহারাও ইন্দ্রিয়দমন করিবার শতচেষ্টা করিয়াও কিছুতেই কৃতকার্য্য হয় না।

লাঙ্গল যেমন স্বভাবতঃ বাঁকা। ইহা কোন প্রকারেই সোজা হয় না। কেবল ভাঙ্গিলেই সোজা হয়। সেইরূপ জীব বহুদুঃখ পাইয়া ক্রমে পাপ পরিহার করিতে শিক্ষা করে। সৎপথে আসে। ভগবান বলিয়াছেন আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চার প্রকার লোক আমার ভজনা করে। জীব ঈশ্বরের কৃপায় দেখে, পাপ করিলেই দুঃখ দুর্গতি। এবং বাহুবলেও তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। তখন তাঁহার শরণ লয়। কাঁদিয়া তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়ে এবং বলে "শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্"। বালকের মত বলে,—হে দেব, আমি আর নাগরদোলায় চড়িব না। তুমি আর আমায় ঘুরাইওনা। রক্ষা কর। ইহাতে বুঝা গেল, মানুষ দুই প্রকার,—সরল ও লাঙ্গল। সোজা সাত্বিক নন্দ ঘোষ। কুটিল রাজস তামস। সাত্বিকের শক্তি অসাধারণ —যা বলে, তাই করে। রাজস তামস বহু কষ্ট পায়। উপদেশে

তাহাদের কিছু হয় না। সংসারে সাত্ত্বিকলোক অতি বিরল। এজন্য এখানে দুঃখ যন্ত্রনাই অধিক। দেখিয়া শিখিবারও উপায় হয় না।

এই তত্ত্বটি ভাগবতকার নানা চরিত্র সৃষ্টি করিয়া নানা উপখ্যানে বড় মধুর করিয়া বুঝাইয়াছেন। কুচেলা সাত্ত্বিক, দিনপাত হয় না; তবু লোকের দ্বারস্থ হবেন না, কিন্তু স্বধর্ম্ম করেন। অন্নাভাবে ম্রিয়মানা স্ত্রীর কথায় অর্থ চাহিতে গেলেন কিন্তু মহতের গুণ দেখেই বিহ্বল। নিজের কথা ভূলিয়া গেলেন। ঈশ্বর এরূপ ব্যক্তিকে উপেক্ষা করেন না, তাহাকে চাহিতে হয় না। চাওয়ার আগেই যোগক্ষেম তিনি নিজে বাড়ী পৌঁছিয়া দিয়া আসেন; সে তাঁর দয়া দেখে আর কাঁদে।

গজেন্দ্র রাজসের উদাহরণ। খুব ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী পুত্র স্বজন দাসদাসী নিয়ে বেশ সুখে আছে। ঐশ্বর্য্যে গড়াগড়ি দিতেছে; কিন্তু স্বধর্ম্ম করে। দুর্ব্বলের রক্ষা, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করে। কিন্তু ঈশ্বরকে ভূলে থাকে টাকার গরমে। একদিন মরিতে হবে, একথা কখনও মনে আসেনা। শেষে যখন কচ্ছপরূপ ধ'রে যমে ধরে, হাজার বৎসর যুদ্ধ করে। বাহুবলে আপনাকে উদ্ধার করিতে চায়; পারেনা; শেষে দেখে মরি তখন ঈশ্বরের পায়ে লুটাইয়া পড়ে। রাজসের দেহই পুঁজি। ব্যবসার মূলধন, ভোগের উপায়। তা যখন যায় যায়, তখন ঈশ্বর ঈশ্বর করে। আর কালিয়নাগ তামস, ঈশ্বরের লাথি খাইয়া রক্ত বমন করে। সংসারে অশেষ যন্ত্রণা পায়, কিন্তু ঘাড় যে কাত, সে কাত। "ঘাড় কেন কাত? না আমরা এক জাত"। সে বড় জোরে বলে, তুমিই ত আমাকে এমন করেছ। আমাকে মার কেন? সয়তান পায় পড়ে না। Milton ঠিক সয়তান গড়িতে পারেন নাই। তাঁর সয়তান বলেছিল Man, man fallen, shall be restored. But I never more. কালিয় তা নয়।

মধু যাকে বলে তুই নাঙ্গল, তোকে ভাঙ্গে সিদে করিবে সে ভাগ্যবান; কারণ তার সিদে হওয়ার আশা আছে। আর ঐ কথাটি অমূল্য। উপবাস করিলে পরের দুক্কু দরদ বুঝা যায়। অনাহারে জীবের যে কি দুঃখ তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। অন্য জীবের সহিত নিজের দেহসাম্য বোধ হয়। অহংকার অভিমান কমিয়া যায়। দ্বেষ হিংসা কমিয়া যায়, পরকে ভালবাসা যায়। মুখদিয়া ভালবাসা এক, আর প্রাণের ভালবাসা এক। মধু বলিত "আমি বড় সৌখীন বেটা ছাওয়াল হই। মুখদিয়ে ভালবাসি দিবার কিছু নাই॥" যারা রাজা তারা যদি একটি করে উপাস করে তবে লোকের অনেক দুঃখ কমে। তারা যদি মারার আগে নিজের গায়ে একটি চিমটি দেয়, তবে সংসারের অনেক দুঃখ কমে।

মধু একদিন কি বক্‌তে বক্‌তে এল; আমি বলিলাম, মধু কি, আজ যে এত সকালে এলে? কাল বুঝি খাওয়া হয় নাই! মধু—"না, উত্তরে দক্ষিণে সব কিরিমির গাদী। সব কিরিমির পোহা, মোটে চোক নাই"। উত্তরে দক্ষিণে চারিদিকে সব কিরমির গাদা। কিরি পোকা (পুরাণ চাউলের মধ্যে যে পোকা থাকে) মোটে চোক নাই অর্থাৎ সব লোকই জ্ঞানবুদ্ধিহীন; কাহাকেও এক মুষ্টি দেয় না। কেবল নিজের পেট বুঝে। আত্মহিতেচ্ছা নাই। ভাল হইবার ইচ্ছা নাই। তাহার উপায় অন্বেষণ করে না। চক্ষুহীন। বুদ্ধদেব বলিতেন, সত্যপরায়ণ হও, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও। পৃথিবীতে বুদ্ধদর্শন অতি দুর্লভ। বুদ্ধের উপদেশ গ্রহণের যোগ্য হও। নিদ্রিত ব্যক্তি কি করিয়া দর্শন করিবে? আমি বলিলাম, তুমি জ্ঞান বুদ্ধি দিলে ত হয়।

মধু—আমার কথা শুনবেরই মানুষ পাই না। আপনার কাছে একটা কই।

কঠোপনিষদে আছে "শ্রবণায়াপি বহুভির্যোন লভ্যঃ"। ঈশ্বরের বিষয় শুনিবার লোকও পাওয়া যায় না।

মধু—(আমাকে লক্ষ্য করিয়া) ভগেমালী মানুষ একটু পোক্কো হলিই তারে মারে ফেলে। আর কাঁচা কমপোক্তো মানুষই রাখে। তাগেরে কেবল নিজি খাবের টক্ (অভ্যাস)। ইয়েগেরে নিয়ে ভগের মহা মুস্কিল হবি।

একদিন খুব বড় রকম হরির লুট হবে। সংকীর্ত্তন হইতেছে। কাহারও ভাব নাই। লুটের লোভে গান। হাসিতেছে আর গান করিতেছে। আমি বলিলাম, মধু হরিনাম হইতেছে, যাবে না?

মধু—আজ্ঞে না, আমি মানি দুই দেবতা,—গাং আর কোদাল। মানুষের দুই কায—কাট, কাচ আর ধোও। মনের ময়লা কোদালে কাটিয়া দূরে নিয়ে ফেল। আর যা সূক্ষ্ম, কাপড়ে লাগিয়াছে তাহা নদীতে গিয়া ধোও। এ বুদ্ধদেবের উপযুক্ত কথা।

বাবা বলিতেন, কাশীর একটি ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন ধুতে ধুতেই জীবন গেল, তবুও মনের কিছুই করিতে পারিলাম না।

বুদ্ধদেব উপদেশ দিতেন—বাল্যের কর্ম্ম যৌবনে প্রকাশ পায়। যৌবনের কর্ম্ম বার্দ্ধক্যে প্রকাশ পায়। বৃদ্ধের কর্ম্ম জন্মান্তরে প্রকাশ পায়। তুমি গিরিগুহায় প্রবেশ কর, সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ কর, যেথানে যাও, তোমার কর্ম্ম তোমার অনুসরণ করিবেই করিবে। অতএব যত্ন সহকারে পাপ পরিহার কর ও পবিত্র হও। সুখলাভ করিবে, দুঃখের হস্ত অতিক্রম করিবে।

ভক্তিপূর্ণ উপাসনা, অকপট সরল প্রার্থনা, ও আন্তরিক ব্যাকুলতা ব্যতীত মনের শুদ্ধি হয় না। বেদমন্ত্র হইলেও তাহা

ঈশ্বরের নিকট পৌঁছে না। তাই যাহা মৌখিক লৌকিক অসার মাত্র, মধু তাহার কাছে যাইত না। ভাগবতে আছে—

কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুধ্যেৎ ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ॥

যেমন মলিনপাত্র জলব্যতীত ধোয়া হয় না, সেইরূপ ভক্তির অশ্রু ব্যতীত মন শুদ্ধ হয় না। মধু এরূপ ভক্তকে আদর করিত কিন্তু তাহাদিগকে মেয়ে বলিত। সে চায় পুরুষ; যে এক কথা কয়।

আমি একদিন বলিয়াছিলাম, মধু গয়ায় পিণ্ড দিলে কি হয়? মধু বলিল, কি জানি আমি পিণ্ডিমিণ্ডি জানি না। আমি জ্ঞানী।

মুক্তের লৌকিকব্যবহার নাই।

"বাবু, এখন মার পেটের মধ্যেই থাক্‌ব। আর বার হবার জান্‌ব না। আমার কাপড় গেছে, নেংটীও গেছে। বাড়ী যদি পাঠান গেল তয় ন্যাংটা হয়েই থাক্, আর যেমন করেই থাক্।

আপনাগেরে কাপড় ত গেল না। আর আপনারা কাপড় পরব্যারি জানলেন না। কাপড় পড়েও যদি ন্যাংটা হয়ে থাকলেন, তয় আর কাপড় পরার কাম কি? আর ভগেমালী মানুষধর্ম্মটা কি এমন কঠিনই করিছে।"

অর্থাৎ যতদিন স্ত্রী পুরুষ ভেদবুদ্ধি ততদিন কাপড়। কাপড় ব্যাসেরও ছিল কিন্তু শুকদেবের ছিল না। আমার গার্হস্থ্যও গিয়াছে, সন্ন্যাসও গিয়াছে। মায়ের মধ্যে প্রবেশ করিলে আর ন্যাংটাই বা কি, কাপড়ই বা কি?

কিন্তু আপনাদের ভেদবুদ্ধি গেল না। তার উপায়ও শিখিলেন না। কাপড় পরিলেও শিশ্ন বাহিরে থাকিলে যেমন কাপড় পরা

বৃথা; তেমনই মন যদি সতত ইন্দ্রিয়ানুগামী হয়, তবে আর গৃহস্থাশ্রমে শিখিলেন কি? মনই সব। ঈশ্বর মনুষ্যধর্ম্ম এমনই কঠিন করিয়াছেন যে তাহার অনুষ্ঠান বড়ই আয়াস সাধ্য।

আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ।

মধু—যেমন আপন ধর্ম্ম তেমনই পরের ধর্ম্ম যাজন করা লাগে।

আমি—তোমার কথা বুঝিলাম না।

মধু—আপনার ভাইকে যেমন ভালবাসেন, আমার ভাইকে সেই রকম ভালবাসা লাগে। আপনার ছাওয়াল যেমন ভালবাসেন, আমার ছাওয়াল তেমন ভালবাসা লাগে। আর হল্ বোলায়ে বেশী কথা বলা লাগে না। ছোট ছোট ক'রে অল্প কথা কওয়া লাগে। আর এ হাত (হাত দেখাইয়া) দিয়া কারো মারা লাগে না। এই কথা আমি জানি। তা আজ সকলখানি আপনার কাছে কলাম।

এখন বাড়ী যাব, আর আসব না; ফাল্গুন মাসে যাব।

ফাল্গুন মাসে মধুর মৃত্যু হইবে এবং তাহার পর আর জন্ম হবে না, এই কথা।

এর মধ্যে একদিন পাঁঠা কাটা হয়। মধু উপস্থিত ছিল। বড় বিরক্ত ভাব। সেদিন আর কিছু বলিল না। পরদিন কেশবকে (আমার তৃতীয় কনিষ্ঠ) বলিল—আচ্ছা বাবু, পাঁঠাটা যে কাট্লেন তা মন কেমন করলো না?

কেশব—অ্যাঁ তা আর কি করবো!

মধু বলিল—ও মিনু মিনু করার কাম না। এই রকম দাঁত শিটকায়ে থাকা লাগে। আমি ত এজন্মের মত কোপ্ উঠিয়ে থুইছি। এখন যা যা

জানে সেই করবি। আমরা মানুষ হই, সকলের বড় হই। আমরা যদি রক্ষাডা মক্ষাডা না করি, তয় আর কেডা করবি? আমাগেরে সেন ঠেকান লাগে। বড়মানষি কাট্‌লি আর ঠেকাব কেমন করে। আচ্ছা বাবু, ওরা ব্যথাডা পাবের জানে, কি না? ঘুঘু আমার ভাই হয়, শালিক আমার ভাই হয়, বক আমার ভাই হয়, কুত্তে আমার ভাই হয়।

(আমাকে বলিল) মোটে কথা জানি না। আপনাগেরে কাছে কথাডা মথাডা ক'বেরই জানি না। তয় আর এখানে ব'সে আবিশ্যক কি? একলা একলা চুপ কোরে থাক্‌পোনে, সেই আমার ভাল। বিল্যার (বিড়ালকে) আর অন্তরা (গানের পদ) শিখালে কি হবি? অর্থাৎ দুর্ব্বলকে উপদেশ দেওয়া বৃথা। গাংই পাল্লো না, তা আপনি। (নদীর মত যার রোক্, সেই পারে না)।

লাঠী মা'রেত কারো জ্ঞানবুদ্ধি দেওয়া যায় না। আলাপটা কথাডা কয়ে জ্ঞানবুদ্ধি দেওয়া যায়। বড় অল্প জ্ঞানবুদ্ধির মানুষ হন। বড় ছোট মানুষ হন। মারলি কি সুখ হয়? মারা লাগেই না। কেবল ঠেকানই লাগে। ভাত্‌মাত্ কার না মিঠা লাগে? আপনাগেরে শোঁদগোঁদ (বোধ-শোধ) হইল্ল না। আমি সারা জীবন মধুর এই উপদেশ অনুসারে কাটাইয়াছি; দেখিয়াছি তাঁহার কায বলিয়া প্রবৃত্ত হইলে, তিনি মহাবিপদেও রক্ষা করেন। নিরুপায় স্থলেও একটা উপায় করিয়া দেন।

জ্যৈষ্ঠমাস; মধু আম খাইতেছে ও আমাকে পরীক্ষা করিতেছে—

"কালীনাম বড় মিঠা (ধিক্‌রে রসনা)
তবু ইচ্ছা করে পায়েস পিঠা।" রামপ্রসাদ।

সাধনে নামই অমৃত তুল্য হয়। বিষয়ভোগে মন দিতে নাই। মধু—গোয়ালরা যে দই বানায় সে দুদি ঝরঝরায়ে উয়েগেরে গারথে ঘাম পড়ে। ওদই কি খায়? আমি দই টই নিজিই বানায়ে খাই। আপনিও বানায়ে খাবেন। এসব আম গুমুতি ভরা। কনত আম কৌ? আমি মধুর কথা বুঝিতে না পারিয়া বলিলাম, ঐ গাছে কত আয। মধু—তয় আচ্ছা বুঝবেরই জানলেন না। তয় আর কব কি? অর্থাৎ হরিনাম লইতে লইতে অমৃত তুল্য বোধ হয়। তাই করেন, বিষয়ভোগ ছাড়েন।

যার জ্ঞানবুদ্ধি নাই, সে বড় মানুষ হলিও তারে কিরি পোকার মত দেখি। আর যদি পাঁপড়েরও জ্ঞানবুদ্ধি থাকে, তয় তার খুব বরিংগের (বড়) মত দেখি। আপনার সাথে কতক পারি; আপনার ভাইগেরে সাথে, আর ঐ বাড়ীর দুই কত্তার (প্রতিবেশীর) সাথে মোটেই পারি না।

পাঠক—পরমহংস বলিতেন যার জ্ঞানবৈরাগ্য নাই, সে বড় লোক হইলেও তাকে খড়কুটোর মত দেখি। কথাটি মিলাইয়া লইবেন।

স্ত্রী যদি সাধনের প্রতিকূল হয় তবে তাহার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই।

বউ ভাল রাঁধলি কি হয়? খাবের যদি না দিল (যদি সাধন বিরোধী হয়) সে বউ দিয়ে কি আবশ্যক? জানকী (মধুর ছোট ভাই) কয়, দাদা (বউ) বাহার রাঁধে। আরে বা'রে ডাহাত, (ডাকাত) ভাল রাঁধলো ত কি হলো? খাবের যদি না দিল। মা কি মন্দ রাঁধে? আমি কি রাঁধবের জানি না। স্ত্রী সর্ব্ববিষয়ে অনুকূল হইয়াও, যদি ঈশ্বর লাভের প্রতিকূল হয় তবে তাহার সহিত কোন

সম্বন্ধ রাখবে না। বিষয়ভোগের উত্তম সহায় হইলে কি হয়? অমৃত আস্বাদের সে প্রতিকূল। ঈশ্বরভজনে সংসার অপেক্ষা অধিক মাধুর্য্য পাওয়া যায়।

দেখা হইলেই মধু নানা উপদেশ দিত এবং মাঝে মাঝে পরীক্ষা করিত। শীতকাল; মধু প্রমথদের আঙ্গিনায় বসিয়া আছে। আমি তার কাছে যাইতেছি; যাইতে যাইতে পথে কেন যেন মনে হইল, মধু যদি আমার গায়ের পটুর কোটটা চায় তবে কি করি? আমার দ্বিতীয় কোট্ নাই। আর লোকেই বা কি ভাবিবে? এই মনে করিয়া না দেওয়াই স্থির করিলাম। মধু বেশী কথা বলিল না। একটু নীরব থাকিয়া বলিল—বাবু, আপনার গায় ওডাকে কি বলে? আমি বলিলাম—কোট, আঙ্গা।

মধু—হয় হয় আঙ্গা, আচ্ছা ওটা আমার জ্ঞান না ক্যান? যে শীত, শীতে রাত্তিরি মাড়ি ল'গে আসে। মোল্লাগেরে বাড়ী যায়ে আগুন পোহাই, তয় এট্টু সারে।

আমি বলিলাম—এটা যদি তোমাকে দেই, তবে দুষ্টলোকে তোমার নিকট হইতে কাড়িয়া নিবে। আর আমাকেও লোকে পাগল বলিবে।

মধু বলিল—আপনাকে পাগল বলবে? তয় দেবেন ক্যান? তয় চাই না। আমি আর একটি কোট আনিয়া মধুর গায় পরাইয়া দিলাম। সেটি পুরু নয়। মধুর পরীক্ষায় আমি সেবার উত্তীর্ণ হইতে পারিলাম না। আমার দেহাভিমান ষোল আনা আছে। আমাকে কেন দয়া করিবে?

আমি সকলের কাছে মধুর প্রশংসা করি। তাই মধু বলিল, আমি বড় ভারি রাজা হইছি!! আপনাগেরে বাড়ী আলি, আমি

বড় জ্ঞানবুদ্ধির মানুষ হই !! তা ভগেমালী বল্লো, মধু তুই আর কথাটথা সেহানে কোস্ না।

বড়দিনের বন্ধে।

কয়েকদিন পূর্ব্বে আমাদের বাড়ীতে চুরি হইয়াছিল। মধু বলিল, কিছু হবিটবি না (আস্কারা হবে না)। মারা লাগে না, ঠ্যাকান লাগে। নিজে মারতে হয় না। ভগেমালীই সকলকে মারে। সে মার দিয়ে মারিছে, মাসীর দিয়ে মারিছে, ডাইর দিয়ে মারিছে, বুনির দিয়ে মারিছে।

আবার ইন্দ্রিয় জয়ের প্রশ্নে।

মধু খাইতেছিল ; শেষটা বলিল—আমিত বলিছি, আমার যখন ইক্তিয়ার নাই, আপনি যা পারেন তাই কোরবেন্।

শাস্ত্রেও ঐ এক কথা ; পুরুষকার ব্যতীত শুভগতি লাভ হয় না।

দ্বিবিধো বাসনাব্যূহঃ শুভশ্চৈবাশুভশ্চতৌ।
প্রাক্তনো বিদ্যতে রাম দ্বয়োরেকতরোঽথবা॥
অথচেদশুভো ভাবস্ত্বাং যোজয়তি সংকটে।
প্রাক্তন স্তদসৌ যত্নাজ্জাতব্যো ভবতা স্বয়ম্॥
অতএব হি হে রাম শ্রেয়ঃ প্রাপ্নোতি শাশ্বতম্।
স্বয়ং যত্নোপনীতেন পৌরুষেণৈব নান্যথা॥

যোগবাশিষ্ঠ।

হে রাম, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারগুলি দ্বিবিধ, শুভ ও অশুভ। ঐ দুইয়ের মধ্যে একটির আধিক্য হয়। প্রাক্তন অশুভ ভাব তোমাকে যদি বিপদে লইয়া যায়, তবে নিজেই যত্ন করিয়া তাহা ত্যাগ করিতে হয়। অতএব হে রাম, যত্নপূর্ব্বক অবলম্বিত পুরুষকারের দ্বারাই

জীব নিত্যসুখ প্রাপ্ত হয়; এবং অন্য কোন উপায়ই তাহা প্রাপ্ত হইবে না।

অথচেদশুভো ভাবস্তং যোজয়তি সংকটে।
প্রাক্তনস্তদসৌ যত্নাজ্জেতব্যো ভবতাকপে॥
শুভাশুভাভ্যাং মার্গাভ্যাং বহন্তী বাসনাসরিৎ।
পৌরুষেণ প্রযত্নেন যোজনীয়া শুভে পথি॥
মুক্তিকোপনিষৎ।

হে কপি, যদি প্রাক্তন অশুভ বাসনা তোমাকে বিপদে লইয়া যায় তবে তাহাকে যত্ন করিয়া জয় করিবে। জীবের বাসনানদী, শুভ ও অশুভ এই দুই পথে, দুই ধারায় বহিতেছে। পুরুষকারের দ্বারা অশুভটার জল, খাল কাটিয়া শুভটিতে আনিয়া ফেলিতে হইবে। তাহাতে অশুভটি লুকাইয়া যাইবে।

কালীপূজা হইয়া গিয়াছে। বিসর্জ্জনের দিন মধু মণ্ডপের সামনে আসিয়া বলিল—

বেশ্ ত বানাইছে; তয় চার হাতের মার চেয়ে দুই হাতের মাই (স্বভাব মূর্ত্তি) ভালবাসি; (ইহাতে বুঝিয়াছিলাম, মধু কৃষ্ণমূর্ত্তির পক্ষপাতী।) ডুবাবেন না। ডুবালেও যা, না ডুবালিও তা; আমি আসে আসে দেখ্‌ব। ছাওয়াল পাওয়ালেও দেখবি।

আজ রাত্রে রামায়ণ গান হবে। আমি বলিলাম, মধু গান শুনবে না।

মধু বলিল—আজ্ঞে আমি রামায়ণ গাহনাডা শুনে থাকি। আমার কথার বিশ্বাস নাই। কাশ কাঁসরে পেটভরা। দুঃখির সীমা নাই। আসপো না আসপো কব্যার পারি না।

বাবু, ভাতটা মাতটাই কথা। ভাতটা মাতটা পালি, তয় সেন কথা কওয়া আসে। তার আগে আর আসে না। "কিমর্থং কাঞ্চনকায়া

কিমর্থং শুয়রের মুখ।" ভাল কথা না কলি, ভালমুখ না কলি, শুয়রের মুখ।• দিলেই পাওয়া যায়। আচ্ছা ম্যাড়ার মাংস দিয়ে নি খুবক'রে ভাত মাত দিবের পারেন? সরালীর (পাখী) মাংস দিয়ে নি এক ধামা চালের ভাত দিবের পারেন? বাঘাড়মাছের ঝোল দিয়েনি একডোল চালের ভাত দিবের পারেন? রাঘববোয়ালির এত বড় এত বড় সিংড়ি দিয়েনি একগাদি ভাত দিবের পারেন? কুমীরের মাংস দিয়েনি এক মোরগা চা'লের ভাত দিবের পারেন? কুমীর ত আমার খায়ে ফেলবি না! আমি ছোটকাল ইস্তক ডাঙ্গায় থ্যা জল খাই। ডাঙ্গায় থ্যা কলবল্ করে নাই। জলে নামিই না। সে, যে জন্তি। জলে নামলিই খায়ে ফেলবি। হাতিমা'রে, মরাহাতীর মাংস দিয়েনি আমার ঠাসে ভাত দিবের পারেন?

আমি বলিলাম, হাতী পাব কোথা?

মধু বলিল, ক্যা? হাতী ত মরে। কুহ্র্যার (মুরগী) মাংস দিয়েনি ভাত দিবের পারেন? কুহরে খান ত? আমি—হাঁ একালে খেতাম, এখন আর খাই না।

মধু বলিল, ক্যা ছাড়ান দিলেন ক্যা? খুব মিঠ্যা লাগে। আমিত মোছনমানেগেরে বাড়ী খাই,—মধুর মত লাগে। খাবেন্, ঠাসে খাবেন।

মধুর কথার অর্থ এই যে ঐরূপ রসের সহিত হরিনাম লইতে হয়। প্রহ্লাদ বলেছিলেন, অবিবেক মনুষ্যের বিষয়ে যে নিত্য প্রীতি, তোমাকে স্মরণ করিতে সেইরূপ প্রীতি যেন কখন আমার হৃদয় হইতে না যায়। মধু এইরূপ আহারের কথা বলিলেই, আমি যাহা খাইয়াছি স্বীকার করিতাম। গোপন করিলে সে ধরিয়া ফেলিত; বলিত, "খান নাই কলেন, তয় আচ্ছা।"

আচ্ছা বাবু, কৃষ্ণনাম নিলি কি হয়? আমি বলিলাম, দুঃখ যায়। আচ্ছা বাবু, ভগেমালীর দেখা যায় না ক্যা? সে আছে কনে? আমি বলিলাম, তুমিই জান। মধু হাসিল।

বাবু, সন্দেশ বড় মিঠ্যা। তা কনে পাওয়া যায়, কব্যারনি পারেন? রসটা বড় মিঠ্যা। রসগোল্লার রস; (বাবার শ্রাদ্ধের সময় মধুকে গ্লাস ভরে রস দেওয়া হইয়াছিল)। রস কনে পাওয়া যায়? আমি কোলা কোলা রস খায়ে থাহি।

বিষয়রস ব্রহ্মরসের কাছে কিছুই নহে।

২১।৩।০৫। ইন্দ্রিয় অবশ যার দেবতা কি বশ তার?

বাবলা গাছে আম্র কি ফলে?

রামপ্রসাদ

বাবু, বাড়ী আসেন গাঁজাটাঁজা খাওয়ার জন্যি; তাই হয় না। এহেবারে ফুলে, মোয হয়ে গাঙ্গ দিয়ে ভা'সে যান। এইত আজ আমার সগল কথা কলাম। আচ্ছা আছেন এক ভাবে, সেই ভাল। আমি মনতোর টোনতোর জানি না। ভগেমালীই মনতোর টনতোর দিয়ে সব ছিষ্টি করে, বাঁচায়ে রাখে।

বাবু, আপনার কাছে ভাত্ মাত্তের এপারের কথা কব্যার পারি; ওপারের কথা কব্যার পারি না। (আপনার চিত্ত শুদ্ধিই হয় নাই; কর্ম্মাধিকারের কথা বলিতে পারি। জ্ঞানাধিকারের কথা বলিতে পারি না)।

১৫ই ভাদ্র। ১৩১১।

তীব্রসাধনে ভক্তি হয়।

গাঁজা খাইতে খাইতে বলিল—

আট্যা টান দিলি সেন মধু পাওয়া যায়। আমি আট্যা টান দেই, মধু পাই। আচ্ছা হুঁকায়ই যেন টানেন। দিন কতই খুব আট্যা টানেন (পরমহংসও এই এক কথা বলিতেন ; এক দিন, এক মাস, তিন মাস। সব ছেড়ে নির্জ্জনে বসে তাঁকে ডাক্‌বে)।

ঈশ্বর অন্তর্যামী।

একদিন একটি ছাগল মধুর নিকটে ঘাস খাইতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—মধু, ভগেমালী এই ছাগলের মধ্যে আছেন ?

মধু—হেঁ আছেন। তিনিই হাঁটাচ্চেন। তা না হলিকি হাঁটে ? মধু, তাঁকে পাওয়া বড় কঠিন, না ?

মধু—হেঁ। মধু এক অপূর্ব্ব দৃঢ়তাব্যঞ্জক দৃষ্টিতে আমারদিকে তাকাইল। গ্রীবা উন্নত, চক্ষু বিস্ফারিত, স্থির নির্নিমেষ। আমারদিকে তাকাইয়া বলিল—তা এই মানষিই ত পায়। আমার শোনা আছে, "যে ধায় সেই পায়। বিধি কারো বাম নয়।"

নচিকেতাকে যম এই কথাই বলেছিলেন—

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ। যে তাঁকে বরণ করে, প্রার্থনা করে, সেই তাঁকে পায়। তিনি প্রসন্ন হ'য়ে তাকে দেখা দেন।

মধু জাতিতে অতি নীচ। তাহাকে এই বেদবিদ্যা কে শিখাইল ? ব্রহ্ম ও ক্ষত্র যাঁহার অন্ন, মৃত্যু যাঁহার উপসেবন তাঁহার বরণীয় জ্ঞান এই নিরক্ষর কৃষককে কে দিল ?

আমি নিত্য গীতা পড়িতাম। এমন মিষ্ট লাগিত যে দশজনকে ভাগ দিতে ইচ্ছা হইত। গীতা ক্লাস খুলিলাম।* ২।৪ দিন বেশ ছাত্র জুটিল। শেষে উষার নক্ষত্রের ন্যায় একে একে সব অদৃশ্য হইত; আমি কিন্তু যাইতাম। শূন্য ঘর প্রতিধ্বনিত করিয়া নিজেই পড়িয়া আসিতাম। যাতে যার সুখ হয়, সেকি তা ছাড়ে?

যখন বাড়ী যাইতাম, সেখানেও গীতা পড়িতাম। দশ জন শুনিতে চাহিত, আমি পড়িতাম। একদিন উঠানে বিছানা হইয়াছে, পাড়ার লোকেরা বসিয়াছে। মধুও আসিল, একটু দূরে বসিল। মধুকে দেখিয়া সেদিন পড়াটা তাড়াতাড়ি সারিলাম। মধুকে দেখিলেই আমি পড়ি তোমরা শুন, এইযে ভাব, অহং এর গন্ধ, তা টিকিতে পারে না। পড়া শেষ হইল; সকলে উঠে গেল। মধুও উঠিয়া গেল। আমি মধুর সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। নির্জ্জন পাইয়া বলিল, ওকি করেন? আমি বলিলাম, ভগবানের কথা বলি; দশজনে শুনে। মধু বলিল—বাবু, যা নিজি পারা যায়, তাই খুবক'রে মানষির কাছে কওয়া লাগে। যা নিজি পারনা, তা মানষির কাছে কয়ে কি ফল? আকাটা বাঁশের গোড়াধ'রে টানলি কিহবি? অর্থাৎ বাঁশের ঝাড়ের মধ্যে বসিয়া ঠুক ঠুক করিয়া বহুকষ্টে বাঁশের গোড়া কাটিতে হয়। তখন টানলেই বাঁশ ঝাড় হইতে বাহির হয়। আর তুমি গোড়া কাট নাই, তোমার মূলের দিকে দৃষ্টি নাই। তোমার অহংকারে মাথা উঁচু। তোমার দৃষ্টি উপরে। তুমি ভাব কঞ্চিতে বাঁশ আট্‌কে আছে। কঞ্চিটা ছাড়িলেই বাঁশ বাহির হয়। তোমার সেদিকে দৃষ্টি নাই যে গাছের গোড়াই আগে কাটিতে হয়। নিজে সাধ, পরে সিদ্ধ হইয়া অপরের উপায় করিও। স্বয়ং অসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়তি।

* রাজসাহী কলেজে।

বাবু, ছিষ্টি কর্ত্তার দুঃখির সীমা নাই। যত জীব ছিষ্টি করিছে সকলের দুঃখ তার। আর জীবই করিছে কত? মুখ্‌খুই ভাল; কথা ত কব্যার জানিনা।

জ্ঞানবুদ্ধি হইতেছে কি না, তাহার পরীক্ষা।

বাবু, গাঁজা আর বড় খাই না। মোল্লাকত্তাগেরে (একটি মুসলমান) বাড়ী তামুক টামুক খাই। আচ্ছা বাবু, একটু আগুণ আর পাতা নি দিতি পারেন? কন ত কেমন ক'রে দিবের পারেন। আমি বলিলাম, কল্‌কে ও তামাক দিতে পারি। মধু হাসিয়া বলিল—ও তয় চাইনা। (আগুণ=পুরুষকার। তামাক=নামে অনুরাগ, রুচি, আপনার আছে কি? এই ভাব)। আমি বলিলাম, মধু রাত্রে খাও নাই? মধু—আজ্ঞে না।

বাবু, ভগেমালী মস্ত জোয়ান। কিছু (ভক্তি) দিয়ে নরম হয়ে চালি, সব পাওয়া যায়। আমরা নরমই হবের পারিনা। আমার কথা লোহার গুলি, হাড়; মিছে কথা কখন কবের জান্‌লাম না।

ঈশ্বরের সমত্ব। জননী।

সৃষ্টিকর্ত্তা সকলেরই ভালবাসেন। বড় মানুষেরও দুটে থাবড় টাবড় দেন। আমাগেরেও দুডে থাবড় টাবড় দেন। আবার তিনিই সকলেরই রক্ষা করেন, খাতে দেন।

ম'নে ভাঙ্গী (মন মত্তকরী)।

(ভাত খাইতে খাইতে) বাবু, মনে ভাঙ্গী বড় জবর লাঠেল হয়? এজন্মে ত তার সাথে পাল্লাম না। বড় হলি সেন তার সাথে পারি। বড় হবেরই পাল্লাম না। আর কতইবা বড় হব। (মধু

"ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি")। (লোকে কাহাকেও কষ্ট দিলে) মারবের ত পারিনা। মুখদিয়া সেন লাঠি মারবের পারি; (ফোঁস্ করতে পারি, কামড়াতে পারিনা)। হাটের পর থাকবেরই পারিনা। মনে ভাঙ্গী থাকবেরই দেয়না। যা একটু এখানে (আমাদের আমতলা) বসি।

আমি পরমহংসদেবের সাপের ফোঁস করার কথা বলিলাম। মধু পাতা * ফেলিতে গিয়া নির্জ্জনে আমাকে বলিল "আপনি ত ভাল, সকলের কাছে ধরায়ে দেন।" মধু প্রচ্ছন্ন থাকিতে চায়।

মধু জীবের দুঃখ দেখিতে পারিত না।

আমাদের একটা গাই চরিতেছিল। তার গায় আঠালু ছিল। মধু বলিল—গোরুর গায় যেন আঠালু লাগেনা। খশায়ে ফেলাবেন। আহা, গায় কত ব্যথা।

আমি—আচ্ছা মধু, ভগেমালী আঠালু গায় দেয় কেন?

মধু—ভগেমালী বোঝে না। তার তা কওয়া যায় না। আঠালু সেন মাটীতে দিবি। ভাত মাৎ খাবের দিবি। (কেবল যে খেতেই জানে, তাকে মাটিতে দিতে হয়; মাটী সকল অন্নের জননী)।

একদিন আমাদের একটি চাকর একখানি কাপড় অপছন্দ হওয়ায় ছুড়িয়া ফেলে দেয়। এই বেয়াদবীতে আমার ছোট ভাই তাকে দুই একটা চড় দেয়। মধু সারাদিন বকিল—বড় ত বুঝিছেন। বেশ ত বুজিছেন। খুব ত বুজিছেন। বুজিছেন ত খুব! আহা, গায় কত ব্যথা কত দুক্কু। (আমার দিকে তাকাইয়া) কাপড় খান আপনিই নিয়ে যাবেন। উয়ের মার কাছে দিবেন। তয় পরবি কি?

* খাওয়া শেষ হইলে।

মধু একদিন একবাড়ী গিয়া ভাত চাহিল। তারা বলিল "আমাদেরি খাওয়া হয় নাই, আগেই তোমার ভাত দিব?" মধু ফিরিয়া আসিল। পথে একজন জিজ্ঞাসা করিল—মধু ভাত খেলে না? মধু বলিল—না, ওঁরা বড় বড় মানুষ, ওঁরা নিজি না খালি কারো ভাত দেন না। (উত্তম বড় মানুষের লক্ষণ)!

হিংসা ও তাহার নিবৃত্তির উপায়।

মধু—আমি যে ভাল ভাল দেব্য খাই, সকলেরই তাই খাওয়াই। হিংসা (আত্মপরবুদ্ধি) ত করবের জানি না। ভগেমালী, যে আমাদের ভাত মাত খাবের পাঠাইছে, সে কি কারো হিংসা করে? হিংসা ঠ্যাকাণ বড় নাঠীর কাম। কম নাঠীতি কি হিংসা ঠেকে? আমিই কোনমতে ঠেহাই। নোয়ার ঢাল্‌টাল্‌ দিয়ে মানুষ রক্ষা করি। মুখদিয়াই ঠেহাই।

পুরুষকার চাই।

আমি খুব নারাই (লড়াই) করি। নীচে কখন পড়বের জানিনে রে। তারে চীৎকরে পাড়েই ফেলি রে (নীচে ফেলি)। গাঁজা (তীব্রানুরাগে ঈশ্বরের জন্য পাগল) চিনলেন-ই না। তামুক টামুক (সামান্য সাধন, নিত্য কর্ম্মের সাধন) খায়ে আর কত সুখ হবি?

মধু পাতা লইয়া উঠানে বসিল। সে পাতা ফেলিয়া সে জায়গায় গোবর দেয় না বলিয়া উঠানে ভাত দেওয়া হইল না। মধু উঠান ছাড়িয়া আর এক জায়গায় বসিল। একটি বিধবা ভাত দিতেছিলেন; তিনি বলিলেন—মধু এখানে ঘাস, ভাত পড়ে থাকবে। ছেলে পিলে দেখ্‌তে পাবে না। ঐ গাছতলা সরে বসো। মধু উঠিয়া তাঁহার

পেছনে পেছনে চলিল এবং বলিল "মধুর জায়গা আর এ ব্রেহ্মাণ্ডিতে হবি নারে" (অর্থাৎ মধুকে আর সংসারে আসিতে হবে না)।

প্রার্থনা ও আত্মহিত বুঝা।

মোটে বুঝি না। বুঝলি সেন্ চাবের জানব। চাবেরই জানলেম না। তয় আর পাব কি।

ইন্দ্রিয় সংযম ও পুরুষকারই সব।

পাঁঠা কাটা হইয়াছে। মধুকে মাংস ও ভাত খাইতে দেওয়া হইয়াছে। মধু খাইতে খাইতে বলিল—খুব দাঁত খেমটী করে থাকা লাগে। আমার কথা এই, হয় দাঁতই ভাঙ্গ্‌বি, না হয় হাড়ই ভাঙ্গিব, ছাড়াছাড়ি নাই। এই দেখেন, এই বলিয়া একখানি মেরুদণ্ডের হাড় লইয়া অনেকক্ষণ চিবাইতে চিবাইতে চূর্ণ করিয়া খাইয়া ফেলিল। তারপর বলিল, একটা কল্‌কে বানান লাগতিছে তা কয় যুগ লাগ্‌বি, কব কেমন করে? তয় গাঁজা খাওয়া।

সাধন পথে নিয়ম এই,—আগে গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস, তার পর তাঁর সঙ্গ, তারপর ভজন। তাতে পাপক্ষয়, তাহা হইতে নিষ্ঠা, নিষ্ঠা হইলে রুচি (মিষ্ট বোধ), তারপর ভাব (অনুরাগ), তারপর প্রেম (আনন্দময়ে মগ্ন হয়ে নিজের দেহ ভুল হয়ে যায়)। কল্‌কে অর্থ—এই বিশ্বাস। বিশ্বাস জন্মাতে কত যুগ লাগবে। তারপর গাঁজা খাওয়া—সাধন। হিংসা বিবাদ ত্যাগ করিবে, ঈশ্বরে নির্ভর করিবে।

মধু বলিত—

১। বড় হ'য়ে মার্‌লি ছোট দেহ পাব।

২। মোটে ঠ্যাং নাই, উঠব কেমন ক'রে।

৩। যে নাঠী মারে সেও খাবের পায়। আর যে একেবারে চুপ্‌করে থাকে, সেও খাবের পায়।

৪। এক বাড়ি (আঘাত) দেই, আর দেই না।

৫। জ্ঞানবুদ্ধি হলি বুঝে। চুপ্ করে থাকাই ভাল; কথা কলি (অপকারের প্রত্যুপকার করিলে) পারে ত সে আমার মারে, আর পারি ত আমি তার মারি। আর দুই জনে মারামারি করে মরার ঠ্যাক কি?

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—মধু, ভগেমালী কোথায় থাকে?

মধু—ভগেমালী কাছেই থাকে। কিন্তু তার ধরা বড় শক্ত। তাঁকে পেতে হলে জীবকে পীড়ন করিতে নাই। আর খুব পুরষকার চাই।

মধু বলিল—আমি না-'ব্যাথা'-'জ্ঞান'-'বুদ্ধির' মানুষ হই। আমি কারও মারব্যারি পার্‌লাম না। আর আপনারা 'ব্যাথা'-'জ্ঞান'-'বুদ্ধির'-মানুষ হন। আপনারা মারব্যার জানেন। আমি ২॥ পহরে ১১ কুড়ি ৫ আটি ধান কাটিছিলাম। ভারি নাঠ্যালির কাম। যৌবনে মধু খুব জোয়ান ছিল এবং খুব ভাল লাঠী খেলিতে পারিত। লাঠী খেলা শিখিলে একটা আত্মাভিমান হয়, একটা তেজ

অর্থ।

১। যার জ্ঞান আছে, সেও যদি অজ্ঞানীর মত হিংসা দ্বেষ করে তবে ছোট হয়ে যায়।

২। পায়ে বল না থাকিলে কেহ দাঁড়াতে পারে না।

৩। দেখ, বাঘ ভালুকও খাইতে পায়। আবার ছাগল ভ্যাড়া নিরস্ত্র, তারাও খেতে পায়।

৪। একবার বলি, যার বুদ্ধি আছে সে তাতেই বুঝে।

হয়, সে কাহার কাছে নত হইতে চায় না—"ভজ্যতে নচ নম্যতে"। সে ভেড়া হয় না, ইন্দ্রিয়ের দাস হয় না; কাপুরুষ হতে পারে না মধু বলিত—ঈশ্বর লাভ লাঠেলের কাম—মাগীর কাম না—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। শরীরে বল না থাকিলে মনের বল হয় না। বিনা বলে কর্ম্ম ও ব্রহ্ম কিছুই হয় না।

বেদে আছে—ভীম্মোহি দেবঃ মহসঃ মহীয়ান্। মন অতি ভয়ানক দেবতা; ইহা বলবান অপেক্ষাও বলবান্। ইহাকে মুঠার মধ্যে না রাখিলে সাধন হয় না; ঈশ্বর লাভ হয় না। আর লাঠেলই মনে ভাঙ্গীর নাকের উপর তিন কীল দিয়া তাকে ফেলিয়া দিতে পারে; লাঠীতেই অন্ন, লাঠীতেই ব্রহ্ম। বেদ পড়, এসত্য অনুভব করিবে। গৌড়ভূমি মার প্রিয় ক্ষেত্র। "গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা"; মার বরাভয়-প্রদ হস্ত আমাদের উপর নিরন্তর প্রসারিত। একটু ডাকিলেই তাঁর "মাভৈ মাভৈঃ" রব শুনিতে পাওয়া যায়। তারপর তিনি একবার হৃদয়ে এলে—তাঁর কালভৈরব মূর্ত্তি দেখিয়া যমের ভটা দূর হয়—"আমি যমের যম হতে পারি ভাব্‌লে রে ব্রহ্মময়ীর ছটা"। আমরা নিরন্ন হয়ে পাপী হয়ে গিছি। আবার পাপী হয়ে নিরন্ন হয়ে গিছি। মধুর মত সাধুও এই হিন্দুর দেশে, বেদশাসিত দেশে, অনাহারে দিনপাত করিয়াছে। মধু একদিন বলেছিল—ভাত্‌টা মাত্‌টা বড় পাই না। বাবু, আমি মাটী খায়ে দেখ্‌ছি; গাছের পাতা খায়ে দেখ্‌ছি। তা থাকা যায় না। থাকা গেলে আর আমি আমি না। যোমই পাড়ি; যখন আর ক্ষিদের জ্বালায় থাহা যায় না, তহনি আমি। দেন, চাড্ডা ভাত মাত দেন। আর লজ্জা করে কি করবো। পরাণডা ত বাঁচান চাই। গলাডা ত ভাঙ্গে ফেলবের পারি নে।

মধুর অহংকার আছে বা মনে করি, তাই পরিহার করিতেছে—

মেয়েমানুষ হই। ছোট মানুষ হই। বাঘের আহার হই। ভগেমালী সৃষ্টিকর্ত্তা, সেই সব রক্ষা করে। আমরা মিছ্যা মানুষ।

মধু যে সব উপদেশ দেয়, সে ইচ্ছা করে যে আমি তাহা সাধন করি। কিন্তু আমার প্রবৃত্তি অন্যরূপ। তাহার বিশেষ ইচ্ছা যে আমি বাক্‌সংযম করি, কিন্তু আমি তাহা কিছুতেই পারি না। তাই বলিতেছে—

মেয়েমানুষের (বলহীন ইতর লোকের) কাছে রং তামসার কথা কই। আপনার কাছে ঝাড়া কথা কতাম। তা ছাড়ান দেলাম। আর কব না। চাড্ডা ভাত মাতই যেন দেন। আপনার সাথে আমার কেবল ভাত মাতেরই সম্বন্ধ; আর কোন সম্বন্ধ নাই। এই দিন মধু দুপ্রহরে আসিয়া গাছ তলায় বসিল। আমি মনে মনে বলিলাম—সাধুদিগের কৃপায় অজেয় শত্রুও জিত হয়। আমি চেষ্টা করিয়া দেখিলাম; আমা দ্বারা হয় না। তুমিও ত কিছু কল্লে না। মধু পাগলামী করিয়া লোকজন সরাইল; তারপর নির্জ্জন হইলে বলিল—সর্ব্বনাশ! মধু বোলে কিছু কল্লো না। এই কালা গাইডা (একটা কাল গাই বাঁধাছিল, তাহাকে দেখাইয়া) আছে, তা ফাঁ'দেও যাব্যার পারবেন না। একটা গুরিও মার'বের পারবেন না, ছুবে'রই পারবেন না, তয় আমি করবো কি? অর্থাৎ প্রকৃতিকে অতিক্রম করিবেন না। একটা লাথিও মারিতে পারিবেন না। তাকে ছুতেই পারিবেন না, তবে আমি কি করিব? ইন্দ্রিয়সংযম নিজেই করিতে হইবে।

মধু ভাত খাইবে; একখানা ছেঁড়া পাতা আনিল। আমি বলিলাম—মধু, পাতাখান ছেড়া হইল। মধু (হাসিয়া) বলিল-

উয়েতেই হবিনি। নিত্যিই মানষির তা ছিঁড়ে ছুটে আনি। কবেই মা সকলের বেশ ক'রে মাছ ভাত দিবি। মার ই হাত। মার ই হাত। রাজায় দিলি রাজারও সুখ হয়, প্রজারও সুখ হয়। রাজারই নাই, আমাগেরে দিবি কোন খান্‌থে?

অর্থাৎ লোকেরই নাই, আমাদিগকে দিবে কোথা হতে।

পূজার ছুটি শেষ হইল। আমি আজ বাড়ী হইতে রওনা হইব। আমার বাসা লইয়া কাহারও সহিত বিরোধ ছিল; তাই বলিল—

আমি যা করি তাই কর্‌বেন; ঝগড়া নারাই কর্‌বেন না। সাধনসম্বন্ধে বলিল—তামুক টামুক খাবেন আর কি? অর্থাৎ গাঁজার অনুরাগ ত দেখবেন না; তামাকই খাবেন আরকি! যেমন করেন সেইরূপই ঈশ্বরকে ডাকবেন।

পূজা।

মধু—খাওয়াডা খুব নির্জ্জনে হওয়া লাগে। খাওয়া—পূজা।

আমি ভগেমালীর কই আমার যে খাবের দিবি তা যেন আঁচি ঘরের মেয়ে—যে এহনি জন্মিছে, সেও যেন ট্যার না পায়। কাল জ্বরের পর খালাম। খাওয়া ভালই হলো। খালাম সেন, মজলিসীর খাওয়া, সুখমুখ হলো না। কেডা খালো জানবেরই পাল্লাম না। আমিত খাইনে খাওয়াই, "আদয়ন্ গুণান্"। একজন মুসলমান মরেছিল তার ফয়তা খাইতে গিয়াছিল। মধু সকল জাতির ভাত খায়।

ব্যাম পীড়ায় ব্যাকুল হতে নাই।

আমার দুই হাতে ৬ বার বিষ লাগে ফুলে বারার পাতিলির (বাহিরের হাড়ি) মত হইছিল। কিছু কল্লাম না, আপনি সারে গেল। আমার রাজগাঁড়া (deep abcess) হইছিল (এই বলিয়া সেই স্থানটা দেখাইল); আটমাস চিক্কর পাল্লাম। শেষে ফাটে বারাল। এই হাতে ৬ বার বিষ লাগে, ফুলে এই হইছিল। কিছু কল্লাম না, আপনি সারে গেল। এই রকম ভ'গে আমাগেরে বাবারে মারে ক'রে চিক্কার পারায়। কখন ভাতটা মাতটা দেয়; সুখটা বিলসনটা দেয়। সব সেই মারই ইক্তিয়ার। ঈশ্বর মালী ব্যাশোকা, তার ত ব্যাম দুক্কু নাই। সেই মানষির ব্যাম দুক্কু দিয়ে, ভ্যাদ ম্যাদ দিয়ে, মা'রে ফেলে। ৩২ বার জ্বর হলো। দেহ থাকলি আর সুখ কৈ? তৈয় সুখ থাক্‌পেরও পারে। (ব্রহ্মানন্দ)।

মধু গান ধরিল—

অটল খাজরির গাছে কি মধুর রস আছে
ওরে খোঞ্চার গুণে ওলামিশ্রি কত দ্রব্য করিছে।

(কণ্টকময় খেজুর গাছে মধু আছে। কণ্টক কাটিয়া ফেলিতে পারিলে তাহা পাওয়া যায়। তা জ্বালদিয়ে ওলা মিশ্রী হয়। তেমনি দেহ ও কাম ক্রোধাদি কণ্টকে ব্যাপ্ত। কণ্টক দূর করিতে পারিলে হিতানুষ্ঠান সম্ভবে। তারপর পাপক্ষয়ে মধু লাভ হয়)।

মধু—বাবু, এবার বড় পূজা (দুর্গা-পূজা) করেন।

আমি—মধু, টাকা নাই।

মধু—আচ্ছা যা পারেন, তাই করেন। মোটে সুখ হয় না ; এট্টু সুখ যদি হয়, তা ছাড়া কেন? বুন্‌লিই কাটা যায়। গাং জলি খুব হয়। কোনবার ডুবেও যায়। আবার খুব পাওয়াও যায়। জলের মধ্যেও বোনে।

সাধন করিলেই ফল হয়। দেহই গাংজলি ধানের জমি ; ডুবিয়া যাওয়াই ইহার স্বধর্ম্ম। কোন বার ফল পাওয়া যায়। কোনবার সকল শস্যই জলে নেয়। আবার জলের মধ্যেও ধানের চারা লাগায়। তেমন গুরু হইলে কিছু বিষয়রস থাকিতে (চিত্ত শুদ্ধির পূর্ব্বেও) জ্ঞান উপদেশ করেন, এবং বিষয়ানুরাগ ফিরাইয়া ঈশ্বরানুরাগে লইয়া যান। (অস্পষ্টান্ন যজ্ঞ তামস)

মধু বলিল—বাবু, পূজাটা ছাড়িলেন কেন? এবার পূজা করেন। আমি বলিলাম—টাকার কায। মধু বলিল—চা'য়ে নেন (ঈশ্বরের নিকট চাও)। আমি বলিলাম—যদি তাঁর কাছে চাইব, তবে ধন চাইব কেন? জ্ঞান ভক্তি চাইব। মধু বলিল—তয় আচ্ছা ; যা পারেন তাই করেন। ছুট্টু ক'রে পিত্তিমা (প্রতিমা) করেন আর খুব খাওয়ান। খাওয়ানই পূজা। মানুষ যদি না খাওয়ান তয় আর কিসের পূজ্যা। আপনাগেরে পূজ্যারই বাড়ী। পূজ্যার

বাড়ীর সাথেই আমার সম্বন্ধ। পূজ্যাডা করেনই। তাতে ভাল হয়। (মধু শক্তি উপাসক কৌল)।

পুরুষ মানুষের সাথে আমি পীরিত করি। তারকাছে বসি, আলাপ করি; দুইজনে গাঁজাটা, তামুকটা ভাংটাং খাই। মেয়ে মানুষের সাথে আমার কোন সম্বন্ধ নাই। মেয়েমানুষ কাছেই আস'বের দেই না। সকল সময় মেয়েমানষির কাছে থাকৃলি কি হাত পায় বল থাকে? এহিবারে অজ্ঞিয়ান ক'রে ফেলায়।

মেয়েমানুষটা কাছে আসবেরই দিবেন না। ঘরে এক জোড়া কপাট করে দিবেন। মানুষ সমান কাঁটা দিয়ে পথ আটকায়ে ফেলবেন। তার যা মন লয়, তাই করুক। আপনার মত আপনি থাকবেন। (আমি ছেলেকে মধুর জন্য ভাত আনিতে বলিতে ছিলাম)। শোনেন শোনেন, ইয়েতে আপনার উপকার হবি। এখানে মোটেই সুখ নাই। এক জায়গায় এট্টু সুখ আছে। তা কেউ যা'বের চায়না। মন আঁটে বাঁধা লাগে, তয় সেন কাম (কাজ) হয়। আমিই পাল্লাম আর কেউ পাল্লো না। কারো সোঁদগোঁদ (বোধশোধ) ই হলো না। চারি হাত উঁচু বেড়া যে দেখা না যায়, আর কাঁটার বেড়া যে বেড়ার নিকটেও যাওয়া না যায়। মধু আবার বলিল —ছোটকাল ইস্তক না হলি আর ধর্ম্মডা হয় না। ধর্ম্মডা বড় কঠিন। কেবল কথা কলি কোন্ কামে আসে? না—আলিস্যির (কর্ম্মপরায়ণ) মানুষ হওয়া লাগে, তয় সে মানুষধর্ম্ম যাজন হয়। মানুষ খাবি দাবি দিব্যি সুখি থাকৃপি, পাগল হবের যাবি কিসির জন্যি? ভগেমালী কেবল মেয়েমানুষ সৃষ্টি করে। পুরুষ মানুষ সৃষ্টি করেই না। য়ে কথা কয়ই না, সে পুরুষ মানুষ। পুরুষ মানুষ এক কথা কয়। বড় কষ্টে মানুষ জন্মডা পাওয়া গেছে! আলিস্যি

কল্লি কি সুখ হয়? আলিস্থি করলি কি সুখ হয়? আপনাগেরে জলবুঝ আলাদা, আমাগেরে জলবুঝ আলাদা। আপনারা এক জলে নান্ আর এক জল খান। আমরা এক জল খাই, এক জলে নাই। আপনারা এক বুজ্ঝ বুঝেন, আমরা আর এক বুজ্ঝ বুঝি।

অর্থাৎ আপনারা বুঝেন অনিত্য বিষয়-রূপ-রস, আমরা বুঝি নিত্য ; নিত্যসুখ ব্রহ্মানন্দ। সাধিলে নাম অমৃত হয়। আর দূরে থাকিয়া সংসার করিতে হয়। ঘনাইয়া বসিতে হয় না। মিয়েমানষি ভাত টাতই ঘাম টাম দিয়ে দেয়। নিজে বানায়ে যেন খান। আর চামচে দিয়ে যেন খান। ৭।৮ হাত এক বাঁশের চামচে যেন বানায়ে নেন। আর দুদির বাটী (ভোগ্যবস্তু) তফাৎ থুয়ে চামচে দিয়ে নিয়ে খাবেন। তয় আর ঘাম পড়্‌বি না। চামচে দিয়েই সব খাওয়া লাগে। যখন আবশ্যক হয় এক আধ বার যেন বাড়ীর মধ্যি আসেন।

বাবু, আপনি ভেড়ীর মাংস খান?

আমি বলিলাম—না।

মধু বলিল—আমি খাই। আমি কইছি যখন, আপনার বুঝি পিরবিত্তি হয় না?

আমি—না।

মধু—হয়, নাই কলেন। তয় আচ্ছা। বাগাড় মাছ দিয়ে চাড্ডে ভাত নি দিবের পারেন? হাতীর দুদ নি দিবের পারেন? সের আষ্টেক? য়্যাঁরে ভগে, তুই হাতীর দুদ খাস নাকিরে? আমি দুদ চুমুক পারেই খাই। ২।১ দিন ভাত দিয়ে খাই।

ভাত দিয়ে দুদ বোধ হয় নামে আনন্দ। চুমুক দিয়ে দুদ বোধ হয় আনন্দসাগরে ডুবা।

মধুর কাছে মিথ্যা কথা বলিবার উপায় ছিল না। ভূল হইলেও সে ছাড়িত না। থাই নাই কলেন? হয়, নাই কলেন? এইরূপ প্রশ্নে জানাইত আপনি খাইয়াছেন।

পুনর্জন্ম।

ভগেমালীই আনে। সেইমার প্যাটের মধ্যি থোয়। (সিহরিয়া) নিহাস বন্ধ করে থোয়। সেই সকল করে।

আয়ু নির্দ্দিষ্ট।

বাবু, চাল (চাউল) থাকিতে মানুষ মরে না। ঐ ফকির (একজন রুগ্ন বৃদ্ধ ফকির) মরবি না। ভাগবতেও ঐ কথাই আছে—

দৈববশে চলিলেও যতদিন স্বারম্ভক কর্ম্ম অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্ম্ম থাকে তত দিন দেহ, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত জীবিতই থাকে।

দেহোঽপি দৈববশগঃ খলু কর্ম্ম যাবৎ
স্বারম্ভকঃ প্রতিসমীক্ষ্যত এব সাসুঃ॥

মনের ভয়ে কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি অমনোযোগ মহাভ্রম মাত্র। কিন্তু এই মরণ ত্রাস ব্রহ্মারও আছে। যে অবিদ্যার গণ্ডীরমধ্যে তাহারই আছে।

এবার মধুর খুব জ্বর হইয়াছিল। জ্বর প্রায় ২০ দিন ছিল। ভয়ানক জ্বর; রাত্রিতে বাহিরের ঘরের বারান্দায় থাকিত। আবার প্রভাতে উঠিয়াগিয়া গাছতলায় পড়িয়া থাকিত। তাহাকে ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল। একদিন খাইয়াছিল, আর খাইল না। জ্বরের মধ্যে বলিত—বাবু কুদিনারী ই (অবিদ্যা) আমার ঘরে রাখ’বের পাল্লো না। আপনারা আর আমার রাখ’বের পাল্লেন না।

এই সময় হইতে মধু প্রায়ই মৃতুর পূর্ব্বাভাস বলিত। একদিন বেলা ২টার সময় হাটখালি হইতে আমাদের বাড়ী আসিল। মধ্যে একটা মাঠ, আধক্রোশ পরিসর। মধু খুব প্রসন্ন। গলার স্বর ভাঙ্গা ভাঙ্গা। আমাকে বলিল—বাবু, ক'লো ফাল্গুনমাসে বোলে সুখ মুখ হবি। আমি বলিলাম—ফাল্গুন ত গেছে। মধু বলিল—"আস্‌তিছে"। গত ফাল্গুনের ৯ই তারিখে মধুর দেহত্যাগ হইয়াছে।

বিধি নিষেধ বর্জ্জিত।

মধু ভাত খাইল। আমি বলিলাম—মধু জল আনিয়াছি।

মধু বলিল—আজ্ঞা না। আবার ঘটি মাজা লাগে। আমি ঐ মা'ঠেলের জলই খাই। ও জল ভাল।

আমি—ও জল অতি অপরিষ্কার। সকলে নায়, কাপড় কাচে।

মধু—আমার কাছে নিয়ম আর খাটে না। আমি নিয়ম ছাড়ায়ে গিছি। বেদে আছে কবিগণ সপ্তমর্য্যাদা অতিক্রম করেন।

মধু বুঝাইতেছে যে মরণের ভয়ে সাধনা ছাড়িতে নাই।

ছোটকাল ইস্তকই জ্বর হলি দই, পান্থাভাত, কলা, মিঠাদেব্য খুব ঠাসে খাই। কৈ তাতে মরি না ত? ইল্‌সামাছ ভাত ঠাসে খাই। আর তো খা'বের আস্‌পো না?

মধু—ঐ কুত্যাটার ভাত্‌টাত্ দেন ত?

আমি—না।

মধু—ক্যা? উয়ের চাড্ডা ভাত দেবেন; ও ভাত খায়। যেমন আপনার জন্যি এতডি ভাত হইছে, তেমন উয়ের জন্যিও এতডি ভাত হইছে। তা দেন না ক্যা? বিলাই কুত্যার ভাত দেওয়াই লাগে। (ভূতযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ নিত্যকর্ম্ম, গৃহীকে করিতেই হয়)।

ঈশ্বরলাভ আগে, সংসার করা পরে।

মানুষ যা কর্‌বি আগে, তাই করে পাছে। ভগেই ভ্রান্ত ক'রে দেয়। ভাল মন্তরডা উচ্চারণ কর'বেরই দেয় না। যত মন্দকথা তাই মুখদিয়ে বা'র করায়। মন্তরদিয়ে আর একদেশে নিয়ে যায়। বস্‌বেরই দেয় না; পথ ভূলেয়ে দেয়। আমি যদি মোল্লার বেটাগেরে বাড়ী যাই, তয় আর বাজারে আসবার পথ চিনবার পারি না। ঐ খানেই বসি। ভগে আমার ঠেহাবারও পারে না। আমি যদি গাঁজা কিনবের জন্যি নাজিরগঞ্জ যাই, তা ঠেহাবার পারে না। সোদ গোঁদই দেয় না। সেই ঠেলে নিয়ে বেড়ায়। আমার সাথেই ভগে পাল্লো না!

মধু—বাবু, কে বেশী পাপ করে, কন্‌তো? মেয়ে মানষি, না পুরুষ মানষি।

আমি—তাত ঠিক বলতে পারি না।

মধু—পুরুষমানুষই বেশী পাপকরে। মেয়েরা বেশী পাপ করিতে পারে না।

গৃহ অন্ধকূপ।

আমি বলিলাম—মধু তুমি বাড়ী যাওনা?

মধু—আজ্ঞা না। আমি পচা কাঁটার মধ্যে ঘর করিনা।

অর্থাৎ সংসারে বহু দুঃখ পদে পদে কাঁটা ফুটে। সেও আবার পচা কাঁটা অর্থাৎ বিধিঁলে একেবারে সেটা বাহির হয় না; ভাঙ্গিয়া থাকে এবং নিরন্তর দুঃখ দেয়। এবং পচা ঘা যেমন ঘৃণার স্থান, দুর্গন্ধময়, সংসার ও তাই; গৃহ অন্ধকূপ।

পুরুষকারের প্রশ্নে।

(ভাত খাইতে খাইতে হাসিয়া) বাবু, ভাত ত কেউ খাওয়াইয়া দেয় না। (অর্থাৎ নিজেই যত্ন করিয়া হাতদিয়া খাইতে হয়।

ভক্তিতে সেবা।

আর বউ সেন খাওয়ানের কর্ত্তা। সে সেন দিবি। আমি শুনিয়া হাসিলাম। এই সময় একজন লোক যাইতেছিল। সে বলিল—মধু কি ?

মধু—আমি বল্লাম বউ খাওয়ানের কত্তা। তা শুনেই বাবু হাস্‌লেন। (অর্থাৎ যে খুব ভালবাসে সেই খুব ভালক'রে খাওয়ায়)।

তার পর বলিল (আহার) ভাল ক'রে নিবেদন করা লাগে। মধু এখনও খাওয়ার আগে কি মনে মনে বলে, তারপর খায়। রামপ্রসাদ বলেছেন "আহার কর মনেকর, আহুতি দেই শ্যামামাকে।"

বাবু, একজন্মে আপনার আড়াই পোয়ার বেশী হবে না। বাবু এ সব (সংসার) মিছা; আমিত টুণ্ডা (হস্তপদহীন)। আমার মাও যেমন আমিও তেমন (অর্থাৎ ঈশ্বরও যেমন নিষ্ক্রিয়, আমিও তেমন নিষ্ক্রিয়) আমার কথা ছা'ড়ে গেছে। এখন হাত পাওদেই কথাকই।

চৈত্র মাস। জ্যোৎস্না রাত্রি। মধু নিচুতলায় বসিয়াছিল; বলিল—আহা, আপনাদের যে শোভার বাড়ী। বড়পূজা কর্‌বেন। আর খাওয়াবেন। আমি বলিলাম—টাকা কোথা পাই ?

মধু—চা'য়ে নিবেন।

আমি—টাকার চেয়ে ভাল কি কিছু নাই ?

মধু—ঐ ত আপনারা বুঝেন না।

ইহার অর্থ হয়ত এই যে, সকাম হইতে নিষ্কামে যাইতে হয়। একেবারে নিষ্কামপ্রহ্লাদ সকলে হইতে পারে না।

আমি মনে করিয়াছিলাম মধু ভাতের জন্য অবশ্য আসিবে। বাড়ী বসিয়াই তাহার সহিত দেখা হইবে। কিন্তু মধু আসিল না। এদিকে ছুটি ফুরায়। বড়দিনের ছুটি ১০ দিন মাত্র। আমি হাটখোলায় গেলাম। দেখি মধু বাঁশতলায় বসিয়া একটি ছোট গর্ত্তের দুদিকে পা দিয়া আগুণ পোয়াইতেছে। মধু আমাকে দেখিয়া বলিল, বাবু এইখানে একখানা ছোট ঘর তুলে দিতে পারেন? আমি দেখিলাম, ও সব পাগলামী। কোন উত্তর দিলাম না। কোন অশান্তির জন্য আমার বাসাটি বিক্রয় করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। আমি মনে মনে ভাবিতেছি, মধু কি বলে। মধু বলিল—চুপ ক'রে থাকৃতে পাল্লে ঘর যেখানে উঠিছে, ঐ খানেই থাক্‌বে। আবার বলিল—আমার মত থাক (অর্থাৎ আলৃগা অনাসক্ত হয়ে থাক)। আমি বলিলাম—মধু গাঁজা খাবে না? মধু বলিল, খাব।

আমি—তবে চল নাজিরগঞ্জের বাজারে যাই।

মধু—না এখন না, যাব একটু পরে।

আমি—গাঁজার পয়সা নিবে?

মধু—তয় দেন।

আমি একটা ডবল পয়সা দিলাম। আবারও দিতে গেলাম কিন্তু সে আর নিল না।

আমি—মধু, গাঁজা কি মিঠা লাগে?

মধু—এমন মিঠা গাঁজা খা'লে না বাবু?

আমি—মধু, গাঁজা কি মিঠা?

মধু—বড় মিঠা। খুব আটে টান দিয়ে খায়ো, তয় গাঁজা মিঠে

লাগ্‌বি। আস্তে আস্তে টান দিলিই তিতা লাগে। গাঁজা আগে আমারই কি মিঠা লাগিছিল? (অর্থাৎ তীব্র সাধনকর, ঈশ্বরের জন্য পাগল হও, তবে আনন্দ পাবে)।

মধু—সে মন্‌তোর এখন কব না। তা এখন দেলাম না। আমি আরো কিছু উপদেশের জন্য দাঁড়াইয়া রহিলাম। মধু বলিল—বেশী কথা ক'লে গোল হয়ে যায়। (অর্থাৎ তোমার মনে থাকবে না)।

পরদিন সকালে বাড়ী হইতে রওয়ানা হইলাম। হাটের উপর আসিয়া দেখি মধু ঘুমাইতেছে। একজন লোক মধুকে ডাকিল। মধু মাথা তুলিল। আমি বলিলাম—মধু গাঁজার পয়সা নিবে?

মধু—না।

আমি—রাঙ্গা ফল (কমলা) নিবে?

মধু—আচ্ছা দেন।

আমি ২টা কমলালেবু দিয়া বলিলাম—মধু এখন আসি।

মধু—আচ্ছা যান।

বি, এ, পরীক্ষার সময় আমার কায ছিল না। আমি বাড়ী গেলাম। মধু দুইপ্রহরে আসিল; শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিল। আমি মধুকে কোন প্রশ্ন করিতাম না। আমার জিজ্ঞাস্য মনে মনে থাকিত। **ইন্দ্রিয় সংযমই প্রথম সাধন।** নরকদ্বার অতিক্রম করিতে না পারিলে আত্মশ্রেয় লাভের কোন উপায় নাই। অথচ উহা অতীব দুঃসাধ্য।

আমি সর্ব্বদা আলোচনা করিতাম—কামের একটী নাম সংকল্পযোনিঃ, সংকল্পের অভাবে কাম জয় হয়। সংকল্প ত্যাগে ক্রোধ জিত হয়। এইটী আমার প্রয়োজন এইটী নয়, এইরূপ বিচারে লোভ জিত হয় এবং আত্মা অব্যয় চিন্তা দূকরিলে ভয় র হয়।

অসঙ্কল্পাৎ জয়েৎ কামং, ক্রোধং সংকল্পবর্জ্জনাৎ

অর্থানর্থেক্ষয়া লোভং, ভয়ং তত্ত্বাবমর্শনাৎ ॥

এসব শ্লোক আমি জানিতাম, আলোচনাও করিতাম। গীতাও পড়ি।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা

জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্।

স্বামীর মনোহর কথাগুলিও স্মরণ করিতাম ও সর্ব্বদা মনে মনে আলোচনা করিতাম—

বুদ্ধেরেব বিষয়ে ইন্দ্রিয়াদিজন্যাঃ কামাদি বিক্রিয়াঃ

আত্মাতু নির্ব্বিকারঃ তৎসাক্ষী।

ইন্দ্রিয় হইতে উৎপন্ন কামাদি বিকার বুদ্ধির। আত্মা নির্ব্বিকার, বুদ্ধির সাক্ষী মাত্র।

যোগদর্শণের ভোজবৃত্তিতে পড়িয়াছিলাম—"মমৈতে বশ্যাঃ নাহমেতেষাং"। এরাই আমার বশ্য, আমি এদের বশ্য নই। কিন্তু কৈ কিছুতেই কিছু হয় না। বিচার, পুরুষকার বা চক্ষের জল কোন উপায়েই হয় না। আমি মধুকে মানস প্রশ্ন করিলাম—তুমি ইহার কোন উপায় করিতে পার?

মধু—তোমার শরীর তুমি যদি ঠেকাইতে না পার, তো আমি কি করবো। আমি কি ঠ্যাঙ্গা মারবো? **ইন্দ্রিয়নিগ্রহে পুরুষকারই একমাত্র অবলম্বন।** (এবং নিজেই ঠেঙ্গা মারিতে হইবে)।

পরদিন মধু আসিল। একটি কথা বলিল—বাবু, এসব মিছা। আমি হাত বানা'নে কথা বলি না। সত্যিই বলি। (অর্থাৎ জগৎ অনিত্য অতএব মিথ্যা। আমি নিজে কিছুই বলি না। যা ভগবান্ বলান, তাই বলি। এ সংসার অনিত্য ও অসুখকর। যদি নিত্যবস্তু

নিত্যসুখ চাও, তবে ভগবানকে ডাক। তার পরদিন সৃষ্টির বিষয় বলিল।

মেয়েমানুষ ও সাধু।

আমাদের বাহির বাড়ীর দক্ষিণে এক অনাথা বিধবা একখানা ঘর তুলিয়াছিল। সে দিনে এখানে ওখানে কায করিত। রাত্রিতে ঐ ঘরে থাকিত। সে এখন চলিয়া গিয়াছে। কেশব বলিল—মধু, হাটের ঘর খোলা, বেড়া নাই ; এই ঘরে থাক না কেন?

মধু—আজ্ঞা আচ্ছা।

মধু—বাবু এ ঘরখান কার?

কেশব—কারও না। একজন মেয়েমানুষ উহাতে ছিল।

মধু—মেয়েমানুষ, ওরে বাপুরে! ওঘরে আমি যাব না, বড় ভয় করে। শেষে মরে টরে যাব। মহাপেরমাদ (প্রমাদ) হবি। একবার বাজারে এক পাগ্‌লী এল। সকলে তাকে বলিল তুই মধুর সাথে নিকা বয়। মধু এক দৌড়ে হাজারীদের বাড়ীর মধ্যে উপস্থিত। বলিল—কত্তা মলাম, প্রাণও বাঁচান, রক্ষা করেন। ইজ্জাতুল্লা পাগলীকে তাড়াইয়া দিল। মধু সাতদিনের মধ্যে বাজার মুখ হইল না। বিকাল বেলা অনেক লোক গাছ তলায় বসিয়া ; মধু আসিয়া অনেকক্ষণ পাগলামী করিল—তারপর বসিল।

কেবল আকাঙ্ক্ষায় হয় না, শক্তি চাই আর গুরু চাই।

একদিন বিকালে অনেক লোক আমাদের বাড়ীর সামনে বসিয়া গল্প করিতেছে। মধু বলিল—বাবু মেহানৎ করে সকলেই। যার শক্তি বেশী, তার কায সহজে হয়। আর যে পাছা ঘসে, সে আর

মেহানতে কম্ করে না। হাতে না পালেই কাঠী দিয়াও পীঠ খাজেন (চুলকান) লাগে। মধুর কথায় আমি আশ্চর্য্য হইলাম। পীঠ যদি চুলকায় আর হাত যদি সেই স্থান না পায়, তবে একখানা কাঠি খুঁজিয়াও সে স্থান চুলকায়। তীব্র আকাঙ্ক্ষা যদি হয় আর নিজের চেষ্টায় যদি না পারে, তবে নগণ্য বস্তুর সাহায্যও লোকে নেয়। তখন গুরু চাই।

আমি বলিলাম—মধু তুমি কি আগে ভিক্ষা করিতে?

মধু—হেঁ।

আমি—এখন আর কর না যে? কারো বাড়ী চাউল দিলে রাঁধিয়াও দিতে পারে।

মধু—তা কি কারো পাগে (পাকে) দেওয়া যায়? সব অশুদ্ধ্। ছোট কালের অভ্যাস ত ছাড়্বার পাল্লাম না।

কথাটা খুব সত্য। বাল্যকালে অনাচার একবার অভ্যাস হলে, আর তা কখন যায় না; এ আমি খুব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। ছোটকালের অভ্যাস ছাড়ান যায় না। কোন অভ্যাসই না।

আমি বলিলাম—মধু, তুমি আর কথাটথা কওনা?

মধু—আপনি কি আবারো বাড়ীর্থে (হইতে) যাবেন?

আমি—হাঁ যাব।

মধু—তয় আসেন্গে শীগ্গীর করে। আম খাওয়ার সময় বাড়ী আস্লি, তয় কথাটথা কব।

আমি দেখিলাম অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ; মধু অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মনে করিলাম ওদের স্বজাতীয় কেতুর বাড়ী কিছু টাকা দিয়া যাইব; সে মধুকে খাইতে দিবে। কেতু আমাদের প্রজা এবং তার একটু ধর্ম্মভয়ও আছে।

মধু বলিল—কেতুগেরে বাড়ী যাব না। এই গাছতলায়ই বসে খাব। এহানেই গাঁজা টাজা খাব। আর মোল্লোগেরে (যদু নামক একজন গৃহস্থ) বাড়ী যাওয়ার আবশ্যক কি? তয় তাই করেন। যে কয়দিন বাঁচি, তাই খাই। যাওয়ার সময় আমার যা আছে সব আপ্‌নারি দিয়ে যাব।

প্যাটের জন্যিই ঘুরে বেড়াই। গাঁজা আ'টেই খাবের পারি না। দুই আনা গাঁজা হলি সেন হয়! এক পয়সার বেশী পাই না। তাও চা'য়ে আনি। আশুকত্তা (গাঁজাবিক্রেতা) ক'লো, আশীর্ব্বাদদিয়ে যাও। তা আমার সমান সমান। আমি কই—ভাতটা মাতটা দেন, ভাতটা মাতটা খান। সুখটা বিলাসনটা করেন। তা হলি সমান সমানই হলো।

মধুর কথার অর্থ এই। দান করিলেই পাওয়া যায়। না করিলে পাওয়া যায় না। তাই সমান সমান।

আমি বলিলাম—মধু গাঁজা খাওয়ার উপায় আমার তো শিখালে না?

মধু—এককাম করেন; তফাতে ঐ জিকা গাছের কাছে এক ঘর করে নেন। তার ঐদিক (পশ্চিমে) একখান বারান্দা দিয়ে নিবেন। সেখানে মজার সুখি গাঁজা টাঁজা খাবেন, শোবেন। সুখটা বিলাসনটা করবেন। সকল সময় বাড়ীর মধ্যে থাকা কি ভাল? আমি ঐ আমগাছ তলায় বেশী ক'রে গাঁজা খাব। খুব ক'রে কাটুব, বেশী ডলুব না। খুব ধূ'মে বারাবি, তাই যেন খান। অর্থাৎ মধুর সঙ্গ করিলেই অনুরাগ হবে। মধু বলিত—ভগে আমার খা'বের যাগা দিছে, হাগার যাগা দেয় নাই। আমি ত আর বিয়ে করুব না। এহানেই থাকুব।

বৈষ্ণবী ও ভিক্ষা।

আমি—মধু, বষ্ণবীদের ভিক্ষা কি দিতে হয়?

মধু—হেঁ দেওয়া লাগে; উয়েগেরে ব্যব্‌সাই তাই।

আমি—যে ভিক্ষা কর্‌তে আসবে, তাকেই দিতে হবে?

মধু—হেঁ তাই।

অদৃষ্ট, না পুরুষকার।

আমি—মধু, কপাল ব'লে বসে থাকাই ঠিক, না মেহানৎ কর্‌লে বেশী ফল?

মধু—মেহানৎ করাই চাই।

দানশক্তি হীনতা, না দুর্ভিক্ষ।

মধু—আচ্ছাবাবু আজ, এই কামারহাটের গাঁয় কত মহোচ্ছব হতো। এখন হয় না কেন?

আমি—লোকের খরচ বাড়িয়াছে। আর বুঝি পারে না।

মধু—তা না; মানষির দয়ার ভাব ক'মে গিছে। দানশক্তি আর নাই। (নাদিতে নাদিতে শক্তি যায়)।

জীবে দয়া।

মধু—ঐ কুত্তেটার চাড্ডে ভাত দিবেন। ও ভাত খায়। গিরস্তের বিলাই কুত্তার ভাত দেওয়াই লাগে। বাবু, খুব ঘোম পাল্লাম। আমি কোহানে ছেলাম, তাই টের পাই নাই।

বড় ক্ষিদে লাগ্‌ছে। দেন চাড্ডে ভাতমাত?

মধু প্রায়ই "সহজাবস্থায়" থাকিত। উত্তমা সহজাবস্থা। কখন একদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিত। মধুর নিদ্রাই ধ্যান। বনে জঙ্গলে রৌদ্রে মৃতবৎ পড়ে থাকে। কখন ৭।৮ ঘণ্টা একভাবে থাকে। আমি একদিন বলিলাম—মধু, তুমি যে একটা মন্তর দিতে চাইছিলে, তা ত দিলে না। মধু—কি তা? আমি ভূলে গিছি, কন। আমি ভারি লাঠেল হই। আমি যা একবার কইছি তা কর্‌বেনই। আমি খড়োর পর্য্যাত্ হই, ফালার পর্য্যাত্ হই। আমি কি দাও কাচীর পর্য্যাত, না আঁচি ঘরের মেয়ে! নাকের মধ্যে যে কথা কয়—কয় "আঁমি তোঁ পাঁল্লাম নাঁ"; তহন তার মায়ের কাছে যাই। সেও নাহে নাহে কথা কয়। কয় "ওঁ খাবেঁর পাঁরে না"; তহন আমি তামুক টামুক খাওয়ায়ে বাঁচায়ে রাহি। ভাত টাত দেই। অর্থাৎ হীনশক্তি সাধককে নিজশক্তি দ্বারা শক্তি সমন্বিত করি।

মধু—এ কুত্ত্যাটার ভাতটাত দেন তো?

আমি—না।

মধু—ক্যা? যেমন আপনার জন্যি এতডি ভাত হইছে, তেমন উয়ের জন্যি এতডি ভাত হইছে। তা দেন্ না ক্যা? বিলেই কুত্ত্যার ভাত দেওয়াই লাগে।

বাবু, হাগাডা নি সারা'য়ে দিবের পারেন, আর ক্ষিদেডা? আপনি মুড়িটুড়ি খাইছেন? চাড্ডে চিড়ে? কিছুই খান নাই?

আমি—ওসব খাওয়া সয় না।

মধু—পান্থাভাত (হরিনাম) খাবেন। তা খুব ঠাণ্ডা। আমি দিনি ৫।৬ বার খাই। খায়েই সু'মের পাই না। জরের থ্যা উঠ্ছি। ছুরেন্ত ক্ষিদে লাগে। (বিষয় জ্বর ছুটিলে বড় ক্ষুদা)।

আমি—সহরে গেলে ছদ্‌টুদ্ দিয়ে অনেকটা করে খাও আনে।

মধু—গেঁ-গাঁয়ে চাটে চুটে খালিই প্রাণডা বাঁচবের পারে। আর একবার বাড়ী গেলাম। মধুর সহিত দেখা হইল। মধু বলিল—বাবু, কেবল কথা কলি কোন্ কামে আসে? একটুও মিথ্যা কথা কইনা। **একটু পরিশ্রম কর্‌বের পার্‌লি ভয়ডা দুক্কুডা কম হতো।** অর্থাৎ কিছু সাধন করিলে মৃত্যু ভয় ও যম যন্ত্রণা কম হতো।

বাবু, আমি গানের চোটে মানুষির কানে তালি লাগায়ে ফেলি। শুয়ের, হাতি, মোষ সব মা'রে ফেলাই। ভগেমালী আমার দেহডা মারে ফেলাইছে। আমি জবর লাঠেল হই। মেয়েমানুষ, পুরুষমানুষ বানায়ে ফেলাই। অর্থাৎ অবিদ্যা দূর করিয়া দি। অধম সাধককে উত্তম সাধক করি। আমি বিদেহ, জীবন্মুক্ত, কৌল।

মন্ত্রগ্রহণ। ১৩১২। ১ লা আষাঢ়।

মধু দুই প্রহরের সময় আসিল। সেই ডোবায় স্নান করিল। কাপড় ছাড়িয়া, গর্ত্তের ধারেই একটা আমের গাছ আছে, তাহার তলায় বসিল। আমি সেখানে গিয়া ভাটী গাছের মধ্যে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—মধু, নাওয়া হলো?

মধু—আজ্ঞা হেঁ। শরীরে বড় জ্বালা। একবার গাংএও নাইছি। আবার এখানেও নাবের আলাম।

আমি—মধু চারিটা ভাত খাবে?

মধু—আজ্ঞা না। তয় দেন চাড্ডে অল্প করে।

মনে করিছিলাম একবার বাড়ী যাব। তা আর যাব না, যে রোদ্দুর।

আমি—মধু, বাড়ী গেলে ভাত টাত দেয় ত?

মধু—না—আ। বিনেই ভার ভাতটাও দেয় না। এক বউ (ছোট ভায়ের বউ)। ভাত মাতের জন্যি বড় যাই না। একটা ধর্ম্মের জন্যি যাই (জন্মস্থান দর্শন?)

মধু—আপনার ছান (স্নান) হইছে?

আমি—হাঁ।

মধু—খুব ভাত্‌টাত্ খাবেন। সারাদিনই খাবেন।

আমি—একবার খালে সারাদিনে হজম হয় না, তয় আর খাব কি?

মধু—নীচু ফলূড়া (হরিনাম) ভাল। মুখি খুব মিঠে লাগে। বেল খাওয়াও যায়, প্যাটও ভরে না। তাই যেন সারাদিন খান। ভাল ভাল পীঠে মিঠে তয়েরি করে তাই যেন খান। প্যাটও ভর্‌বি না, আর খুব মিঠ্যাও লাগ্‌বি। ঘর প্াতা দৈ, তাই যেন বানায়ে

টানায়ে খান। আমরা না—আলিস্যির মানুষ হই, পিঠে মিঠে সবই নিজি বানাই আর খাই। আলিস্যু কল্লি কি খাওয়া হয়? আর প্যাটও না ভরে, খাওয়াও যায়, তাই যেন করেন।

অর্থাৎ সর্ব্বদা মুখে যেন হরিনাম লেগে থাকে। তা হলে তাই অমৃততুল্য হইবে এবং বিষয়রস দূর হইবে। নিজে বানায়ে খাওয়া—জপ করা।

রাজা রামকৃষ্ণ বলেছিলেন—

রামকৃষ্ণ কয় তেমতি জনে,
লোকের নিন্দা শুন্‌বে কেনে।
আঁখি ঢুলু ঢুলু রজনী দিনে,
কালী নামামৃত পীযূষ পানে।

রামপ্রসাদ বলেছেন—

বদরী কোমল, পূর্ণ সুধারস ভরা।
সুবোধ; কুবোধগম্য নহে ত্বরা॥
রসবেত্তা যে জন, কি তার তৃষ্ণা ক্ষুধা?
প্রতি বর্ণে বর্ণে কর্ণে প্রবিশতি সুধা॥
পাঠ ক'রে পুরাণ পণ্ডিত প্রেমে ভাসে।
গবাগণ গুপ্তে গো ভঙ্গিমা ক'রে হাসে॥

কুল মিষ্টরসে ভরা, ইহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু কুবুদ্ধি ব্যক্তি দুর্ম্মতি তাহা শীঘ্র বুঝিতে পারে না। মধুর নীচুফলও এই বদরী।

আমি বলিলাম—তুমি ত সে কৌশল বল্লে না।

মধু—"দিলিও হয়। দিয়ে বিশেষ ফল ত দেখি না।" আমি আম গাছতলায় ভাঁটিগাছের মধ্যে বসিয়া ছিলাম।

মধু বলিল—এদিকে আসেন, এই ভাল জায়গায় বসেন।

আমি বলিলাম—থাক্, এই খানেই থাকি।

মধু—ভাল জায়গায় বসা লাগে। ভাল জায়গায় বস্‌লি সেন সুখ মুখ হবি। আমি একটু হাসিলাম, মধুও একটু হাসিল। (সাধনের আগে ভাল স্থান ও আসন চাই, নৈলে কাজ হয় না)। মধু আম, দুধও অল্প দুইটা ভাত আনিতে বলিয়া পাতা আনিতে গেল। আমি ভাতের কথা কেশবকে বলিয়া আবার মধুর কাছে আসিয়া বসিলাম।

আমি বলিলাম—মধু মানুষধর্ম্মটা কি?

মধু—মানুষধর্ম্মটা মোটেই একটা চাল (চাউল)। বড় কষ্টে মানুষ জন্মটা পাওয়া গেছে। আলিস্যি কর্‌লি কি ভাতমাত খাওয়া (সাধন) হয়! আমি যখন করাতের কাম কর্‌তাম, একলাই করাত্ টান্‌তাম। রাত্রে গাছ কা'টে খড়ি কর্‌তাম। বাসন মাজ্‌তাম, জল আন্‌তাম। ওরা (সঙ্গীরা) ত ঐ রকমই। পানএক বাজার, একখান দই কিনে নিয়ে ফলার করবিনি, রাঁধার আলিস্যিতি। মানুষ ধর্ম্মটা মোটেই একটা চাল। পর ত কেউ না, তউ পর কথায় বলা লাগে (ব্যবহারিক ভাবে)। নিজি যা খাই, তাই সকলের খাওয়াই।

আমরা সব পথিক, সংসার বিদেশ, এখানে কাঠ কাটিতে হয় সকলকেই। যাহারা অনলস তাহারা কাঠ কাটিয়া রাঁধে, ভাত খায়; বলবান্ হয়। আর যারা দুর্ব্বল তারা অনায়াসলভ্য দই চিড়া খায়। বিষয় সুখ—দই চিড়া। অতি সহজেই পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা আপাততঃ মিষ্ট ও ক্ষুন্নিবৃত্তিকর হইলেও, পরিণামে অনিষ্টকর, পীড়াজনক ও দুর্ব্বলতা বর্দ্ধক। আমি রাঁধি, খাই; পরকেও খাওয়াই। রাঁধিতে

ক্লেশ আছে; কিন্তু শেষে গ্রাসে গ্রাসে সুখ, তৃপ্তি ও বল। আবার একজন রাঁধিলে অনেক ব্যক্তিকে খাওয়ায়।

আর অন্ন দান করবেন। দিলেই পাওয়া যায়। এও বেদের কথা। "কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী।" যে নিজেই খায় সে কেবল পাপী। গীতায় আছে—মোঘং পার্থ স জীবতি। হে পার্থ, ইন্দ্রিয়ারাম সেই পাপায়ু বৃথা জীবন ধারণ করে। ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা পচন্ত্যাত্মকারণাৎ। যে নিজের জন্য পেটমাপা রাঁধে সে পাপই খায়। মধুও ঠিক ঐ কথা বলিত।

আমি সেইদিন হইতে জপ আরম্ভ করিলাম। দিবারাত্রি জপ করি। পূর্ব্বদ্বারি ঘরে একা থাকি। কিন্তু সারারাত্রি জাগিতে পারি না। ঘুম পায়। দিনেও সর্ব্বদা ঘরে থাকি না। বাহিরে বসি; সকলের নিকট কথাটা প্রকাশ হয়, এও ইচ্ছা করি না। তাই দিবারাত্রি ঘরে থাকা হয় না। এক এক রাত্রি যায়, আর মধু ভোরে এসে আমার দিকে তাকায় আর বলে "ভগে বলে জাগে থাকপের, আপনি থাকেন শুয়ে।"

মধু—জুতা মা'রে রক্ষা করা লাগে। কিছু কিছু মারা লাগে। জুতার মারটা বেশী মার না। কথাটাও কওয়া যায়। (মনকে তাই যেন করেন)।

বাবু, কামের ধর্ম্ম বড় কঠিন। কথাটা মথাটাই কই। ছোটকাল ইস্তক না হলি আর ধর্ম্মডা হয় না। একটু পরিশ্রম করবের পাল্লি ভয়ডা দুক্কুড়া কম হতো। কেবল কথা কলি কোন্ কামে আসে? মানুষ খাবি দাবি দিব্যি সুখি থাকপি; পাগল (ঈশ্বরের জন্য) হবের যাবি কি জন্যি?

মধু—ধ্যান করা পুরুষ মানুষের কাম। সকলে পারে না। নাম

করাই ভাল। আজ কলাম সকল কথা। আমি দড়ির মালা করিছিলাম, জপ কর্ব্যার জন্যি। তা শেষে পোড়ায়ে ফেল্লাম। নাম কল্লিই সকল সময় তাঁতে মন রাখা যায়।

আমি—মন যে উদিকে যায় না।

মধু—রাবণ রামকে বলিছিল, যা ভাল তাই আগে করা লাগে, আলিস্যি ফেলে। আর যা মন্দ তা বিবেচনা করে করা লাগে। রাম আর রাবণ আমাগেরে মনের মধ্যিই আছে। আমিই রাম। বাবু, কালা মধু ত পাগল। যা মুখে আসে তাই কয়। এখন আর একটুও আমি নাই, সবখানি ভগেমালী।

অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি না হইলে ধ্যানাধিকার হয় না। এজন্য যতদিন চিত্তশুদ্ধি না হয় ততদিন নাম। "মামনুস্মর যুধ্যচ।" ঈশ্বরের চরণ ধ'রেও থাক, সংসারের কাজও কর। মুখে নাম করিতে কিছুতেই আটকায় না। কবীর জোলা ছিলেন। কাপড় বুন্‌তেন আর রাম রাম কর্‌তেন। নানক বলেছেন—"প্রভুকা সুমিরণ মনকা মলু যাই, অংমৃত হৃদয়ে সমাই।" প্রভুর স্মরণে মনের ময়লা দূর হয় আর হৃদয়ে অমৃত প্রবেশ করে। এখন আর একটুও আমি নাই, সবখানি ভগেমালী। কালা মধু ত পাগল; যা মুখে আসে তাই কয়। একজন চাষার মুখে একথা শুনে কে না আশ্চর্য্য হয়? যে বেদগুহ্য জ্ঞান দেব-দুর্ল্লভ, তা মধুর মুখ হইতে বাহির হইল। আর বলিবার রকমইবা কি সুন্দর! কাল মধু ত পাগল। অর্থাৎ কালমধু—নাম রূপ। চিদংশ পূর্ণ ব্রহ্ম। রামকৃষ্ণ পরমহংস বলেছিলেন শরীরটা থাকিবার খোল।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তোমার কালী কেমন?

প্রসাদ বলেছিলেন—কে জানে গো কালী কেমন।
আত্মারামের আত্মাকালী প্রমাণ প্রণবের মতন।
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥

যিনি আত্মারাম, আত্মরতি, আত্মমিথুন, তাঁর চিদংশই ব্রহ্ম। দেহটা জড়। "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।" যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মই হন। নিরুপাধিক চৈতন্য ত দেখান বা দেখা যায় না। তবে যাঁরা অশরীর, বিদেহ, মুক্ত, স্থিতপ্রজ্ঞ তাঁদের মধ্যেই সেই অসঙ্গ আত্মাকে দেখা যায়। মধুর "আমি" মরে গেছে। হায়, এমন লোক এই হিন্দুর দেশে একটা ভাতের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াত।

মধু আর একদিন আসিল; বলিল—বাবু আহারডা একেক জনের কাছে একেক্ডা ভাল লাগে। পান্তাভাতটা (হরিনাম) যেন খান। আমি উয়ে খুব খাই।

আমি বলিলাম—মিঠ্যা লাগে না যে?

মধু—তয় ঠাসে যেন দিন কতক খান। যদি না পারেন, তয় যেন ছাড়ান দেন। (নীচুস্বরে বলিল)। সোঁদ গোঁদই (বুদ্ধি শুদ্ধি) হলো না। কেবল হাঁকি চুঁকিই (আকাঙ্ক্ষা); মিঠ্যা যদি না লাগ্‌লো? এখন করেন, কোমর বাঁধে। আমরা এককালে খুব করিছি। এখন নাঙ্গা (নগ্ন) হইছি।

মধু—আমি কলাম মা, তুলসীর গাছতলায় পিদ্দুপ (প্রদীপ) নি দিছিলে? কলো না। তয় আর করবো কি? (উপদেশ অনুসারে কাজ না করিলে কি হবে?)

মধু—তয় ভাতমাতই যেন দেন, তাই আসে খাব। (একটু রাগ রাগ ভাবে) এক্কু কথাই কলাম; বেশী কথার আবশ্যক না। পরদিন আবার আসিল। মধুর দয়া দেখে আমার চোখের জল পড়িতে লাগিল।

মধু দেখিয়া বলিল—মেয়েমানুষ হও, ভাল, বাসার মানুষ হও। নাম বলেই খাওয়া আসে। (নামে রুচি হয়)।

"আমি রাত্তিরি শুতেমই না।" আমি মনে মনে বলিলাম—আমি যদি বাড়ী বসে থাকি, এরা কি মনে করিবে।

মধু বলিল—ছুট্টু বেত দিয়ে যেন মারেন। বাড়ি যেন দেন না। দিনি দিনি জ্ঞান বুদ্ধি হলি, ওরা আপনি বুঝ্‌বি; আর কিছু বুল্‌বি না। আপনি যেন চুপ্ করে বসে থাকেন।

পরদিন মধু এল। ভাত খাইতেছে বলিল—নিবেদন কর্‌লি ভাত আর খাওয়া হয় না। ভয় করি, এই মিছ্যা রকম নিবেদন। নিবেদন করাই লাগে।

ভক্ষ্য বস্তু নিবেদন করা, প্রকৃতভাবে ভক্তির সহিত নিবেদন করা, সমাজ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। এখন "পেলাম থালে দিলাম গালে, পাপ নাই কো কোন কালে।" এটা ধর্ম্মজীবনের প্রতিকুল। আহার পূজার ভাবে করিতে হয়, এটাই মধু বিশেষ ভাবে শিখাইত। এখন দিনের অগ্রভোজন দ্বারা বৈশ্বানরে আহুতি। গতরাত্রে ঈশ্বরের নিকট বলি—কি করিব, পরিবারদের রাখিয়া যাইব, না লইয়া যাইব। তাই মধু বলিল—আপনি যার কাছে (ঈশ্বরকে) সকল জিজ্ঞাসা করেন। বউর (মধু) কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করেন না। বাবু এ মুল্লুকটা আমার ভাগে।

যেমন সংসারের বন্দোবস্তের জন্য রাজা, রাজধর্ম্ম ইত্যাদি আছে তেমন ধর্ম্মজীবনের আকাঙ্ক্ষা পূরণের বন্দোবস্তও আছে। নিত্য-সিদ্ধেরা স্থানে স্থানে আছেন। অনুরাগী দেখিলে তাঁহারা তাহার বোঝা মাথায় করিয়া লইয়া বাড়ী পৌঁছিয়া দেন।

বাবু, কাপড়ও নাই, জাগাও নাই; এজন্মের মত গিছে। কিসি করে কোহানে (কোথায়) ভাত খাব?

এবার বাড়ী এলেই মধু বলেছিল—আর বেশী দিন টিকলেন না।

পরদিন আসিয়া বলিল—একজন মেয়ে মানুষের জ্ঞান বুদ্ধিও রাখেন না। একেবারেই অল্প মানুষ হন। দিন দুই মধু এল না। আমার রাত্রিতে জপ রীতিমত হয় না। এক একদিন ঘুমাইয়া পড়ি। পরদিন এসে বলিল—শরীরে দুক্কু কষ্ট দিলি তয় সুখ হয়। ভাল সুখ হয়। দুক্কু টুকু শেষে থাকে না। সুখই হয়। হাসিয়া বলিল—আপনি থাকবেন শুয়ে। একি শোয়ার কাম; এলাঠেলার কাম! তয় আচ্ছা যদি না পারেন, তয় যা পারেন তাই যেন করেন। আমি যখন কইছি তখন করবোই। আর ত ভবের বাড়ী আসবো না।

আমি দ্রুত জপ করিতেছিলাম দেখিয়া বলিল—পীরিত করা (ভক্তি) বড় কঠিন কাম। বড় বড় করে কথা ক'লে কি পীরিত হয়? (আমার মুখের দিকে তাকাইয়া) ছুটু ছুটু করে কথা কওয়া লাগে (জপ আস্তে আস্তে করিতে হয়; অত তাড়াতাড়ি নয়)। আজ বেশ খালাম। খুব খাওয়াইছেন (খালো কিন্তু আম আর পান্তাভাত)। খুবভাল ভাবের সাথে খাওয়াইছেন। আম পাবেন—এ আম না খুব সুখীর আম (ব্রহ্মানন্দ)। আজ আম এত মিঠ্যা লাগলো যে ভগেরও দেলাম না, মধুও খালো না। কি সুন্দর কথা! ভগে নির্গুণ। মধু নাম রূপ। সুতরাং কেউ খায় না।

মধুবলিল—৩২ বছর ছেলাম গুরু পরামানিকের বাড়ী। শেষে আলাম। কেদার আর আমি দুইজনে গাঁজা খাতাম। আমিই সাজতাম, তারে দেতাম। আবার সেও আমার এট্টু এট্টু দিত। গাঁজাডা বড়মিঠ্যা জিনিষ। এখন শুয়ে পড়ে গাঁজাই খাই (ব্রহ্মানন্দ

ভোগকরি) ; খুব সুখি থাকি। কেদারে ভাই হয়। ভাই আর হয় না। তয় বোজা সোজার জন্যি (ব্যবহারিক ভাবে) কওয়া লাগে। কেদারে ফকীর কই।

ভগে আমাগেরে দিয়ে আপনাগেরে মানুষ করে: আবার আপনার দিয়ে আর একজনের জ্ঞানবুদ্ধি দেয়। এই রকমই তার কাম। তাতো কারো বোঝার যো নাই। সে শোলার তা দিয়ে সব বানায়ে বাতাস করে, আর মোট চল্‌তে থাকে। এই যে ঘুন্নি (ঘুড়ি) যেমন আকাশে থাকে ঐ রকম। আপনার আর কওয়া লাগ্‌বি না। আর জ্ঞানবুদ্ধি দেওয়া লাগ্‌বি না। আর মারা লাগ্‌বি না। এখন হবি বিশ্বাস কি? মারলি কি বোঝে? তাতে নাই হাত, নাই পাও।

এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ালি (আসন ছেড়ে) হয় না। এক জায়-গায় ঠিক হয়ে বসা লাগে। যখন আবশ্যক হলো উঠলেন্। আবার সেই জায়গায়ই যায়ে বস্‌লেন।

রাত্রিতে ভয়ানক ভয়ানক মূর্ত্তি দেখি। শুনিতাম তন্ত্রমতের সাধনে বিভীষিকা দেখে। কিন্তু আমি হরিনাম করি; আমার এসব উৎপাৎ কেন আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন জপছেড়ে শুয়ে পড়ি। আমার নাম করা, জপ নয়। সংখ্যা নাই; গণনা নাই। বেদের "নামচিৎ বিবক্তন।" তাঁর নামই করিয়া যাও; ঠিক বেদের ব্যবস্থা।

পরদিন মধু এল। বলিল ভয় কি? মা আছেন। সাপের ও মা, বাঘের ও মা। সাপে নিজের ডিম খাইয়া ফেলে; আর বাঘ অন্য জন্তু মারিয়া তার মাংসে নিজের মেয়েকে সবল করে। সব মা সমান নয়। মা থাকিতে ভয় নাই। নাম নিলেগা খাওয়া আসে। এখন খুব মিঠ্যা আম খান, খাওয়ান্।

পরদিন আমাদের পুরোহিত কেতু চৌধুরী এলেন। মধুর সাথে

কি কথা হলো। মধু বলিল—আপনি বড় মুখ্‌খু ব্রাহ্মণ হন ; আপনি বড় অবোধ ব্রাহ্মণ হন। কালী পূজার দিন মধু তাঁকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—ঠাকুরমশায়, অহংকারং অহংকারং কতেছেন ; অহংকার ডা কি, তা নি কতে পারেন ? তা তিনি কিছু বলিতে পারিলেন না। মধু অহংকে মারিয়া ফেলিয়াছে। সে তাকে বেশ চেনে। মধু আমাকে বলিল—কুহ্‌র‍্যার (মুরগীর) মাংস দিয়ে দিয়ে ঠাসে ভাত খান। আমি নিত্য একটা খাই। না হলিই নয়।

এ সেই প্রহ্লাদের কথা—

যাপ্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বাম্‌ অনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়াৎ মাপসর্পতু॥

বিষ্ণুপুরাণ

ভক্তির সঙ্গে যেন নাম করেন।

পরদিন আসিল বলিল—চুপ করে যেন থাকেন। এট্টু এট্টু শুয়ে থাকেন যেন, আর খুব যেন চ্যাতন থাকেন। ভয় টয় নাই। কবুবই এক রকম। মেয়ের কথা যেন মনে রাখেন। (সাপেরও মেয়ে বাঘেরও মেয়ে)। এখন খুব করে ভাতটাত খান। আর বিলাই কুত্যার যেন ভাত দেন।

আমি বাড়ি দিয়ে মানুষ মারে ফেলাই। (জোর করে অবিদ্যার পারে নিয়ে যাই)। কেউ দুই তিনবার ঘুরেও আসে। আর যার গায় জোর বল বেশী, তার সাথে পারি না (অহংকারীর)। কতবার কত মানুষ মারে ফেলায়ে দিলাম—তার ঠিক্ নাই।

বাবুরা আমার উপকার করেন। আমিও বাবুগেরে উপকার করি। একজন কোরা (বেহারা) জিজ্ঞাসা করিল—তুমি উপকার কর কেমন করে ?

মধু—এই যে বাবুগেরে ভাতটা মাতটা খাই, তাইতি।

কোরা—বেশ ত কথা কলো পাগল।

মধু—এখন গোঁসাই হব। আর মাবুবের টাবুবের পারি না। আর কি এখন সে কালের জোর বল আমার আছে। যাই বাসায় (বাজারে) যাই।

পরদিন আসিলে আমি মধুকে আম আনিয়া দিলাম এবং বলিলাম—এ বাজারের আম, ভাল না। মধু বলিল—না বেশ, আপনি দেছেন।

ভগেমালীর ছুট্টু করে একটু যেন মারেন। আবার নিজের গায়েও যেন এক বাড়ী দেন।

যাঁরা ভক্তিপথে হাটেন, তাঁরাই একথা বুঝেন। রামপ্রসাদের গান এই দুই রকমই। মনকে বলা আর কালীকে বলা। বাছুর বাঁট টানে ও মাঝে মাঝে মাথা দিয়া গুতো মারে; তবে মা দুধ ছেড়ে দেয়। ভক্তি নিজের অসামর্থ্য দেখিয়া হতাশ ও ভগবানের অনন্ত গুণাবলী স্মরণ করিয়া দৃঢ় হয়।

পরদিন মধু আসিয়া পান্তাভাত খাইতেছে। একজন বেহারা পান্তা দেখে মধুর দুঃখে দুঃখ করিতেছে। মধু বলিল "মিঠা না লাগ্‌লি কেউ খায়। তোমাগেরে মনে তোমাগেরে মিট্যা লাগে। আমার মনে আমার মিট্যা লাগে।"

বিকালে মধু ভাত খাইল। আমি মনে মনে মা মা বলিতে লাগিলাম। নিকটে গেলে মধু বলিল "মায়ারই সংসার, মায়ারই গৃহস্থি।" শেষে দুধ দিলাম। বলিল "দুধই খাওয়ার মজা" (সত্বগুণ)। মধু গাঁজা চাহিল। আমার কাছে গাঁজা ছিল না। একটা পয়সা নিল। পয়সাটা বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল—বেলা গেছে, আজকার কি

উপায় করব। এগাঁয় ত কেউ খায় না।" (ঈশ্বরের জন্য পাগল একজনও নাই)।

পরদিন এল ; বাবু, অন্নমূল প্রাণ। ভাত মাতটাই মূল। দিন রাত ঠাসে খাওয়া লাগে।

আমি—তুমি বল ঠাসে খালে মিঠ্যা লাগে। আমি ত ঠাসে খাতে পারি না ; তয় মিঠ্যা লাগ্‌বি ক্যামন করে ?

মধু—উত্তর দক্ষিণে কুদীনারী বলরে (চারিদিকে অবিদ্যায় ঘিরেছে) পরদিন বলিল—পান্তা ভাতটা খুব মিঠ্যা। চাল মাল্‌ডা কারো নিয়ে যাওয়ার যো নাই। মোটই দিয়ে যাওয়া লাগ্‌বি। আমের মিঠ্যা ত প্রথম। শেষে কি আর মিঠ্যা থাকে ? কালের আম সে এককথা। এখন শেষ পড়িছে ; এখন ততদূর হয় না। এজন্মে যা করিছি, খুব করিছি ; বাহার করিছি। অর্থাৎ শেষ বয়সে সাধন মিঠ্যা লাগে না। সংস্কার সব পাকিয়া যায়। নিজের সম্বন্ধে বলিল—খুব করেছি।

আজ মধু এল। এসে দুধ ও চিড়া খাইল। ভাত ছিল না। বলিল "এই আম খাওয়াই হলো।" অর্থাৎ আর কিছু হলো না। পরে বলিল —বাবু একটু গাঁজা খাব। আমাদের চাকরকে কল্কী, আগুণ ও তামাক দিতে বলিলাম। সে একটা ভাঙ্গা কল্কে ও সামান্য আগুণ আনিয়া দিল। মধু গাঁজা সাজিয়া কল্কেটি মাটিতে রাখিল আর ঢলিয়া পড়িল। মধু বলিল—বাবু, কপালটা বড় ভাল দেখি না।

অর্থাৎ কল্কী বিশ্বাস। তা ভাঙ্গা। আগুণ পুরুষকার, তা বুড়া-মানুষের আর কত থাকে। গাঁজা সামান্য কিন্তু টানিতে পারিলে খুব ধোঁয়া ও নেশা হয়, তাতে আনন্দ। হরিনামও তাই; খুব পুরুষকার সহকারে সাধিতে পারিলে আনন্দ হয়। মধু এতকাল ধরিয়া যে কল্কী বানাইল, তাও ভাঙ্গা হইল। সকলের মূল বিশ্বাস। বিশ্বাস হ'লে

কায করে। তাই গীতায় আছে—শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।

মধু এইসব কথার মধ্যে একটি কথা বলেছিল—বাবু, এঁইসব করেনআর পূজার পর যেন মরে যান। বেশীদিন আর টিকলেন না। দিনই ফুরায়ে আলো। আমার মনে হইল ঐ পূজার পর আমার মৃত্যু হইবে। ইহাতে আমার মনে একটা বৈরাগ্য হইল। মনে করিতাম এরা আর কদিনের জন্য। আমার মন যেন আলৃগা হইয়া, তাহার কেন্দ্র ছাড়িয়া ভাসিয়া উঠিল। দিবারাত্রি যথাসাধ্য জপ করিতাম। মাথার রোগ হইল। মধু বলেছিল—কথা বলিবেন না। আমি তাহা পারিলাম না।

একদিন আমরা ক ভাই ও দক্ষিণা রান্নাঘরের বারান্দায় খাইতেছি। কে যেন মধুর কথা তুলিল এবং বলিল যে মধু অনেককে বলে, তুই মরবি কিন্তু তারা মরে নাই। মধু অনেক দুশ্চরিত্র লোককে ভাল করিবার জন্য ঐরূপ ভয় দেখাইত, তাহা আমি জানি। যাহা হউক, ঐ কথা শুনিয়া আমার কৃত্রিম বৈরাগ্য ছুটিয়া গেল। আমার মন যেন আদ হাত নামিয়া আসিল এবং নিজ কেন্দ্র ঠিক চাপিয়া বসিয়া পড়িল। অনিদ্রাবশত: মাথার অসুখ ও জ্বর হইল। আমি জপ ত্যাগ করিলাম।

পরদিন মধু আসিল। আমি বলিলাম—মধু আম খাওয়াই হলো। এই দুটা আম খাও।

মধু বলিল—মাটিতে রাখেন।

আমি বলিলাম—মধু গাঁজাটুকু থাকিল।

মধু বলিল—কৈ, আপনার গাঁজা কৈ?

আমি বলিলাম—আছে একটু। কল্কেও পাব, আগুণও পাব। মা যখন আছেন তখন পাবই। তখন খাব।

মধু বলিল—কবে বা আপনি কল্কে পাবেন, কবে বা আগুণ পাবেন। গাঁজাটুকু আমারি দেন।

তার পর বলিল—গাঁজাই মূল। বহুৎ দিন পরে খালিও ফল আছে।

মধু আকাশের দিকে তাকাইয়া বড় বড় করিয়া বলিল—আরে ভগে, এ হলো কি?

উত্তর—এট্টা দরবার কল্লাম।

প্রশ্ন—তাতে লাভটা হলো কি?

উত্তর--লাভ আছেই তো।

অর্থাৎ চেষ্টা করিলেও লাভ আছে; বুঝে কেন হইল না। বিফলতায় লোকের জ্ঞান হয়।

মধু (ভাঙ্গা কল্কীটা দেখাইয়া) এইকল্কের গাঁজা খাবেন আপনি? আগে মানুষের কাছে থা'কে মানুষ হন।

আমি—মধু, বুড়া মানুষ কি গাঁজা খায়?

মধু—খায়ও কতজন।

মধু—মানুষধর্ম্মডাই ভাল। সেডা আগে শেখা লাগে। (চিত্ত-শুদ্ধির চেষ্টা করিতে হয় আগে)। আর মেয়াডার তো কলাগাছের সাথে বিয়া দিছি। (আমার দিকে তাকাইয়া) বাবু, আপনি কল্লেন কি? একটা মেয়েমানুষের থুতি (শক্তি) ও নাই। তয় এখন আপনার কাছে তামুক টামুকই খাব।

আমি—মধু, মানুষ জন্ম কি আর সকালে হবে?

মধু হাসিয়া বলিল—তা ভগবান্‌চন্দ্রই জানেন। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা;

তিনি খাওয়ান পরান, শয্যা দেন। তিনি বল্‌তে পারেন। তিনি ইচ্ছা কল্লিই হয়। ভয় কি, আমি আছি? যেখানে সেখানে থাকেই ডাকা যায়। কালা বকনাডা (প্রকৃতি কামাদি) যেন আপনার সা'রে নেয় না। বাবু, মানুষধর্ম্ম কি এখন আছে? দুই পয়সা দর ক'রে একসের পটোল নিবিনি। শেষে সাধে এক পয়সা। শেষে পটোল কা'ড়ে নিল। আর না দিয়ে কি করবি? জা'লেরা মাছ মার'তেছে। একজন মস্ত এক রাঘব বোয়াল জালেরথে ধরে ছেঁচ্‌ড়া'য়ে নিয়ে চল্লো। জা'লে বলে—বা, তোমার শন্তিকরে নেওয়ার কথা। তুমি শন্তিকরে নেও, নিয়ে যাও। তাও পারে না, দিবিও না। শেষে জা'লে কা'ড়ে রাখলো। আর কি করবি!

অর্থাৎ গুরু শিষ্যে একটা প্রতিজ্ঞা হয়। শিষ্য সেটা ভাঙ্গিলে, গুরুও ভাঙ্গিতে পারেন। কিন্তু তাঁরা পরম দয়ালু।

আমি—মধু, গাঁজা খেতে গিয়ে কেউ কখন মরে না, কেমন?

মধু—না, গাঁজা মধু। আমি খুব খাই।

দেখিলাম বাবার কথাই ঠিক। ঈশ্বরলাভ সাধনের কাম। মুখ ভারতীর কাম নয়। ধন মান লাভ সহজ, কিন্তু ব্রহ্মলাভ কত কঠিন। মহাবাহুর কায, গুড়াকেশএর কায, লাঠেলের কাজ। চরিত্রের বল না থাকিলে ধর্ম্ম হয় না। কচ্ছপের ন্যায় কামুড় দিয়ে পড়ে থাক্‌তে হয়। আর বিশ্বাস কি জিনিষ, জন্মান কত কঠিন। আবার নষ্ট হয় কত সহজে।

আমি একাই বাড়ী হইতে রাজসাহী আসিলাম। আসিয়া অত্যন্ত জ্বর হইল। ৮।১০ দিন পরে আরাম হইলাম। মধু আমার কৃত্রিম বৈরাগ্য জন্মাইয়াছিল বলিয়া একটু বিরক্তও হইলাম। সমস্ত নিয়ম ত্যাগ করিলাম। যা দশ বৎসরে খাইনা সেই মাছ, মাংস ৫।৭ দিন

খাইলাম। মনে হইল "সদ্‌গুরুমেব আশ্রয়েৎ ব্রাহ্মণং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।" মধু মহৎ লোক, তাহাতে সন্দেহ নাই। যা হউক এখন মানুষ ধর্ম্মই শিখি ; পরে যা হয় হবে। ইহার পর আবার যেমন নিত্য উপাসনা, তাই করিতে লাগিলাম। পূজার ছুটি আসিল। মধুর জন্য মন কেমন করে। প্রথম দিন কতক বড় দুর্দ্দিন গেল। তারপর ষ্টিমারে গোল। দুই তিনদিন ঘাটে গেলাম কিন্তু যাওয়া ঘটিল না। ষ্টিমার পাইয়াও ঘটিল না, না পাইয়াও ঘটিল না। পাইয়া ঘটিল না—সে ষ্টিমারে ওলা-উঠার মানুষ মরিয়া ডেকের উপরেই ছিল। এখানে আসিলে পুলিশে তদারক ক'রে জলে ফেলে দিল। বাসায় ফিরে এলাম। বাড়ী আসিয়া মনে করিলাম, যদি মার ব্যারামের খবর পাইতাম তবে কি যাইতাম না? তবে সে অনুরাগ নাই, সে ভক্তি নাই, টান নাই। কেবল দৃষ্টি নিজের শরীরের সুখ দুঃখের দিকে। "আমি ও আমার" ছাড়িল না।

একদিন মনে হইল, মধু বলেছিল—আর একঘরে থাকিবেন। তা তার কোন কথাই প্রতিপালন করিতে পারিলাম না। বাবাও ত বাহিরের ঘরে থাকিতেন। আমিও তাই করিব। সেই দিন সর্দ্দি লাগিল। লণ্ঠনটা এত পরিষ্কার করিলাম জ্বলিল না। নিভিয়া গেল। সতরঞ্চ লইয়া আবার "পুনর্মূষিক" হইতে হইল। কে যেন বাদ সাধে। বুঝি না কে এসব করে।

এখন দিন দিন মনে হইতেছে পুরুষকারই সব। পুরুষকার ব্যতীত সংসারে কায হয়? এটা মন্দ ; করব না ত করবই না ; এই যে পারে সেই ভাল হইতে পারে। আর যে বলে—আচ্ছা কাল হইতে হইবে, তার আর এজন্মে হইল না। খবরের কাগজ আর পড়িব না মনে করি ; কিন্তু দেখিলেই মনটা ওদিকে যায়। তিনি মোহিত করিবার জন্য কাগজ রূপ ধরে উপস্থিত হন। কাগজ পড়িলেই দেশের

কথা মনের মধ্যে সারাদিন ঘোরে। আর সব ভুলে যাই। অথচ আমার মত লোক দেশের কি করিতে পারে? এইরূপে দিনই গেল। এ জীবনে কোন কাযই হইল না। লোকে ঐহিকেরই কত কাষ করে। কিন্তু সেদিকে মনই যায় না; মন যা চায়, তা পায় না। একটা জোর যাই। যতদিন সেই জোর না আসে, ততদিন কোন্ মুখে জোর করিব। প্রসাদও বলিতেন—

আমার মুজুরী হলো না মুজুরা চাব কি,
কিজোরে করিব জোর গো।
হোক দিনে দিনে বাজী তাতেও আছে রাজী
এবার এবাজী ভোর গো॥
দিবানিশি ভাবি আরকি করিবি
দিবি দিবি পুনঃ জঠর যন্ত্রণা।
কালীর পদে মনের খেদে দীন রামপ্রসাদে ভাসে।
আমার এই যে কালী মনের কালী, হলেকালি তার বিষয়বশে
মা আমি দোষী কিসে।

ইহাতে বুঝা যায় যে তাঁহাকে এজীবনে মুক্তির আশায় নিরাশ হইতে হইয়াছিল। কিন্তু উৎকট সাধনার পর আশাত সিদ্ধি হইয়াছিল। তাই রামপ্রসাদের গান ভাল লাগে। মানুষ হয়েও যাদের দেবতার উপরে ষোলআনা সত্ত্বগুণ, তাদের কথা শুনে সুখ হয় না। আশা হয় না। হাঁচড়্ পাঁচড়্ বাড়ে না।

মন ভেবেছ দেবে আমায় জলাঞ্জলি
ওরে জাননারে হৃদে গেঁথে রেখেছি দক্ষিণাকালী॥

আবার—"মাগী জানেনাযে হৃদ্‌কপাটে দিয়েছি খিল বড় কসে।"
আবার বলিতেন "গলেতে বেধেছে আমার কালীর নামের ফাঁশী।"

নাম অবলম্বনে নিরালম্ব হয়ে আছেন। সমুদ্রে ঝম্প নাদিলে রত্ন মিলেনা। এতে দেখি যে মার চরণ ধরে থাক্‌লে পুরুষকার আসে। তখন আর ভুলালে ভোলেনা। তাঁর কৃপা হয়।

উপাসনা ও স্বপ্ন।

৫।৮।০৬। আজ সন্ধ্যাকালে গ্রহণ হইয়া গিয়াছে। ভোরে স্বপ্নের মত অবস্থায় দেখিলাম—আমি একটি নদীর তীরে বসিয়া গ্রাম হইতে ঐ নদীতে যাইবার একটি প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করিতেছি। পথ যেন হইয়াছে। মাঝে মাঝে গরুর ক্ষুরের খাল আছে। বসিয়া বসিয়া তাহাই বুজাইতেছি। এমন সময় অমিয় (৮ বৎসরের মেয়ে) বলিল—বাবা, কি করিতেছ? আমি বলিলাম—রাস্তা বাঁধিতেছি, মা।

অমিয়—বাবা, আমরা ত ক'দিন পরে চলিয়া যাইব। রাস্তা বাঁধিয়া আর কি হইবে?

আমি—আমরা যাইব সত্য। গ্রামে অন্য লোক ত থাকিবে, তাহাদের কায হবে।

অমিয়—বাবা এনদীর নাম কি?

আমি—ব্রহ্মপুত্র। (তারপর) না, গৌরী।

অমিয় চলিয়া গেল। তখন হৃদয়ের ভিতর হইতে কে যেন বলিতেছে—তুমি বাঁধা রাস্তায় যাইতে পারিলে না। আর নিজে রাস্তা বাঁধিয়া কি সেই জায়গায় যাইতে পারিবে? অমনি উঠিয়া বসিলাম; দেখি যে ভোর হইয়াছে—উষাকাল।

ইহার অর্থ কি? বোধহয় মধুর সেই কথা। সংসারধর্ম্ম করিয়া চিত্তশুদ্ধি করাই এই পথ। কিন্তু এ মানুষধর্ম্ম বড় শক্ত। গুরুকৃপা অতি সহজ পথ। ইহা ধরিলে অনায়াসে ভবসাগর পার হ'য়ে যাওয়া যায়। গুরুআরাধিত মন্ত্র সাধিতে পারিলাম না। আর নিজে

পথ প্রস্তুত করিয়া বৈধধর্ম্ম করিয়া চিত্তশুদ্ধি করিয়া সেদেশে যাব, সে বড় দূরের কথা। তোমাকে চিনিলাম না মন; তুমি কখন দেবতার মত কথা বল; কখন পশুর মত কাযকর। মাই স্বপ্ন দেখা-লেন। তিনি মা, মনের মন। তিনি যা ভাল, তাই বলিয়া দেন। নিদ্রিতকে গায়ে হাতদিয়ে জাগান। গুরুর দয়ার অন্ত নাই। যে তাঁকে একবারে ডাকিবার মত ডাকে, তাঁকে তিনি মনেমনে ভাল বাসেন। তাকে দিয়া ভাল কায করাইয়া লন। এই সময় হইতে আমার মনের ভাব নিম্নের প্রর্থনায় বুঝা যাইবে; তাঁর কত দয়া। এখন তাঁকে যাই বল। প্রভু ও পিতা বলিয়া মন যেন তৃপ্তি লাভ করে না; যেন একটু তফাৎ তফাৎ এ রেখেছে। আর আমি মার বুকের ছেলে। মা সেদিন প্রাণের মধ্য হইতে বলিলেন—"বাছা, তুমিকি নিজে রাস্তা বাঁধিয়া যাইতে পারিবে? সে শক্তি কি তোমার আছে? তুমি বাঁধা পথে হাঁটিতে পার না। তুমি অধ্যয়ন, পরো-পকার, সংসার এসব ছাড়*। নামপথ অবলম্বন কর। দীর্ঘতমা হতে রামকৃষ্ণ পর্য্যন্ত যে সুগম সনাতন পথ পড়িয়া আছে, তোমাকে তাহা দেখাইলাম। মধুর কথা শুনাইলাম। তবুও তুমি কর্ম্মে কোমর বাঁধ কেন? তোমার সে শক্তি কোথায়? তুমি প্রকৃত বৈষ্ণব হইতে পারিবে না। তুমি মুরলীধারীর ও শঙ্খচক্রধারীর কাহারও উপাসক হইতে পারিবে না। তুমি শক্তির উপাসক হও; মা মা বলিয়া ডাক।"

আমি তাই বলি—মা! আমি শক্তিহীন, ভাগ্যহীন; এখন তোমার দয়াই একমাত্র ভরসা। "নামেরই ভরসা কেবল," তাও আমি বলিতে পারি না। তোমার কৃপাই ভরসা কেবল শ্যামা গো আমার।"

* সাধনের চরম অবস্থায় বহিঃকর্ম্মত্যাগের উপদেশ।

ছেলে যখন বড় ব্যথা পায়, কেবল যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করে, তখন স্তন মুখে দিয়া তুমি শান্ত কর। ছেলে দুর্দ্দান্ত দুষ্ট ত হয়ই। কিন্তু এমন সময়ও হয় যে মাও থাকিতে পারেন না। দুধ পড়িয়া যায়। তখন ছেলেকেই তিনি খোঁজেন। জোর করে তাকে কোলে ক'রে স্তন্য দেন। সে শেষে চুপ হয়ে যায়, "পীযুষ পানে"। তোমার সেই অহৈতুকী কৃপাই ভরসা মা। আমার যদি কোন ভরসা থাকে তবে তুমি মা, এই ভরসা। বৈরাগ্য জ্ঞান ভক্তি বা ভক্তি বৈরাগ্য জ্ঞান আমার হবে না। এ পথেও না, ওপথেও না। বিধি পথও বন্ধ, রাগপথও বন্ধ।

"রামপ্রসাদের মনে বড় ত্রাস,
জন্মে মাতৃকোলে না করিলাম বাস।
পেয়ে দুখের জ্বালা, শরীর হলো কালা,
তোলা দুধে ছেলে বাঁচে কত কাল।"

মা উদ্‌গময় জ্ঞানসূর্য্যং। মা, নাই আমার অনন্যা ভক্তি, নাই আমার শরণা গতি। নাই আমার তব প্রিয় কর্ম্ম; কেবল আছে "হাঁকি চুঁকি।" ঘুম ভাঙ্‌লে কেমন হয়, দেখাও মা। মায়াশয়ন হতে উদ্বুদ্ধ হলে কেমন হয়, দেখাও মা। সন্ধ্যা বন্ধ্যা হলে কেমন হয়, দেখাও মা। যে দেশে রজনী নাই সে দেশ কেমন, দেখাও মা।

এই সময়ে আরো কয়েকটি স্বপ্ন দেখি। তার মধ্যে দুটি নিয়ে দিলাম। ইহার সহিত পরবর্ত্তী ঘটনার কিছু সম্বন্ধ আছে।

স্বপ্নে দেখিলাম একখানি ঘর। তার পূর্ব্বদিকে একটি বড় জানালা। কয়েকটি শিক বসান আছে। কিন্তু পাল্লা নাই। ঘর অন্ধকার। বাহিরে অতি উজ্জ্বল নীল আলোক। যেন অনন্ত

আলোকের রাজ্য। সে সূর্য্যের আলো নয়। আকাশে সূর্য্য নাই। অতি স্নিগ্ধ উজ্জ্বল অসীম অনন্ত আলোকমণ্ডলে যেন গৃহের বহির্ভাগ ব্যাপ্ত। ভিতরেই যত অন্ধকার। ঐ জানালা দিয়া ঐ আলোক দেখা যাইতেছে। ঐ আলোক রাজ্যে আলোকের বাধা দেয়, ঘরদ্বার বৃক্ষলতা পশুপক্ষী গ্রহনক্ষত্র এমন কিছু নাই। সে মহা অনন্ত, অনন্তবিসারী অখণ্ড আলোক উর্দ্ধ অধঃ পূর্ব্ব পশ্চাৎ সর্ব্বতো ব্যাপ্ত। কিন্তু গৃহে দ্বার নাই।

আর একটি স্বপ্ন এই—যেন কোন ষ্টেসনে গিয়াছি। বাড়ী যাব। গায়ের কাপড় রাখিয়া চটি পায় দিয়া বেড়াইতেছি। ইতিমধ্যে দেখি মধু একটা বাক্সের উপর বসিয়া তামাক খাইতেছে। সে আমাকে দেখিয়া কিছু বলিল না। নিজেই বলিল "তামুক টামুক খালাম, এখন বাড়ী যাই।" আমি তার পেছনে পেছনে গেলাম। প্রাচীরের একস্থান ভাঙ্গা ছিল। ঐ পথদিয়া ষ্টেসন হইতে বাহির হইলাম। কিন্তু সে ক্রমে এগিয়ে যাইতেছে। সে এক বাজারের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতেছে। আমার চটি জুতায় বড় অসুবিধা হইতেছে। আর পায় যেন জোর পাইতেছি না। আর মাঝে মাঝে গায়ের কাপড়খানা ষ্টেসনে আছে, কেহ লইয়া যাইবে একথা ভাবিতেছি। ক্রমে মধু দুরে চলিয়া গেল। আমি তাহার সঙ্গ ধরিতে পারিলাম না। ক্ষুন্ন মনে ফিরিয়া আসিলাম।

অর্থাৎ রেল ব্রহ্মধামে যাইবার নিত্য পথ। ষ্টেসন এক একটা জন্ম। ইহাতে অতিথির মত থাকতে হয়। কদাচিৎ ভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গ হয়। কিন্তু "আমি আমার" থাকে ব'লে ও শক্তি সামর্থ্যের অভাবে মানুষ তাদের সঙ্গ ধরিতে পারে না।

এই শেষ বার। বড় দিনের বন্ধে বাড়ী গেলাম। ৮টার সময়

বাড়ী আসিলাম। হাটের উপর মধু বসিয়াছিল। হাটের উপর আসিয়া দেখি মধু আমার দিকে আসিতেছে। পোড়াদহ হইতে কিছু সন্দেশ আনিয়াছিলাম। আমি ভক্তির সহিত তাহা মধুকে দিলাম। বোচকা খুলিয়া কিছু খুবানী ও একটা কমলা লেবুও দিলাম।

এবার মধু বড় জীর্ণ শীর্ণ। একখানি লজ্জা নিবারণের বস্ত্রও নাই। গায়ে কাঁথা, পরণে নেংটি। আমি পূজার সময় বাড়ী আসিব বলিয়া মধুর জন্য যে গাঁজাটুকু কিনিয়া রাখিয়াছিলাম তাহা দিলাম। মধু বলিল—একখান কাপড় যেন দেন। আমি কাপড় আনিয়াছিলাম; তাহা দিলাম। মধু কাপড় খানি সহাস্যবদনে লইল এবং বলিল "আপনি যান আমি আস্‌তেছি। আলাপটা কথাটা কর্‌বনে।"

ঘণ্টা খানেক পরে দ্বারে আসিয়া ডাকিল—"বাবু কৈ, আমি চাখ্যাষ (চাক্ষুষ দেখা) কর্‌তি আসিছি।" আমি তৈল মাখিতে ছিলাম। মধু বলিল—ছান (স্নান) করেন নাই। তয় যান, ছান করেন গিয়ে। মধু নিচু তলায় বসিল এবং বলিতে লাগিল—বাবু কোথায় না থাকেন? আমি—রামপুরা। মধু—বউঠাকুরানীরা? আমি—তারা সেইখানেই আছে। মধু—ছেলেরা? আমি—তারাও সেই খানেই আছে। মধু—আপনি একলাই আস্‌চেন? আমি—হাঁ। মধু—সেখানে কি বাড়ী করিছেন? আমি—হাঁ। মধু—এই বাড়ীর মত বাড়ী? আমি—হাঁ।

মধু—বাসা করা লাগে, বাড়ী করা লাগে না। সেখানে মা'তে গেছেন। ছেঁড়ী টেঁড়ীর মুখ দেখে একবারে মা'তে গেছেন। (হাসিয়া) আমরা যেমন এখানে মা'তে গিছি। মানুষ মা'তেই যায়। মাতা লাগে না। এই রকম আসা লাগে (সৎসঙ্গ

করিতে হয়)। হাগা (ঈশ্বরানুভব) বড় সুখ। খুব চাপ্‌লিসেন হাগা আসে। খুব ঠা'সে খাওয়া লাগে (তীব্র সাধন চাই) তয় সেন ঠা'সে হাগা চাপে।

মানুষে কয়—বিয়ের সময় হাগার বাস্তি। আমার তাই হয়। ভ'গের কাম বুঝা যায় না। আমি খুব রস খাই। আবার খাইও না।

আমি হরিনাম করিতেছিলাম। মধু বলিল "ঐটাই হবে।" আপনার বাড়ীর পালান (বাহিরের জমি) নাই? পালানেই থাকা লাগে। তাই যেন থাকেন। ভাতমাত যেন দেন। ভাত মাত যেন খান। ঐ তপস্যা, মহাতপস্যা। এবার যাব, আপনার সাথেই যাব। আপনারই আশা। আচ্ছা অনেক দিন (এখানে) থাকেন। ভাত মাত ত খাই। তয় আপনার সাথে যাব। মধুর খাওয়া হইল। মধু আমাকে যে পট্টুর কোটটা দিয়া পরীক্ষা করিয়াছিল, সেইটা দিলাম; বলিলাম বড় শীত, গায়ে দিও। মধু নিল; একবার হাত বুলাইয়া দেখিল। বলিল "না এ রেশমী কাপড়। আমি নেব না।" আমি বলিলাম—শীতে বড় কষ্ট পাও, নেও না কেন? মধু বলিল—এই ক্যাথা আছে। "অশরীরং বাবসন্তং প্রিয়াপ্রিয়েন স্পৃশতঃ। যে অশরীর তাকে সুখ দুঃখ স্পর্শ করে না। মধু পূর্ব্ব কথা স্মরণ করাইয়া বলিল "পুরুষ মানুষ যদি হয়, আর যদি কাম করে তয় সেন হয়। আর মেয়ে মানুষ হলি আর কি হবি।"

২৬।১২।০৬।

পরদিন মধু দুটি ভাত খাইল। দুধ চাহিল, দুধ ছিল না। বলিল" নাড়ে বড় জ্বর (বিষয়াসক্তি) তাতি গাঁজা মিঠ্যা লাগে না। ভাত" মাত, রুথ (রুই) মাছ, চিথল মাছ কিছুই মিঠ্যা লাগে না। এই জ্বর নি সারাবের পারেন? আমি ত মন্তর টন্তর জানি না। মধু

গাঁজা খাইবে, একটু আগুণ ও একটা কল্কী চাহিল। আমার ভাইপো সব আনিয়া দিল। মধু গাঁজা সাজিতে সাজিতে বলিল, আপনি সকাল করে আসতে নি পারেন? আমিও এখানে থাক্‌বো; বিয়ে টিয়ে ত আর কর্‌বো না। দুইজনে এক সাথী হয়। গাঁজা টাঁজাই খাব। তারপর তামাকের সাথে গাঁজা মিশাইয়া একটু একটু টানে আর বলে "আমি আগুণ নিভাইনা।" মধু কাঁথা কাপড় দূরে ফেলিয়া দিল। গাঁজায় দম দিয়া কাসিতে লাগিল। পরে শিবনেত্র ধ্যানস্থ ভাবে বলিল—"চালমালই দেখি আর কিছু দেখি না।" এই (গাঁজাই) মূল। আর কিছুই না। আমি বলিলাম মধু বাড়ী যাবে? মধু বলিল—"যাব; তয় উতুযোগ ত নাই। একদিন হবি। আগে মেহানৎ করে উতুযুগ করিছি। এখন আর উতুযুগ নাই।" (দেহ পাত হলেই হবে)। এককালে উদ্যোগ করে সাধন করিয়াছি, এখন উদ্যোগ নাই।

কাল আমি যে কাপড় খানা দিয়াছিলাম দেখি দুপরল (ভাঁজ) করিয়া তাহা গায়ে দিয়াছে এবং আবার নেংটি পরিয়াছে। আমি আর একখানা ছোট কাপড় দিলাম। মধু বলিল—আর একখান দেবেন, দেন। সেখানা পরিয়া "তয় এখন আসি" বলিয়া হাসিয়া হাটের দিকে গেল। আমি বলিলাম—শীতে বড় কষ্ট পাও, কোটটা নিলে না? মধু বলিল—"না ওডা আর চাই না। ক্যাথাই আছে। তাতেই হবি।"

পরদিন ও আসিল এবং গাঁজা খাইল। বলিল—"এ গাঁজা খাওয়া গেল না। ইয়ের মধ্যে রক্ত আছে। মানুষের রক্ত। একটু আগুন দেন এগাঁজা পোড়ায়ে ফেলি।" আমি বলিলাম—রাখ পোড়াইও না। মধু বলিল—আজ্ঞা না। ইহা বলিয়া কাগজ শুদ্ধ ফেলিয়া দিল।

মধু বলিল—নাড়ে (নাড়ীতে) বিষম জ্বর আছে। তাতেই গাঁজা মিঠ্যা লাগে না।

আমার বুদ্ধি বিষয়াসক্ত বিকৃত জ্বরগ্রস্ত, তাই হরিনাম মিঠ্যা লাগে না। অন্তরস্থ জ্বর; বাহিরে ঠাণ্ডা মধ্যে জ্বর। হওয়া উচিত উল্টা। এ ত সত্যকথা। আর মানুষের রক্ত কি? গাঁজাতে তোমার রুচি হয় না। যেমন উপাদেয় খাদ্যে মানুষের রক্ত থাকিলে তাহাতে কখনও রুচি হয় না, নামগ্রহণেও তোমার সেইরূপ হইয়াছে। ইহার কারণ অন্তরস্থ বিষমজ্বর বিষয়ানুরাগ। অন্তরস্থ জ্বরের লক্ষণ অরুচি। জ্বর টের পাওয়া যায় না। জ্বর না গেলেও অরুচিতে ধরা পড়ে। অন্তরস্থ জ্বরে অতি উপাদেয় সামগ্রীও ভাল লাগে না। তিক্ত লাগে। এসবই সত্য।

মধুর মুখে এবার আনন্দ দেখিলাম না। বড় গম্ভীর; অপ্রসন্ন। আমি অকর্ম্মণ্য, তাকে নিরাশ করিলাম। তার এত যত্ন বৃথা হইল। হবেই ত। আমাদের কি হয়? কোন ছেলের জন্য যদি যত্ন করি আর তার যদি কিছু না হবার লক্ষণ দেখি, তখন মন কেমন হয়?

মধু বিকালে বাহিরের ঘরের বারান্দায় বসিল। আমাকে ডাকিল "আসেন"। একটু পরে বলিল "তয় যান ভাল জায়গায় বসেন গিয়া।" কিন্তু তা নয়। মধু কত কথা বলিত এবার আর তেমন কথা বলে না। দুপ্রহরে দই খেতে দেওয়া হইয়াছিল। তা ধুয়ে ফেলে দিল; বলিল—ইহাতে বমি আছে। কাল রাত্রিতে মা আমাকে পায়েস খাইতে দিলেন। মধুর কথা মনে হইল। সবদিলে মা দুঃখিত হবেন। কিছু খাইলাম। আর সব মধুকে দিলাম। প্রথম দ্বিধা হইয়াছিল। শেষটা শবরীর কুলের কথা মনে হইল। বাস্তবিক মনই প্রমাণ। ভক্তিঅধিকারে শাস্ত্র চলে না।

মধু আজ আবার সেই গাঁজা খাইল। হাসিয়া বলিল "তুই ফেলায়ে দিলি, তুই আবার নিয়ে খালি।" মধু পায়েস চাহিল। আমি বলিলাম—বোধ হয় নাই। মধু চলিয়া গেল। অপ্রসন্ন। রামকৃষ্ণ ঠাকুর বলিয়াছেন—ইহাদিগকে মিষ্টদ্রব্য খাওয়াইলে খুব ভাল হয়। পরদিন সকালে একটি লোক আমাকে বলিল "আমি যখন কাল রাত্রে আপনাদের বাড়ী হইতে বাড়ী যাই, মধু বলিতেছিল—এখন কেবল ভাতটার মাতটার জন্যই থাকা। পেটে চারিটা না দিলে নয়, তাই বসে থাকা। এবার বড় cold. (অপ্রসন্ন)। কেবল বলে—মেয়ে মানুষ হলি আর কিহবি?

পরদিন ধুনুরীরা লেপের তুলা ধুনিতেছে। মধু আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—এরা লেপ বানায় না?

আমি—হাঁ।

মধু—কত নিবে?

আমি—ফি সেরে চারি আনা।

মধু—তা হলি ত সিকা বার আনা ত নিবি?

আমি—হাঁ, তাত নিবে।

মধু—একাযের গৈরব আছে।

আমি—কেন?

মধু—যে শীত, তাই ঠেকায়।

যে ব্যক্তি যতবড় বিপদ হতে রক্ষা করিতে পারে, সংসারে তার তত গৌরব। রাজা, উকীল, চিকিৎসক, গুরু। গুরু ভবভয় হতে রক্ষা করেন। ছন্দোগ্যে আছে—

পণ্ডিতো মেধাবী গান্ধারান্ এব উপসংপদ্যেত। এবং ইহ আচার্য্যবান্ পুরুষঃ বেদ।

চোরেরা গান্ধার দেশীয় কোন ব্যক্তিকে চক্ষুবাঁধিয়া দেশান্তরে লইয়াগিয়া বনের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া যায়। সেই গান্ধারবাসী, চক্ষু খুলিয়া লোকের উপদেশ ক্রমে সমস্ত জ্ঞাত হইয়া, অনুপদিষ্ট বিষয়ও স্বয়ং বিচারদ্বারা জানিতে সমর্থ হইয়া ও উপদিষ্ট বিষয়ের স্মরণে সক্ষম হইয়া পুনরায় গান্ধার দেশ ই প্রাপ্ত হয়; সেইরূপ অবিদ্যাচোর জীবকে ব্রহ্মের ক্রোড় হইতে টানিয়া আনিয়া বিবেকচক্ষু বিশেষ রূপে বন্ধন করিয়া সংসার বনে ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু অতি করুণাময় ব্রহ্মরাজ্যের গুরুর উপদেশ ক্রমে নিজের আত্মভাব পুনরায় প্রাপ্ত হয়। মধুর উপদেশ দিবার কেমন রীতি।

সন্ধ্যার সময় আসিয়া বাবু বাবু বলিয়া ডাকিল। আমি বাহিরে আসিলাম। বলিল "কাল যাবেন। আসেন একটু বসি।" আমরা দুজনে দুরে বাহিরের ঘরের বারান্দায় বসিলাম। আমি বলিলাম— মধু একটু প্রকাশ হও। এত প্রচ্ছন্ন থাক কেন? তা হলে এত অন্নের ক্লেশ হয় না। মধু কোন উত্তর দিল না। অনেকক্ষণ পরে বলিল—"মানুষে বলে আকাল (দুর্ভিক্ষ)। তারা ত খায়।" আমি পরে বলিলাম—আমার নাড়ীর জ্বর সারিবে কি? মধু বলিল—"ও সা'রে যাবি, তয় এখন যান।"

পরদিন বলিল—আজ যাবেন। আচ্ছা আসেন গিয়া। সকাল করে যেন আসেন। বেহানে যেন ঠাসে পান্তাভাত খান। তয় সেন কোমোক (জোর) ধরে।

অর্থাৎ শেষ রাত্রি হইতে উপাসনায় খুব বল হয়। মধু এবার বলিল—বাবু, বড়পূজা (দুর্গোৎসব) করেন না কেন? আমি বলিলাম—টাকার কায। মধু তখন কিছুই বলিল না। পরে অন্য সময়ে বলিল—বাবু, হাজার খানেক টাকানি দিতে পারেন?

ভাতমাত পেট ভরে খাবারই পালাম না। বাবু, এক কলস টাকা নি পড়ে পাওয়া'য়ে দিতে পারেন? (সকলের হাস্য)। অর্থাৎ আপনার নাই। ঈশ্বরের নিকট চেয়েও নিবেন না। তবে কেহ পড়ে পাওয়ালে কেবল হয়। অর্থাৎ এ তামস প্রকৃতির লোকের কথা।

এই শেষবার। বাড়ীর পত্রে জানিলাম মধুর কোমরের উপর দিয়া গাড়ীর চাকা গিয়াছে। সে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে। ঐ চিঠিতে কিশোরীর (আমার দ্বিতীয় কনিষ্ঠ) ট্রাম হইতে পড়িয়া ভয়ানক আঘাত পাওয়ার সম্বাদও ছিল। পথে ভাবিলাম কাকে আগে দেখি। মধুর দিকই মন টানিল। মধুর মত আত্মীয় যেন আর জগতে নাই। গাড়ী হইতে নেমে পদ্মা পার হইলাম। হাটের নিকটে দেখি মধুর ন্যাকড়াগুলি পড়ে আছে। মনে বড় আশঙ্কা হইল; কি অবস্থায় যেন তাকে দেখি। হাটের উপর গিয়া দেখি মধু পথের ধারে ঘুমাইতেছে। আমি সেখানে বসিলাম। তার ঘুম ভাঙ্গিল না দেখিয়া দুবার ডাকিলাম। সে জাগিল না। বেলা অধিক হইল দেখিয়া বাড়ীর দিকে চলিলাম। বিকালে হাট। হাটে আসিলাম। মধুকে দেখিলাম না। পরদিন শুনিলাম মধু রাত্রিতে একখানা পরিত্যক্ত ঘরে থাকে। আমি একটু রোদ উঠিলে সেই কুটির মধ্যে গেলাম। একটা ভয়ানক দুর্গন্ধ পাইলাম; দেখি মধু সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া শুইয়া আছে। মাঝে মাঝে কাশিতেছে। একবার কাশির বেগ হইল। মধু মুখ খুলিল। আমাকে দেখিয়া বলিল—বাবু কবে আসিছেন? আমি বলিলাম—কাল। তোমার কোমরের উপর দিয়া গাড়ীর চাকা গিয়াছে শুনিয়া আসিয়াছি। মধু বলিল—"না, তা কিছু না।" আমি বলিলাম—কাশী ও জ্বরে বড় কষ্ট পাইতেছ। মধু একটু হাসিয়া বলিল—হেঁ বাবু, মন্তর টন্তর দিয়ে এই জ্বরটা

ও কাশটা সারায়ে দেন না ক্যান ? আমি বলিলাম—আমার কি সাধ্য যে এরোগ আরাম করি। তুমি যা পার না তা কে পার্‌বে ?

মধু হাসিল। মধুর ভয়ানক রাজযক্ষ্মা হইয়াছে। তারপর মধু বলিল—আমাকে ধরে উঠান। আমি দুই বগলে হাত দিয়া উঠাইলাম। দেখি শরীরে কিছু নাই। কাশীর অত্যন্ত দুর্গন্ধ; রক্ত আর উঠে না। ফুস্‌ফুস্ পচিয়া যাইতেছে। গতবারে আমি যে তাহাকে আমাদের বাড়ীতে দেখিয়া আসিয়াছিলাম সেই অবধি মধু সেইখানেই থাকিত। ১০।১২ দিন হইল আবার এখানে আসিয়াছে। আমাদের বাড়ীতে থাকার সময় এক সের দেড় সের করিয়া রক্ত উঠিত। আর ভয়ানক জ্বর। জ্বর ও কাশিই খুব প্রবল। মধুকে ধরিয়া হাট ছাড়াইয়া রাখিয়া আসিলাম। তাহার কাঁথা ও ছালা পাতিয়া দিয়া আসিলাম। আমি বলিলাম—রাস্তা ছাড়িয়া বসাই। সে বলিল—না, এখানেই বসি। আমি বলিলাম—পালে পালে পাইকেরদের গরু যাইতেছে, ধান বোঝাই গাড়ী যাইতেছে, একটু সরিয়া বসাই ভাল। মধু বলিল—"না এখানেই বসি; গরু যাইয়া থাকে।" আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম। মধু বলিল—তয় এখন যান। মধু এখন কাছে মানুষ থাকা মোটেই ভালবাসে না। কেউ কাছে বসিলে বলে—"আপনি যান আপনারা আস্‌লে বড় বে—আসানে থাকি। আমি শুনিয়াছিলাম মধু এখন ফেন ও দুধ মাত্র খায়। ভাত খাইতে পারে না। আমি বলিলাম—মধু কিছু খাবে ? মধু বলিল—কিছু খাব না। ফেনটেন খাই, তা এখানেই পাই। আচ্ছা ঘন দুধ যেন আনেন। ফেনে ও ভাতে যেন আনেন। আপনি নিজি হাতে করে যেন আনেন। আমি বাড়ী আসিয়া সব লইয়া গেলাম। সরায় দুধ দিলাম। দুধ বেশ ঘন হইয়াছিল;

পরিমাণে এক পোয়া হবে। মধু খাইল। বলিল—কম হইছে, আরো খানিক আন্‌বেন (আনা উচিত ছিল)। তারপর ফেন খাইল। একটি মুসলমানের ছেলে বদ্‌নায় করিয়া জল দিল। মধুর খাওয়া হইল; বলিল—তয় এখন যান। হয় যানই। আমি একটু শুই (শোয়া মধুর ধ্যান)। আমরা চলিয়া আসিলাম। পরদিন প্রাতে সেই ঘরে গেলাম। দেখি মধু নাই। তাহাকে ইতি পূর্ব্বেই কে ধরিয়া পথের ধারে রাখিয়া আসিয়াছে। সারাদিন ঐখানে থাকে। সন্ধ্যাকালে কেহ রাখিয়া যায়। যদি কেহ না রাখে, তবে নিজে হাঁটিয়া অথবা হামাগুড়ি দিয়া ঐ ঘরে যায়। একটি মুসলমান বলিল—বাবু, এই ব্যাম; শুকাইয়া পাটকাঠী হইয়াছে। কিন্তু একদিন চেঁচাইতে শুনিলাম না। আমি মধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম মধু আমাদের বাড়ী ছিল, আবার বাজারে এল কেন? সে বলিল মধু বলিয়াছে "বাবুদের বাড়ী আর মরিব না। ঘোপের মধ্যে আর মরিব না।" আমি একদিন বলিলাম—মধু বল তোমাকে ধরিয়া বাড়ী লইয়া যাই। মধু বলিল—না আর যাব না। ফেন জল এখানেই পাই। আমি দেখিলাম মধুর এখানে থাকাই ভাল। সকলেই মধুকে ভালবাসে। তার যক্ষ্মা হইয়াছে বলিয়া কেহ ঘৃণা করে না। তাহার কাপড় কাচিয়া দিতেও সকলে প্রস্তুত। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত নিজে কাহাকেও করিতে দেয় নাই। বলিত—আমি যখন না পারি তখন যেন কাপড় খানা তেনা খানা খাচে খুচে দেন। বাজারের লোকে জল খাইতে বদ্‌না দেয়। রাত্রে গায় দিতে ছালা দেয়। এ হিসাবে অজ্ঞান জ্ঞান অপেক্ষা ভাল। কৈ, তার জন্য ত কারও ব্যাম হয় নাই। সেই বিষ ধূলাতে মিশিয়া উড়িয়া হাটের সব জিনিষে অবশ্য মিশিয়াছিল। আমার যাওয়ার পূর্ব্বে মধু যখন আমাদের

বাহিরের ঘরে থাকিত, তখন একদিন বাহে গিয়া ৪ ঘণ্টা পড়িয়াছিল, কেহ জানিতে পারে নাই। তখন ভোলা (আমার ভাইপো) গিয়া তাহাকে উঠায় ও লইয়া আসে। সেইদিন মধু বলেছিল—"পুরুষ মানুষটা চলে গেছে রে।" মধুর কি পুরুষকারই ছিল। আমাদের বাড়ী হইতে যাওয়ার দিন কাশরক্ত খোলা দিয়া চাঁছিয়া পরিষ্কার করিল এবং ছেড়া কেঁথা অতি কষ্টে লইয়া গেল।

বিসর্জ্জন।

মধু বাজারের লোকদিগকে এবার বলিয়াছিল "মধু এবার চলিল—এই ফাল্গুন মাসে।" মধু আসন্নকালেও রহস্য ছাড়িত না। জুলে শেখকে বলে—দাদা মশায়, ফাল্গুন মাসে আমি বিয়ে কর্‌ব। আপনাগেরে এখানে আর আস্‌ব না। আমার একটা ঢাহী (ঢাকী, যে ঢাক বাজায়) দেবেন। আচ্ছা তাই যেন দেন। আমার বিয়ে বাজাবি।

জুলে বলিল—মধু, তুমি মলি কেমন হবি?

মধু—ক্যা ফেলায়ে যেন দেন, শিয়াল কুত্যায় খাবি।

জুলে—তা কি ভাল হয়। আমাগেরে চখির পর তোমার শিয়াল শকুনি খাবি।

মধু বলিল—তয় কি কর্‌বের চান?

জুলে—তোমার ভাইগেরে ডা'কে দেব; তারা নিয়ে পোড়ায়ে ফেলাবি।

মধু—না দাদামশায়, আমার পোড়াবেন না। আগুন দেখে বড় ভয় করে। আর গায় ৮০।৯০ মণ ব্যাথা। পোড়ান যেন না। গা'ড়ে গুড়ে যেন থোন।

জুলে—আমরা তোমার গাড়্‌ব কেমন ক'রে। তুমি হলে নমশুদ্দূর। তোমার কেমন করে গাড়া যায়।

মধু—ক্যা গাড়া যাবি নে, কি হইছে। আমি যে তোমাগেরে জুম্বে'র ছিন্নিটিন্নি খাই।

জুলে—তয় আচ্ছা।

মধু বলিল—দাদামশায়, গাড়ে ফেলাবার কলাম বুলে এহে-বারেই গাড়্বেন না। দোম বারানের যো যেন থোন্। এহেবারে গাড়ে ফেল্লে ম'রে ট'রে যাওয়ার ঠ্যাক্ কি ?

জুলে—দোম বারাবার যো থুলি তয় আর গাড়া হয় কেমন ক'রে ? আর শিয়াল টিয়ালে খায়ে ফেলাতি ঠ্যাক কি ?

মধুবলিল—আপনারাও বোঝেন মেয়েমান্সিবির মত। এট্টু ফাঁক থোবেন, যে মানুষটা মাটীর তলে বাচে থাক্'পের পারে। পাঠক, ভাবিয়া দেখিবেন, এই রহস্যের মধ্যেও খুব সূক্ষ্ম কথা আছে।

মধুর বিয়ে, অর্থ আনন্দ। পরমাত্মার সহিত চিরমিলন। বিয়েতে ঢোল বাজে। মধুর বিয়েতে লাগ্‌বে ঢাক্। অর্থাৎ প্রতিমা বিসর্জ্জন হবে। তাই ঢাক চাই। এ দেহের যে অধিষ্ঠাতা তিনি ব্রহ্মে প্রবেশ করেছেন। আর যে মধুকে মাটীতে পুঁতিয়া ফাঁক রাখার কথা, ওটা রহস্য অর্থাৎ আত্মা মৃতদেহে ঘুমায় না। যদি ঘুমাত তবে ফাঁক রাখা চাই; নৈলে বাঁচত না। মৃত্যুর পর, পোড়াও, পোঁত, জলে ফেলে দাও, সব তুল্য। আত্মার তাতে কিছু থাকিয়া যায় না। আর এক কথা। মধু বলিল—আমি তোমাগেরে ছিল্লিডা মিল্লিডা খাই; কিন্তু মধু ইহা বলিল না যে আমি মুসলমান। এই ভেদটুকু বুঝা চাই। ঐটুকু বেদবিদ্যার বিশেষত্ব।

ফাল্গুন মাসে যে মরিবে তাহা অনেক পূর্ব্বে আমাকে বলিয়াছিল। তারপর ১৫ই মাঘ মধুর সহিত আমার শেষ দেখা। ভোরে গেলাম। মধুর জায়গায় লইয়া গেলাম। আমি বলিলাম—মধু কিছু খাবে ? মধু পায়েস আনিতে বলিল। যোগাড় করিতে একটু বিলম্ব হইল। মধু একটা লোকের দ্বারা আমাকে ডাকিয়া পাঠাইল। সে বলিল "বল গিয়া যে ভগেমাল্লী ডাক্‌তেছে।" আমি একটু পরেই

পায়েস লইয়া আসিলাম। মধু খাইয়া বলিল—দুধ হবে বেশী, চিনি চা'ল হবে অল্প, সেই পায়েস ভাল হয়। এ ভাল হয় নাই। এ সব মধুর পরীক্ষা অর্থাৎ সত্ত্বগুণ কম। খাওয়ার পর বাহ্যে গেল। তা নিকটে যাবে না। আমাকে বলিল—বাবু, আমাকে ধরিয়া লইয়া চলেন। আমি ধরিয়া উঠাইলাম। প্রায় একরশি দূরে বসাইয়া দিয়া আসিলাম। মধু বলিল—আপনি যান; আমি সরিয়া আসিলাম।

মধুবলিল—আপনি বাড়ী যান। আমার দেরি হবে। আমি হাম্‌কুর পা'রে যাবনে। আপনি যান। আমি বলিলাম—আমি আছি; দেরি হউক, তোমাকে রাখিয়া যাইব। আমার কোন কায নাই। পরে মধু ডাকিল, বাবু। আমি ধরিয়া আবার তাহার জায়গায় আনিলাম। কি ভয়ানক কষ্টই পাইতেছে। অষ্টপ্রহর তীব্র জ্বর। ফুসফুস পচিয়া যাইতেছে; রৌদ্র হিম ধূলা ভোগ করিতেছে। তাতে এই পরিশ্রম। কিন্তু বীরের মত সব সহ্য করিতেছে। অমন মারাত্মক রোগ—সাক্ষাৎ যম; তাহার কাছেও কাতর নয়। এমন অখণ্ড পূর্ণ পুরুষকার আমি কখন দেখি নাই। বীরত্বের ইতিহাসে এ চরিত্র কাহার অপেক্ষা ন্যূন, তাহা আমি জানি না। বাস্তবিকই, মানুষ শক্তি লইয়া জন্মে। শক্তি কেহ দিতে পারে না। সাধনা মহাশক্তির কায। সহস্রের মধ্যে কাহারো সাধন শক্তি দেখা যায়। আমার ব্যর্থ জীবন সর্ব্বথা ব্যর্থ হইল। মধু বলেছিল তার সঙ্গ করিতে। সঙ্গেই সব হয়। সত্যই আমার কপাল বড় মন্দ। তাই মধুর এত চেষ্টা সত্ত্বেও সঙ্গ ঘটিল না। ভাগবতে আছে—

যথোপাশ্রয়মানস্য ভগবন্তং বিভাবসুং
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা।

যেমন আগুনের কাছে বসিলে শীতভয় ও অন্ধকার দূর হয় তেমনি সাধু সঙ্গে "হচ্চে হবে" এই কর্ম্মজড়তা দূর হয়। আগুনের কাছে থাকলে গায়ের কাপড় টেনে ফেলে দিতে হয়। সঙ্গে মহতের শক্তি শরীরে প্রবেশ করে। সংসারভয়ও তার কম হয়; অজ্ঞানান্ধকার দূর হয়। সঙ্গই সব; সুসঙ্গ আর কুসঙ্গ। সঙ্গেই মানুষ গড়ে;—এক মানুষে লক্ষ লক্ষ মানুষ গড়ে, এমন মানুষও সংসারে আসে।

এই দিন বেলা ২ টার সময় আমি বাড়ী হইতে রওয়ানা হইলাম। কিশোরী আমার সঙ্গে সঙ্গে হাট পর্য্যন্ত আসিল। আমরা মধুর নিকট দাঁড়াইলাম। মধু জাগিয়া আছে। আমি বলিলাম—মধু আমি রওয়ানা হইয়াছি। তোমার সহিত আর ইহলোকে দেখা হইবে না। মধু আশ্বাস দিল; বলিল—"ভয় নাই।" কিশোরী বলিল মধু বড় কষ্ট হইতেছে। মধু বলিল—"হেঁ, এসব মিছা।" অর্থাৎ এসব দেহের কষ্ট। দেহটা মিছা। আত্মার দুঃখ নাই। এই মধুর শেষ কথা আমি স্বকর্ণে শুনিয়া আসিলাম। বাসায় তত্ত্ব তালাসের লোক ছিল না; এ জন্য ব্যস্ত হইয়া বলিলাম—মধু বেলা যায়, আমি আসি। মধু বলিল—"আচ্ছা আসেন্‌গা; যান ই আর থাকেন ই, আমি যতদিন আছি কোন ভাবনা নাই।" এ সংসারে মধুর সহিত মিলন স্বপ্নের ন্যায় সারা পথ ভাবিতে ভাবিতে আসিলাম। বাবা বলিতেন—কোন মঙ্গলময় হস্ত আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করে। এই সেই মঙ্গলময় হস্ত। এ গ্রামে আমাদের স্বজাতি নাই, অন্য ভদ্রলোক নাই, তাই অনেক দিন হইতে আমরা গ্রাম ত্যাগ করিবার কল্পনা করিতেছিলাম।

মধু বলিল—ক্যা থাহা যাবি না ক্যা, কি হইছে? আপনাগেরে

এহান থে যাবার দেলাম না ; তয় রক্ষা মক্কাডা করবি কেডা ? আমার ভাত মাত দিবি কেডা ? আহা, যাঁকে আগে খাওয়াইয়া খাইতে হয় তিনি ভাত চেয়ে খান। আমার ছোট ভাইকে মধুর ফেন পথ্য দিতে বলিয়া আসিলাম। বাসায় আসিয়া কয়েকদিন পরে বাড়ীর পত্রে জানিলাম ৯ই ফাল্গুন মধুর মৃত্যু হই-য়াছে। মধুর নিজের মৃত্যুর কথা দুই বৎসর পূর্ব্বেই আমাকে বলিয়াছিল—বাবু, ফাল্গুন মাসে আমার সব দুক্কু চলে যাবি। ঠিক ফাল্গুনেই মরিল। মধুর দেহত্যাগের সংবাদে কিরূপ কষ্ট অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা আমার তৎকালের ডায়েরী হইতে লিখিত কয়েক লাইন পড়িলে বুঝা যাইবে।

২৭।২।০৭।

এই মাত্র সুরেনের (কনিষ্ঠ ভ্রাতার) পত্র পাইলাম। ৯ই ফাল্গুন ভোরে মধুর মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাহার ভায়েরা আসিয়াছিল। শেষ মুহূর্ত্তেও তাহার জ্ঞান ছিল। সে জন্মস্থান এত ভালবাসিত যে অন্নের কষ্ট পাইয়াও রাজসাহীতে আসিতে সম্মত হইত না।

যে লোক বলেছিল "এসব মিছা ; দুই দেবতা মানি—গাং ও কোদাল," সে লোক শাক্যসিংহ হইতে কম কিসে জানি না। আমার পরম বন্ধুর অভাব হইল। এমন লোক দেখি নাই, হয়ত আর দেখিবও না।

মধুর মৃত্যুসংবাদ পাইয়া স্কুলে আসিলাম। আসিয়া মনে হইল—সবাই বলে ধনের চেষ্টা কর, মানের চেষ্টা কর। কেবল একজন দেখা হইলেই বলিত—এ সব মিছা, এ সব ছাড়িয়া হরিনাম কর। তাকে আজ হারাইলাম। এ সংসারে এক মধু আমাকে এ কথা বলিত। কত উৎসাহ দিত, কত উপদেশ দিত। তার অমর ভাষায়

কত বুঝাইত। ছেলে অপেক্ষাও সে আমাকে অধিক ভালবাসিত। কিন্তু আমি এমনি অকৃতী তাকে একবেলা পেট ভরিয়া দুটি ভাত খাইতে দিতে পারি নাই। পচা পান্তাভাত নুন মরিচ চেয়ে নিয়ে খেয়ে বলিত "ওতেই হবে, এই মহা তপস্যা।" কত ছুতানাতা করিয়া আমাদের বাড়ী আসিয়া বসিত। আমাকে দেখিলে কত সুখী হইত। আমি ত পারিলাম না; সে যা বলেছিল তাত পারিলাম না। শেষে বলেছিল "আসেন গিয়া।" অর্থাৎ সঙ্গ করুন। সঙ্গেই হবে। সাধনের প্রয়োজন হবে না। আমার মায়াপাশ কাটিল না। আমার মহামোহ ঘুচিল না। আমি তাহার কথা বুঝিলাম না; বিশ্বাস করিলাম না।

আর আমায় তেমন করিয়া কে ভালবাসিবে? কে পথ দেখাইবে? ও রাজ্যের আলোক কে আনিয়া দিবে? আর মনের সন্দেহ কে ভাঙ্গিবে? ঈশ্বরের নিকট হইতে সাক্ষাৎ-লব্ধ-জ্ঞান, যাহা বেদ উপনিষৎ ভাগবতে বহু আয়াসেও লাভ হয় না, তাহা সরল ওজস্বিনী ভাষায় প্রকাশ করিয়া হৃদয়ের অন্তঃস্থল আলোকিত করিবে কে? কে আর মনের সংশয় ছিন্ন করিবে? আজ ফাল্গুনের শুক্লানবমী। গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে মধু ও মধুর সৌরভ; ভ্রমরকুল অনাদি দিব্য সঙ্গীত গাইতেছে। বসন্তানিল সুরভি পুষ্পরাশি বর্ষণ করিতেছে। উপরে পরমপবিত্র বিষ্ণুপদ, অনন্তঅসীম অসঙ্গ আকাশ, সম্মুখে অতসী-পুষ্পশ্যামল দিগন্তবিসারী প্রান্তর। প্রকৃতির শ্যামাঙ্গ নবরবিকরের তরল পীতবাস পরিহিত।

আজ মধুর মধুময় প্রাণের মধুময় পথে মধুলোকে যাইবার মধুময় সময়। আজ মধুমান বনস্পতি! মধুমৎপার্থিবং রজঃ। যাও মধু, মধুপতির নিকট—যিনি তোমার মন মধুর উৎস করিয়া দিয়া-

ছিলেন ; তাঁহার আনন্দ নিকেতনে গমন কর,—যেখানে ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই, শীতাতপ নাই, আধিব্যাধি নাই, পাপপুণ্য নাই ; যেখানে সবল দুর্ব্বলকে পীড়ন করে না, সহোদর সহোদরকে ধনের জন্য বাঁধিয়া মারে না ; ক্ষুধার্ত্ত গৃহাগত অন্নার্থীঅতিথিকে গৃহস্থ ফিরায় না। যাও মধু সেই দেশে যথায় চিরসুখ বিরাজ করে। তোমার অজভাগ আজ নিত্য অনন্ত অক্ষরব্রহ্মে গমন করিয়াছে ; আর তোমার এই নশ্বর দেহ সংসারপথে বীর শয়নে শয়ান। এই কর্ম্মক্ষেত্র মহামরুভূমি ; তুমি ইহাতে দেহ খনিত্রে জ্ঞানবাপী খনন করিয়া অমৃত পান করিয়া অপিপাস, অমৃত ও অক্ষিত হইয়াছ। হে বীর, কত অনাহার, কত শীতাতপ, কত বাতবৃষ্টি, কত স্বজনের প্রহার যে তোমার এই ব্যাধিক্ষীণআয়ত দেহের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহা কে জানে ? আকাশও বর্ষায় মেঘাছন্ন হয়। সাগরও বায়ুবেগে সংক্ষুব্ধ ও তরঙ্গায়িত হয়। কিন্তু তোমার মুখ সদা প্রফুল্ল—সুখ দুঃখে সমান ; লাভ ও অলাভে সমান ; রোগে ও স্বাস্থ্যে সমান। তোমার জন্য পিতা পুত্রকে শিক্ষার জন্য তাড়না করিতে পারিত না। বালকেরা জীবজন্তুকে ক্লেশ দিতে পারিত না। পল্লীর কুলবধূরা তোমার সহিত অসংকোচে আলাপ করিত। যে জীবমাত্রেরই কল্যাণ চেষ্টা করিত, এই দেহের সেই অধিপতি চিরদিনের তরে প্রয়ান করিয়াছে। তোমার শক্তি ও সামর্থ্য কে বুঝিবে ? এই প্রার্থনা যেন আমাকে ভুলিও না। বাবা আর দেখা দেন না। তুমিও যেন তেমন হইও না। এখনও আশা করি ; কারণ তোমরাই আশ্বাস দিয়াছ। সেই অমরলোক হইতেই যেন তোমার মধুময় সঙ্গ লাভ করিতে পারি। হে অহৈতুক বন্ধু, হে স্বপ্রকাশ সখা, তুমি যদি দয়া করিয়া না জানাইতে তবে কি তোমাকে জানিতে পারি-

তাম? তোমার করুণার সীমা নাই, মূল্য নাই। আশীর্ব্বাদ করিও, আমিও যেন চিরদিন তোমারই থাকি। সংসার যে অসত্য তাহা তোমার মুখেই প্রকৃতভাবে শুনিয়াছি। তোমার শেষ উপদেশ যেন ফল প্রসব করে। সংসারের ত সব পীঠ দেখিলাম। কোথায় সুখ? তুমি বলিয়াছিলে—"এখানে সুখ নাই। এক স্থানে সুখ আছে। কিন্তু কেহ সেখানে যাইতে চায় না।" আমাকে সেই স্থানে যেন লইয়া যাইও। তুমি বলিয়াছিলে—"আমার যা আছে তা সব আপনাকেই দিয়া যাইব।" লোকে শুনিয়া হাসিত। তুমি কিন্তু দাতা। আমাকে বহু ধন দান করিয়াছ। এমন কি ভালবাসিয়া তুমি আমাকে যে অমূল্য ধন দান করিয়াছ, আমি তাহার শতাংশেরও অনুপযুক্ত। তোমার বড় ইচ্ছা ছিল যে আমার মনুষ্যজীবন যাহাতে কৃতার্থ হয়, তাহা করিয়া ও দেখিয়া যাও। আমি ভাগ্যহীন কাপুরুষ। বীর-লভ্য ধনের আমি কি করিয়া অধিকারী হইব? ইহা পার্থিব ধন নহে যে ভরা ভরিয়া গৃহে তুলিব। ইহা অপার্থিব ধন,—সাধনের ধন। আমার মত হীনজন ইহা কিরূপে পাইবে? এই ভিক্ষা প্রভু যেন তোমার প্রদর্শিত পথ ত্যাগ না করি। যদি সে মন্দির নাও পাই, তবুও যেন তোমার ন্যায় আমার দেহ সেই দেশের পথের পার্শ্বে পড়িয়া ইহলোক ত্যাগ করে।

যে হাটের উপর মধু থাকিত তাহার পশ্চিমে একটি কাঁঠাল গাছ আছে। তথায় হিন্দু মুসলমান মধুর দেহের সমাধি দিয়াছিল। সম্বৎসর চলিয়া গিয়াছে। পঞ্চভূতের শরীর পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে। তাহার আর কোন চিহ্ন নাই। সকলেই মনে করিবেন মধুর এই শেষ। তাহা নহে। মধুর জীবনের শেষ অংশই অতি আশ্চর্য্য।

সাধন।

ছেলে পিলে নিয়ে আমরা দশজন। এক ঘরে থাকি। বড় কষ্ট; শুইবারই স্থান হয় না। গত (১৭ই জানুয়ারী) ৩১শে মাঘ আমি বাহির বাড়ীর ঘরে একা শুইতে আরম্ভ করিলাম। "সংসারে যা হইবার হইয়াছে, তবে গুরুবাক্য কেন লঙ্ঘন করি" ভাবিয়া বাহিরে গেলাম। ২।৩ রাত্রি শুইলাম। কিন্তু শেষে ভাল বোধ হইল না। আবার বাড়ীর ভিতর আসিব এইরূপ ভাবিতেছিলাম। এই সময়ে আমি নিত্য উপাসনা খুব ভক্তির সহিত করিতাম। বসন্তের শোভায় মন বড় প্রফুল্ল, আবার কেন যেন বড় বিষণ্ণ। এই সময় একদিন মনে হলো—বসা ছেলে শোয় না। হাঁটা ছেলে বসে না। ছেলে যখন হাঁটিতে শিখে তখন পড়ে মরে জ্ঞান থাকে না। এক দৌড়ের উপর থাকে যেন তখন উড়ে যেতে চায়। আর তার আনন্দ ধরে না। স্বশক্তির বিকাশ ও চরিতার্থতায় যে আনন্দ, তা আমি শিশুর মুখে চক্ষু ভরিয়া দেখি। শিশু যখন হাঁটি হাঁটি করে কিন্তু হাঁটিতে পারে না, তখন যদি কেহ তাহার হাত দুখানি ধরে তবে সে হাত ছাড়াইয়া লইয়া নিজে ধরে এবং নাচিয়া ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলে। সে দাঁড়াতে পারে, নিজের পায়ের বলে নিজে দাঁড়াতে পারে এই অনুভবে এত আনন্দিত হয় যে সে আর স্থির থাকিতে পারে না। এই আনন্দের সময় কোলে করিলে এমন ঝাঁকি দেয় যে দুর্ব্বলের পক্ষে তাকে কোলে করে রাখা কঠিন। নিজ শক্তির উপলব্ধি, বিকাশ ও প্রয়োগে কত সুখ। শিশু তিল তিল চেষ্টা করিয়া সে শক্তি অনুশীলন করিয়াছে বলিয়া এত সুখ। প্রথম চিৎ, তার পর উপুর, তার পর কৈমাছের মত

সামনে এগোনো। তারপর বসা, তারপর হামাগুড়ি, তারপর দাঁড়ান। যখন চিৎ হইয়া থাকে, তখন নিরন্তর হাত পা ছোড়ে। কোন অবস্থায় ক্ষণকাল নিশ্চেষ্ট থাকেনা। চেষ্টাই উন্নতির মূল। প্রকৃতি চেষ্টা করায়; প্রকৃতি নিশ্চেষ্ট থাকিতে দেয় না। নিশ্চেষ্টতা মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ। যেখানে প্রচ্ছন্ন শক্তি আছে সেখানেই এইরূপে প্রকৃতিই তাহার পুষ্টি ও বিকাশ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ দেয়। কর্ম্মে আনন্দ না থাকিলে সৃষ্টির বিনাশ হইত।

কাল মনে হইল ঈশ্বরলাভের শক্তি কি সত্য সত্যই মনের আছে? আজ বিশ বৎসর ধরিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি; কৈ, লাভ হইল কৈ? যাহা সত্য তাহা এত আয়াসলভ্য হইবে কেন? তাহা প্রকৃতি ফুটায় না কেন? শিশুর আনন্দের মত কর্ম্মের আনুসঙ্গিক আনন্দ হয় না কেন? সব শিশুই দাঁড়ায়, কথা কয়; সব মানুষই বা তাঁকে কেন পায় না? প্রকৃতি চেষ্টা করায় না কেন? নাম যদি উপায় হয়, নাম বলায় না কেন? উপাসনা যদি উপায় হয়, তবে উপাসনা নিত্য সরস হয় না কেন? ব্যাকুলতা যদি উপায় হয়, তবে ব্যাকুলতা আসে না কেন? চক্ষুর জল যদি অকপট প্রার্থনা হয় তবে চক্ষুর জল পড়ে না কেন? ইহার শাস্ত্রের উত্তর জানি—বড় নীরস নির্ম্মম কথা। কর্ম্ম আর প্রাক্তন; অনাদি বাসনা আর অজ্ঞান। ইহার উপরেও একটা কথা আছে। সেটি ঈশ্বরেচ্ছা। তা বুঝিনা কিন্তু দেখি; ভাল ক'রে দেখি না কিন্তু দেখি, আব্‌ছা আব্‌ছা (অভ্রচ্ছায়া)। এইখানে আশা নিরাশা মিশে থাকে। আলো আঁধার জড়িয়ে থাকে। সুখে দুঃখ ও দুঃখে সুখ মিশে থাকে; ইহার একদিক সন্ধ্যা, একদিক উষা। এই খানে জ্ঞান অজ্ঞান মারামারি করে। এইখানেই জীবন মরণের মধ্য বিন্দু। এখানে দেখি মানুষ পুতুল, শক্তি শক্তিহীন,

প্রকৃতি নিষ্ক্রিয়া; এখানে এক তুমি। তমসো মা জ্যোতির্গময় আবিরাবির্ম্মএধি। ওঁ।

পরদিন মধুকে স্মরণ করিয়া একটি পদ্য লিখি। তাহার কয়েক লাইন উদ্ধৃত করিলাম। পদ্যটি প্রাতঃকালে দয়েলের গান শুনিয়া আরম্ভ করি। শেষটা মধুর বিষয়ে হইয়া গেল।

২২।২।০৮।

কতকাল আর রব এই ভাবে
কৃপা ক'রে আমায় কেবা উদ্ধারিবে।
যারা বাসে ভাল সবাই চলে গেল
তোমার আশায় পাখী জীবন রাখি।

স্বর্গ হতে পাখী অমৃত আনিতে
অনাহারে থেকে সুধা খাওয়াইতে।
পক্ষপুটে ঢাকি বুকেতে রাখিতে
অকারণ বন্ধু তুমি হে পাখী॥

২৩।২।০৮।

ইহার পরদিন ভোরে স্বপ্ন দেখিলাম। একটি দালান, পশ্চিম দ্বারী। কে একজন মোড়ায় বসে আছে। শেষ বেলা। এমন সময় হরিশ পণ্ডিত মহাশয় উপস্থিত। তাঁহার পেন্‌সান্ হইয়াছে। আজ হইতে যেন স্কুল হইতে বিদায় হইলেন। একটি ছেলে প্রণাম করিল। আমিও প্রণাম করিয়া বলিলাম—আপনার নিকট যাহা শিখিয়াছি তাহার মূল্য নাই। আপনার ঋণের প্রতিদান নাই। আমি প্রণাম করিয়া উঠিলে তিনি পূর্ব্ব মুখ হইয়া প্রণাম করিলেন। আমি মনে মনে ভাবিলাম ইনি কাহাকে প্রণাম করিতেছেন? কর্ম্মক্ষেত্রে স্কুল

হইতে বিদায় লইতেছেন, হয়ত তাহাকেই প্রণাম করিতেছেন। এমন সময় দেখি তিনি মাটিতে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। চক্ষু দুটি ব্যাকুল যেন আসন্ন কাল। আমি ডাকিলাম—সকলে এস ; দেখ ইঁহার কি হইল। আমি ধরিয়া উঠাইলাম ; তখন বলিলেন "সাহস পাই না।" ইহার অর্থ বুঝিলাম না। মনে হইল বোধ হয় ইহা মধুর কাণ্ড।

২৫।২।০৮। স্বপ্ন।

একটি ছোট খাল তাতে জল আছে। নৌকা চলে। কত নৌকা; ওপারে একটা ষ্টেসন। আমার বাড়ী যেতে হবে। ছোট ভাইটিকেও যেন নিয়ে যেতে হবে। খালের কাছে গিয়া দেখি জল নাই। হাঁটিয়া ওপারে গেলাম। উপরে উঠিলেই একটি বাবু বলিলেন "আপনি কোথা যান?" আমি বলিলাম "টিকিট কিনিতে যাই।" তিনি বলিলেন "আপনাকে যাইতে দিব না। সাহেবের হুকুম।" দূরে একজন সাহেব দেখিলাম। আমি বলিলাম "কেন?" তিনি বলিলেন "সাহেবের অনেক জিনিষ পত্র আছে।" আমি বলিলাম "থাকুক।" তিনি বলিলেন "না, আপনাকে কিছুতেই যাইতে দিব না।" আমি "দূর শালা" বলিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলাম। তন্দ্রা আর নাই। কথাটি এই—দেশের কথা আর ভাবিব না। Morley (মর্লী) আর Minto (মিণ্টো) সুরেন্দ্র আর ভূপেন্দ্র আর করিব না। ওরাই আমার টিকিট কিনিতে দিতেছে না। নৈলে খাল পার হয়ে টিকিট পাই না? যার গুরু দর্শন হয়েছে, সে খাল পার হয়েছে। সংসারের লোক খাল পার হতে পারে না। তাদের বাড়ীও নাই। মাও নাই। তারা টিকিট কিনিতে ব্যগ্রও নয়। বরাবর রেলপথ যে পাতা আছে তাও জানে না। সবই তাঁর ইচ্ছা।

পূর্ব্ব স্বপ্নের অর্থ এখন বুঝিলাম। হরিশ পণ্ডিত মহাশয় পৌত্রের

জন্য পর্য্যন্ত খাটিয়া মারিয়া গেলেন। তোমারও তাঁহা অপেক্ষা বেশী সুখের আশা কি ? অতএব সংসারের ব্যাপার ছড়িয়া সাধন করিতে সাহস পাও। হয়ত মরণ নিকটও হইতে পারে।

২৮।২।০৮। স্বপ্ন। কে বলিল তোর একটা Cancer (ক্ষত) হইয়াছে, ওটা কাটাস্ না ? মনের ব্যাধিই Cancer ; বাড়ীর মধ্যে ফিরে যেওনা ইহাই ব্যক্তব্য।

২৯।২।০৮। স্বপ্ন।

যেন সব জলে জল হয়ে গেছে। রাস্তার উপর দিয়া বেগে স্রোত বহিতেছে। আমি আর ছোট দাদা এক নৌকায় যাইতেছি। পাল তুলিয়া পথের উপর দিয়া বেগে নৌকা উজাইয়া যাইতেছে। এক জায়গায় জল ঢালিয়া পড়িতেছে। আধ হাঁটু জল। লোক হাঁটিয়াও যাইতেছে। এত অল্প জল অথচ অত বেগ—চাঁচড়ার মত। ওর উপর দিয়া নৌকা যাবে ? মাঝি বলিল—হাঁ যাবে। দেখিতে দেখিতে নৌকা তার উপর দিয়া চলিয়া গেল। আমারা পরে ফিরে এলাম। আমি হাঁটিয়া আসিলাম। পরে এক বোর্ডিংএ আসিলাম। যদু বাবু (একজন শিক্ষক) অনেকটা পায়েস খাইতে দিলেন। পায়েস মধুর কথা। ব্রাহ্মণ পায়েস দিতেছেন—সুস্বপ্ন। ইহার অর্থ ভক্তি, আনন্দ বা সত্ত্বগুণ হবে।

১।৩।০৮। স্বপ্ন।

রবিবার রাত্রি ২টা। জপ ভাল লাগিতেছে না দেখিয়া শুইলাম। আমি স্বপ্ন দেখিলাম কলিকাতার ন্যায় একটা প্রকাণ্ড নগর। বড় বড় পথ, লোকে লোকারণ্য। কেহ যাইতেছে, কেহ আসিতেছে। জনস্রোত চলিতেছে। আমিও যাইতেছি। অনেক হাঁটিয়া ক্রমে

উত্তরদিকে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। নিকটেই সমুদ্রের জলরাশি দেখা যাইতেছে। তিন জন লোক অনেক দূর হইতে আমার সঙ্গ লইয়াছে। ইহাদের আকার কালাঞ্জরের গোয়ালাদের মত বলিষ্ঠ। তার মধ্যে একজন খুব দীর্ঘ ও খুব বলবান। ইহাদের কাণের জুল্পী দুইটা গাল পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। আমার ঘড়ির পকেটে আলগা অনেকগুলি টাকা। উহাদের আকার ঈঙ্গিত ও পরস্পরের মধ্যে কথার ভাবে বুঝিয়াছি যে উহারা দস্যু; আমার টাকাগুলি কাড়িয়া লইবে। কি করিব, আমি একা। বড় বিষণ্ণ ও উদ্বিগ্ন মনে হাঁটিতেছি। তারাও আমাকে লক্ষ্য রাখিয়া একটু দূরে দূরে আসি-তেছে। অবশেষে নগরের প্রান্তভাগে আসিলাম। আমার নিকট একজন অপরিচিত ভদ্র লোক; তাঁহার মাথায় একটা ছাতা। আর লোক জন নিকটে ছিল না। দস্যুগণ এইটা সুযোগ মনে করিয়া আমার দিকে আসিতে লাগিল। আমি একবার মনে করিলাম টাকা-গুলি কোঁচায় বাঁধি। কিন্তু পরক্ষণেই দেখিলাম সে সময় নাই। উহারা সতৃষ্ণ উগ্র দৃষ্টিতে আসিতেছে। তখন আমি ভদ্র লোকটির হাত ধরিলাম এবং বলিলাম—মহাশয়, এরা আমার টাকাকড়ি কাড়িয়া লইতে আসিতেছে। আপনি রক্ষা করুন। পুলীশ ডাকুন। তিনি পাহাড়াওয়ালা পাহাড়াওয়ালা বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেখানে পাহাড়াওয়ালা ছিল না। ইহা দেখিয়া দস্যুগণ দ্রুত আসিতে লাগিল। আমি বলিলাম—রমাপ্রসাদ বাবুকে ডাকুন। তখন আমরা তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলাম। দস্যুরা মনে করিল ইহাদের কোন আত্মীয় এই সব বাড়ীর কোনটায় গিয়াছে। ইহা মনে করিয়া তাহারা তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। আমি জাগিলাম। দেখি আমার বুক ধরফর করিতেছে।

অর্থ "গুরুদত্ত রত্ন তোড়া বাঁধরে যতনে কসে।" মন্ত্র পাইলে সাধিতে বসে যেতে হয়। নৈলে সংসারদস্যুরা কেড়ে নেয়।

৩।৩।০৮। স্বপ্ন।

যেন একখানি বজ্‌রা। তাতে Livingstone (লিভিংষ্টোন্) সাহেব। আমি সেখানে একটু মাংস খাইলাম। যেন fowl (মুর্‌গী) এর মাংস। বেশ লাগিল। খুব সুরস। সাহেব বলিলেন—তোমার মাংস খাওয়া দরকার। তুমি সাত দিনেই বেশ ফল বুঝিতে পারিবে। মাংস বলকর। হরিনামও বলকর। মধু হরিনামকেই মাংস বলিত। ভাত, পান্তা ভাতও হরিনাম।

৫।৩।০৮। স্বপ্ন।

একটি প্রশস্ত দীর্ঘ পথ। তার উপর এক জায়গায় কতকগুলি বড় বড় বাক্‌স। লম্বা দড়ি দিয়া এক সঙ্গে বাঁধা আছে। কে যেন বলিল—এগুলি তোমাকে লইয়া যাইতে হইবে। একটা বাক্‌স একেবারে শেষে বড় গাদার সহিত দড়ি দিয়া যোগ করা। সেখানে একজন জোয়ান ছোক্‌রা খাটিয়া পাড়িয়া রাস্তায়ই বসিয়াছিল। নিকটে একটা গর্ত্ত। সে বলিল এই বাক্সটা গর্ত্তে ফেলিয়া দি। কিন্তু কে যেন বলিল—না, তা হলে তুল্‌তে আবার কষ্ট হবে। ঐ নিয়ে যাবে। অর্থাৎ বাক্‌সগুলি সঞ্চিত প্রারব্ধ। শেষেরটা বোধ হয় অনভ্যুপগত। ওদের নাশ করিতে হইবে। দড়ি পূর্ব্ব জন্মের ব্যবধান। যার প্রারব্ধ, যার কর্ম্ম, তাকেই তার ক্ষয় করিতে হইবে। খালটা নিম্ন যোনি,—ইতর যোনি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমি ইতর যোনি প্রাপক। যে সব পাপ করিয়াছি, মধু তাহা সব জানে। এই সব স্বপ্ন দেখিয়া আমি বুঝিলাম যে এ মধুর কথা। ভাবী জন্মের জন্য বড় ভয় হইল। "ইহচেদবেদীৎ অথসত্যমস্তি নচে-

দিহাবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ। নৃদেহমাৎ স্থলভং সুদুর্ল্লভং। প্লবং স্থকল্পং গুরুকর্ণধারং, ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা।" এই সব কথা মনে করিল।

জপ আরম্ভ।

৩।৩।০৮।

৬।৩।০৮। সাত দিনের জপ আরম্ভ করিলাম। আজ চতুর্থ দিন। ৩রা হতে জপ আরম্ভ। ছুটি থাকায় দিবারাত্র জপ। ২।৩ ঘণ্টা ঘুম হয়। অনিদ্রায় বাত প্রধান শরীর হইল। Heart বেশী beat (হৃদ্পিণ্ড স্পন্দন) করিতে লাগিল। তখন একটু ভয় হইল। আমি রাত্রে খাইয়া আসিয়া দক্ষিণে শিয়র দিয়া শুইয়া পড়িলাম। ঘরে আলো আছে। ঘরের চালের উত্তর কোণে দেখি যেন একটা ছোট পর্ব্বত। তাতে ঘন সবুজ বন। মধ্যস্থানে অর্থাৎ শিখরে ছোট একটি গণেশের মূর্ত্তি। অতি উজ্জ্বল। ইহার পরই বনগুলি খুব ফুলিয়া উঠিল এবং গণেশ-মূর্ত্তি ডুবিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি জাগরিত অবস্থায় সিদ্ধিদাতার মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত ও আশ্বস্ত হইলাম। তাঁহাকে উদ্দেশে প্রণাম করিলাম। আশা হইল নিশ্চয়ই সিদ্ধি হইবে। এ জীবনে গণেশকে কখন স্মরণ করি নাই। ওটা একটা বিকট কল্পনা মনে করিতাম। আজ মনে করিলাম একি? যা কেবল কল্পনা, সত্য নহে, তা আসবে কেন? মধু সিদ্ধ। সিদ্ধদিগের কি দেবতার উপর কর্ত্তৃত্ব আছে? যাই হউক, আমার ধারণা হইল আমি হিন্দুকুলে জন্মিয়াছি; বিশ্বাস যাই হউক। এরূপ ক্রিয়া করিলে যার পর যা হয়, তা হবেই। সুতরাং গণেশ কল্পনা মনে হইল না এবং বাস্তবিক আশ্বস্ত ও উৎসাহিত হইলাম। আর মধু যে সব মূর্ত্তি দেখাইয়াছে তা ছায়ার

মত; আর এ অতি উজ্জ্বল লাবণ্যময় মূর্ত্তি, যেমন আমরা গড়ি। সুতরাং এ যে প্রকৃত দেবমূর্ত্তি সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। ১২টা হতে ৩টা পর্য্যন্ত জপ। ৩টার সময় শিয়াল ডাকিল! তন্দ্রা আসিল; কে যেন বলিল "না-আ-আ" অর্থাৎ ঘুমাইও না। পরে বুঝিয়াছি এসব মধুর কায। যত কিছু সবই তার কায। ঘুম ভাঙ্গিল। আবার পরে তন্দ্রা আসিল। তখন হৃৎপিণ্ড হইতে ভ্রমরের শব্দের ন্যায় একটা শব্দ হইল। তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। ভোরে আবার ঐ পূর্ব্বের দস্যুর স্বপ্নের ন্যায় একটা স্বপ্ন দেখিলাম। কিছু নুতন আছে—অত লিখিবার প্রয়োজন নাই। মধ্য রাত্রিতে একটি সুন্দরী সুবেশা স্ত্রী দেখিলাম। পুঁঠিয়ার ব্রজেন্দ্র সেন মহাশয় যেন বেশ সুস্থ; তিনি আমাকে দেখিয়া হাসিতেছেন। তিনি হয়ত দীর্ঘকাল বাঁচিবেন আর তাঁর একনিষ্ঠ কৃষ্ণানুরাগ ঠিক আছে। এই সব দেখিয়া আমি বড় বিরক্ত হইলাম। আমি জানি তন্ত্রপথেই বিভীষিকা আছে। হরিনাম বৈষ্ণব পথ; এ পথে কিছুই নাই। তবে এমন হয় কেন? পূর্ব্ববারেও হইয়াছিল। মধু বলিয়াছিল,—"ভয় নাই, আমি আছি। সাপেরও মা বাঘেরও মা।" এ যে nerve (স্নায়ু) এর দোষ তা নয়। তবে তন্দ্রা ভেঙ্গে যায় কেন? অনিদ্রার পর গাঢ় নিদ্রা হইবার কথা কিন্তু ঘুমাইতেই দিবে না। এ মধুর কায। যেমন শিশুর ঘুম ভাঙ্গাইতে মা আগে বুঝান; কিন্তু তাতে যদি ঘুম না ভাঙ্গে, তখন বলেন ঐ দেখ কত বড় শিয়াল আসিয়াছে। এ ঠিক তাই। মনের এমন tension (টান্ টান্ অবস্থা) হইয়াছে যে ভিতর হইতে যা দেখাবে তাই দেখ্‌বে। বাহিরের দৃশ্যই চক্ষুতে লাগিয়া থাকে; দীপশিখা দেখ, চক্ষু সরালেও দীপশিখাই চক্ষুতে লাগিয়া আছে। এইরূপ জপ আমি ৩রা মার্চ্চ হইতে ২৯শে মে পর্য্যন্ত তিন মাস করিয়াছি; কেবল স্থূলমূর্ত্তি চিন্তা করিয়া। হরি হরি

হরি করিতাম আর একতানে ঐ রূপে মনঃসংযোগের চেষ্টা করিতাম। তিন মাসে, ধ্যান-প্রত্যয়ৈকতানতা, জপকালে চোখে ধোঁয় লেগেই আছে ; ভাবটা এল। ভাবিলাম আমি কি তবে ভুলপথে যাইতেছি ? সকলেই বলেন ঈশ্বর লাভ করিতে হইলে দিনকতক সাধন ভজন করা চাই। এই সাধন ভজন ? আমি ইহার বিশেষত্ব দেখি না। নিত্য উপাসনাই ত বেশ। তাতে খুব সুখ। এ যেন এক অজ্ঞাত পথ ধরিয়া যাইতেছি। আনন্দ নাই, কর্ত্তব্য ব'লে করে যাওয়া। চোখে জল নাই। আগে কত কাঁদিতাম, কত সুখ হইত। উপাসনার পর গীতার দুর্জ্ঞেয় অর্থ পরিস্ফুট হইত। রামপ্রসাদের গানের কত প্রকৃত মধুর অর্থ—সাধকের প্রাণের অর্থ—বুঝিয়া আনন্দিত হইতাম। এ কি করিলে মা ? মা নামটা আমার খুব মুখে আসে। হাজার হউক আমরা শাক্ত বংশ। আমি রামপ্রসাদের সমরবিষয়ক গান গাইতাম। আমি গানে মহামূর্খ ; না আছে স্বর, না আছে সুর বোধ। তবুও রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের গান আমার বড় ভাল লাগিত। আমি গাইতাম—

কবি রামপ্রসাদে ভাষে রক্ষা কর নিজদাসে
যে জন একান্ত ত্রাসে মা বলেছে
তার অপরাধ ক্ষমা যদি না করিবে শ্যামা
তবে গো তোমায় উমা মা বলিবে কে ?

আমি যখন চক্ষুর জলে ভিজিয়া প্রাণের মধ্যে হইতে "মা বলিবে কে" উচ্চৈঃস্বরে বলিতাম, তখন আমার শরীর কণ্টকিত হইত। কোথা আছি ভুলে যেতাম। কে কি ভাব্‌চে বা বল্‌চে মনেও আস্‌ত না। বাড়ীর লোকেরা ভীত হ'তো। উপাসনার পর চক্ষু মুছিয়া যখন বাহিরে আসিতাম, কেহ আমার মুখের দিকে তাকাইতে

সাহস পাইত না। কেবল যারা শিশু তারা ভয় ও বিস্ময়মাখান দৃষ্টিতে বাবার মুখের দিকে তাকাইত। ২।১ ঘণ্টা পর যখন আমি আবার সংসারের কায করিতাম, হাসিয়া কথা কহিতাম, আমার ছোট মেয়েটি আঙ্গিনায় ঘুরিয়া বেড়াইত ও ঠিক আমার তৎকালীন স্বর অনুকরণ করিয়া বলিত "মা বলিবে কে?" "মা বলিবে কে?" "মা"র উপর আমি যেমন জোর দিতাম সেও ঠিক সেইরূপ জোর দিত। কখন আমার দিকে তাকাইয়া হাসিত। কখন বলিত "বাবা আপনি অমন কাঁদেন কেন? কি হয়েছে?" আমি বলিতাম "কি আবার হবে মা?" তখন শিশুর সরল স্নেহময় হৃদয়ে বলিত "তবে যে কাঁদেন?" এই সংসারকুসুমেরা এইরূপে অনেক সময় স্নেহের অশ্রুশিশিরে ভিজিতে থাকে ও ভিজায়।

৮।৩।০৮।

আর একদিন বসিয়া আছি। সন্ধ্যাকাল। চক্ষু বুজিলাম দেখি যেন উষা। আকাশে সূর্য্য নাই। কিন্তু বেশ আলো। সমুদ্রের জলরাশি দিগন্তে ঠেকিয়াছে। জল নীল নয়, শাদা। এক উপকূল দেখা যাইতেছে। তাহা ক্রমনিম্ন; বৃক্ষাদি কিছু নাই। তীরভূমিও দেখিলাম না। একটি ঋষি দীর্ঘকায়, দীর্ঘশ্মশ্রু, শুভ্রবাস। নাভি জলে দাঁড়াইয়া আছেন। আর জনমানব নাই। কোন জীবের সম্বন্ধ নাই,—নীরব, নিথর। এক ঋষি, এক সমুদ্র, শুভ্র বসনখানির কতকটা গায়েও আছে। ক্রমে মূর্ত্তি দূরে গিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

আবার দেখি যেন ক্রমাগত আকাশ হইতে জল প্রপাতের ধারা পড়িতেছে। কিন্তু কোন শব্দ নাই। কোন পর্ব্বতাদি নাই। কখন বা দেখি গঙ্গার স্রোত মাথার উপর দিয়া যাইতেছে। ঠিক জল

স্রোত, প্রবাহশীল। দেখি যেন দেহ হইতে ধোঁয়ার মত কি বাহির হইয়া যাইতেছে। পাপ? যেমন শরৎকালে আঙ্গিনায় শুইয়া দেখা যায়; চাঁদের নীচে মেঘরাশি ছুটিতেছে। ঠিক সেইরূপ ধূমার ন্যায় পদার্থ দেহ হইতে বাহির হইতেছে; এবং চক্ষুর সম্মুখে আমার চক্ষুর একটা জ্যোতি পড়িয়াছে। বেশ দেখা যাইতেছে যে সেই জ্যোতি অতিক্রম করিয়া সেই ধোঁয়াগুলি চলিয়া যাইতেছে।

আবার দেখিলাম যেন রেলে যাইতেছি। অতিদ্রুত মার নিকট যাইতেছি। আর দেশ, জনপদ, পরিচিত লোক, আত্মীয় স্বজন লাইনের পার্শ্বস্থ বৃক্ষের ন্যায় দ্রুত দ্রুত অতিক্রম করিয়া যাইতেছি। একটু তন্দ্রা মত হইলে কে যেন বলিল "দেখচি আপনি পাগল হলেন।" এ সব কি? মধুর কায? আমার ভক্তি পথে এ সব কি?

৯।৩।০৮।

সাতদিন শেষ হইল। রাত্রি জাগিলে আর অসুখ হয় না; একটা আঁট হয়, আবেশ হয়। খুব Tensicn (মনের টান্ টান্ অবস্থায়) এখুব ছাপ বসে। এ তন্ত্র পথ। ভয়ানক পথ। কিন্তু এসে পড়েছি। মধু কাছেই।

২১।৩।০৮। রবিবার।

মৎস্যাদি জলচর যেমন জলে ডুবে আছে, চরাচর পৃথিবী যেমন বায়ুসাগরে ডুবে আছে, মহাব্যোমে নৃত্যশীল রেণুগণের ন্যায় গ্রহনক্ষত্র নীহারিকাসমন্বিত ব্রহ্মাণ্ড যেমন ডুবে আছে, জীবগণও সেইরূপ মায়ার সাগরে ডুবে আছে। খেলা ধূলা করিতেছে, ছুটিতেছে, মারামারি করিতেছে, উঠিতেছে, পড়িতেছে, "আমিও আমার" জলে সব ডুবে আছে। মধুর মত দুই একজন এই মায়ার সংসারে ভাসিয়া বেড়ায়। সমুদ্রে উপকূলে দাঁড়াইলে দেখা যায় কদাচিৎ কখন একখানা

জাহাজ মধ্য সমুদ্র দিয়া চলিয়া যাইতেছে সেইরূপ। আমি ভাবি আমি কেন মায়ানিমগ্নদিগের সহিত মিশে থাকি? আমার জাগিয়া থাকার কথা; আমি কেন ঘুমিয়ে সুখী হব? অন্যে হয় হউক। ভাসিবার যে কৌশল গুরু বলিয়া দিয়াছেন তাহার অনুশীলন কেন করিতেছি না? পারি না। জীব সামান্যে ছাড়ে না। কাল জপের সময় মনে পড়িল সহরে ওলাউঠা লাগিয়াছে। তাতে তোর কি? "চাউল থাক্‌তে মরে না।" মধু। "রক্ষ্যত এব স্বসুঃ" ভাগবত। স্বদেহারম্ভক কারণ থাকিতে কেহ মরিতে পারে না, আবার শেষ হইলে কেহ বাঁচিতে পারে না—যতই যেতে না চাউক। আবার এত ঘুম পায় যে ঝিমাইয়া অমনি ধড়াস্ করিয়া পড়িয়া যাই। কৈ একদিনও ত লাগে না। মা রক্ষা করেন, ঈশ্বর রক্ষা করেন। নৈলে এতদিন নাক চোক একটা যাইত। রামপ্রসাদ বলেছেন—মন তুই আপনি মজিলি আর মহাজনকে মজাইলি। গুরুর ধন লইয়া কারবার। নিজের নাই বা হলো; কিন্তু তাঁকে দুঃখ দেওয়া সয় না। তাঁর অত দয়া, অত আশা ভরসা পণ্ড করিতে কি পারি? সে দয়ার কথা বলা যায় না। অন্য মানুষ তা কখন বুঝ্‌বে না। তা এ সংসারের নিজিষই নয়। হে দেব, তেমন বল দেও যাতে এই দুরন্তপার তমঃ অতিক্রম করিতে পারি—

তমোঽতিতরেম দুরন্তপারম্।

বল দাও বল দাও মোরে। হরি, বল দাও মোরে। মা, বল দাও মোরে।

২৩।৩।০৮।

রাত্রি ৩টা। হরি বলিতে কে যেন বুকের ভিতর হইতে উত্তর দিল—উঁ। এখন বোধ হয় এ মধু। বুকের মধ্য হইতে শব্দ আসিল। আমি বলিলাম—আমার কি হবে? উত্তর—"তাইত, তোর মধ্যে সব

বিপরীত।” আমি বলিলাম—তবে থা’ক্। যা ভাল হয় তাই কর।

বিপরীত অর্থাৎ প্রবল ইচ্ছার প্রয়োজন। বলের প্রয়োজন তা নাই। অনুরাগের প্রয়োজন, তা নাই। বৈরাগ্যের প্রয়োজন, ধৃতির প্রয়োজন, সত্ত্বগুণের প্রয়োজন, তা নাই ; আছে সব বিপরীত।

২৭।৩।০৮।

এখন বুঝিতেছি মধু যা দেখায় তাই দেখি ; তার শক্তি অসাধারণ। কিরূপে এমন হয় বুঝিতে পারি না। আমি ঘুমাই তাই বুঝাইবে যে এ শত্রুকে লাঠি মারিয়া আঙ্গিনা হইতে তাড়াও। রাত্রি ৪টা। দুইটা দৈত্যের মত লাঠিয়ালের মারামারি লাগিয়া গেল। একজন মারিতে মারিতে অপরকে আমার পশ্চিমের বারান্দায় উঠাইল। সে ভয়ানক শব্দ করিয়া মারিতে মারিতে তাহাকে নামাইয়া লইয়া গেল। সে বলিতে লাগিল—মাল্লোরে মাল্লোরে, একেবারে উল্টায়ে ফেলিছে।

স্থূলমূর্ত্তির সহিত মনঃসংযোগ রাখিয়া জপ করিতে হয়। ইহা স্থূলধ্যান। এখন বুঝি।

স্বপ্নে জজের নাজির দুর্গাপ্রসাদ দোবে বলিলেন—নুন দিয়া ভাত খাও। (নুন ভক্তি)। এ মধুর কথা ও কায। দোবে এক শ্লোক দিলেন—

লাভ যোগ জপ ধ্যান পূজন বিল্‌কুল্
সংযোগসম বস্তুর না হয় সমতুল্।

আশ্চর্য্য এই আমার অন্তরের ব্যাপার মধু দেখিতে পায়। যেটি ইচ্ছা হয় সেটি বুঝায়। এ কেমন করে হয়। প্রকৃত জপ করিতে হইলে নাম মূর্ত্তি (রূপ) সংযোগ ও অনুরাগ এই চারিটি চাই।

নাম ভক্তিভাবে পান বিধি। মধু বলে—পীরিতের জন্ম ডাকা। এই সব বিচার হচ্ছিল।

৩০।৩।০৮।

কাল একখানা বড় বড় আঙ্গুল হাত দেখিতে পাইলাম। ধরিতে গেলাম আর নাই। পীঠা খাইলাম (মধুর কাষ) 4, 6 (৪, ৬) দেখিলাম। ঘুমাইলে মধু চোর সাজিয়া দেয়ালের উপর হইতে ভিতর আঙ্গিনায় লাঠী ফেলিয়া মারে। এটি দেখায় ঘুম ভাঙ্গাতে।

২।৫।০৮।

ঐ জপ চলিতেছে। আজ স্বপ্নে কেবল Inclined plane (গড়ানো সমতল ভূমি) দেখিলাম। দেখানের উদ্দেশ্য নীচে নিয়ে যাচ্চে। ভয় দেখাচ্চে—নীচযোনি হবে অযত্নে। স্কুলে গেলাম। শিক্ষকদিগের বসিবার ঘরে যাইবার সময় বুকের ভিতর হইতে বলিল "যাস্ না" আমি দুয়ার পর্য্যন্ত গেলাম। একা বসে Exercise (পরীক্ষার) কাগজ দেখ্‌চি; দেখি উলঙ্গ হয়ে পাতলা বাহ্যে যাচ্চি। অর্থাৎ যা বল তাই কর না। Entrance class (এণ্ট্রান্স্ ক্লাশে) এ Weekly (সাপ্তাহিক) পরীক্ষা। প্রশ্ন দিয়া বসিয়া আছি। কি করবি, খালে যাবি? খুব জোরে জোরে বল্‌চে, আমি সব শুন্‌চি।

৫।৫।০৮।

আবার বাহিরে যে কাজ করা যায় তার ছায়াও মনে দৃঢ় হয়ে বস্‌চে। কাল দুগাড়ী পোয়াল কিনিয়াছি। গণিতে তুলিতে অনেক সময় যায়। রাত্রে দেখিলাম বিচালীর আটি। আর সব দাড়ীওয়ালা মুখ। চক্ষু দুটি এমন হয়ে যায় যে যার ছবি ওর উপর একবার পড়ে তা যেন আট্‌কে যায়।

৬।৫।০৮।

ভোরে তন্দ্রার মধ্যে শুনিলাম কমলাকান্তের গান—

আদর করে হৃদে রেখ আদরিণী শ্যামা মাকে
তুমি দেখ আর আমি দেখি আর যেন ভাই কেউ না দেখে।
কমলাকান্তের মন, শুন ভাই এই নিবেদন,
দরিদ্র পাইলে ধন সে কি অন্যান্তরে রাখে॥

১৬।৫।০৮।

আজ বহুকাল পরে মধুর গলা (কথা) শুনিলাম, আমাকেযেন দূর হতে ডাকিতেছে "বাবু"। কাল রাত্রে একেবারেই ঘুম হয় নাই। রাস্তা লইয়া প্রান্তবাসীর সহিত গোল। কি কর্ত্তব্য ? পরে দেখি এটা আমার ভুল অথবা মার কৃপা।

স্বপ্ন—তস্মাৎ অসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর। আমি এই সব লিখি ; এতে অনেক জপ কম হয়। তাতে মধু বলে, (শুনতেই পাই), "ও পায়েস লেখে," (খায় না) জপের নাম পায়েস খাওয়া। পীরু ব'লে এখানে একটা পাগল আছে। সে পদ্মার ধারে ঝাউতলা থাকে। আমি রাজকুমার বাবু (সরকার) ও যোগেন বাবু (গোস্বামী) বেড়াইতেছিলাম। সে বলিল "সব উতারো।" সব ভার নামিয়ে দেও। ও কখন আমার সহিত কথা বলে না। আর একদিন একটা গোপালভোগ আম দিতে গেলাম। নিল না ; বলিল—"তোরা শির্ পর আভি মোটারি হ্যায়। আগারি উতারো।" আগে নামাও তবে নিতে পারি। আরে পাগল নামে কৈ ?

১৮।৫।০৮।

কাল বাঁ হাতটা অবশ হয়। একটা খুব বড় স্নায়ুর অত্যন্ত স্পন্দন হইতে লাগিল। কাঁধ হতে আঙ্গুল পর্য্যন্ত। বোধ হইল

যেন অর্দ্ধাঙ্গ হইবে। কাঁদিয়া হরিকে বলিলাম—অনেক অর্দ্ধাঙ্গ দেখেছি, বড় কষ্ট। তার আগে চিত্তশুদ্ধি দিও, যেন এ খোলসটা ছেড়ে ভিতরে ভিতরে তোমাকে চিন্তা কর্‌তে পারি। ২।১ দিন পরে ক'সে গেল।

২৪।৫।০৮।

হরি হরি বলিয়া মন্ত্র বলিতে হয় এবং এক স্থূলরূপে মন একাগ্র করিতে হয়। আমি মুরলীধর মূর্ত্তি চিন্তা করি। আজ মূর্ত্তি যেন খুব পরিস্ফুট।

২৯।৫।০৮।

আজ দেখি মনের একদিকে কৃষ্ণমূর্ত্তি আর একদিকে একটা গাম্‌লা। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও সেই গাম্‌লাটি তথা হইতে সরাইতে বা ভুলিতে পারিলাম না। আজ আসানউল্লা মিঞার সাথে দেখা হয়। মন যেন দর্পণ; অমনি তার মূর্ত্তি লাগিয়া থাকিল; কিছুতেই যাবে না। পরে অনেক চেষ্টা করিয়া সরাইতে হয়। গাম্‌লার ফল পরে দেখিবেন। সকলেরই শুচি হওয়া উচিত।

আজ ভোরে স্বপ্ন দেখিলাম যদু বাবু বলিতেছেন—ভাই আজ বউমার ব্রত; তুমি কিছু খাইয়া যাও। খাইলাম পায়েস, কিন্তু তার মধ্যে একগাছা লম্বা শাদা চুল পাইলাম। চুল টানিয়া ফেলিয়া দিলাম। কিন্তু সবটা বাহির হইল না; একটু ছিঁড়িয়া রহিল। চুল খাদ্যের মধ্যে, এ স্বপ্ন ভাল নয়।

চরণ-যুগল।

৩০।৫।০৮।

আজ সকালে ৮॥০ টার পর অমবস্যা ছাড়িয়া প্রতিপদ পড়িল। এই সময়ে হৃদয়ে এক আশ্চার্য্য ব্যাপার দেখিলাম। দেখিলাম দুখানি ছোট গৌরবর্ণ চরণ হঠাৎ হৃদয়ের মধ্যে দেখা দিল। আঙ্গুল নখ পরিষ্কার দেখা যাইতেছে, গিরাটা পর্য্যন্ত উঁচু। একটা দুয়ানীর মধ্যে ঠিক লম্বা হয়ে ধরে। চরণযুগল স্থিরভাবে আছে। নামের সহিত বা এমনি হৃদয়ে মন দিলেই উহা দেখা যায়। ওদিকে মন না দিলে অবশ্য দেখা যায় না। এতদিন ছিল আলগা রূপ। ক্রমে কে যেন একটা আনিয়া গাঁথিয়া দিল। আমি জানিতাম না যে এ তন্ত্রমতের সাধন। আমার স্থুল ধ্যান হইয়া গেল। আজ জ্যোতির্ধ্যানের পত্তন হইল। আমার মনে এখন বড় খট্‌কা বাধিল। এখন ধ্যেয় কে? এই চরণ না এতকালের কৃষ্ণমূর্ত্তি। মুখে কিন্তু হরি হরিই বলিতেছি। কখন চরণ, কখন এই চরণের উপর কৃষ্ণমূর্ত্তি বসাইয়া দেখিতেছি। বড় বিপদ। এ সব খটকার ব্যাপার পরে বুঝিয়াছি। আমি নীলরূপ দিয়া কৃষ্ণ করিলাম। এখন সন্দেহ কেমন নীল? ভাগবতে আছে—স্নিগ্ধ প্রাবৃট্ ঘনশ্যামং—বর্ষাকালের নূতন মেঘের মত। মহাভারতে আছে—অতসী পুষ্পবর্ণ, তিমির (মন্‌সা) ফুলের রং। যা হউক, এক রূপ গড়িলাম কিন্তু আমি প্রকৃত অবতারবাদী নহি। আনন্দময় ব্রহ্মের সাকারভাব মুরলীধর, আমার এই বিশ্বাস। তারপর ঈশ্বরের রূপ সিংহাসনের উপরে সাহেবেরা যেরূপ কল্পনা করে, তাও দেখিলাম। মূর্ত্তি নীল, দাড়ি আছে। মধু এ বিপত্তিতে কিছুই করিতেছে না।

৪। ৬। ০৮।

রাত্রি ১১টা। মধু রাগিয়াছে। আমাদের পাড়ার বসন্ত তলাপাত্র নামে একজন ভদ্র লোক আছেন; তাঁহার একজন মুহুরী আছে। একজন কায়স্থ, কি দত্ত যেন। লোকটী শিক্ষিত নয়। মধু ঐরূপ একটি রূপ ধ'রে ঘর হ'তে বাহিরে যাইতেছে ও বলিতেছে "দত্তের বিদ্যাও নাই, বুদ্ধিও নাই"। বেশীকথা না ব'লে মধুর এসব বুঝাইবার কৌশল। এ ত তন্ত্র মতের সাধন দেখিতেছি। এর আমি কিছুই জানি না। ইহাতে বিপদও বিস্তর। আমি না জেনে অন্ধকারে অন্ধকারে কোথা এসে পড়েছি। সাঁতার কিন্তু প্রায় পার হয়ে এসেছি। আমি এখন ও জানিনা আমি একূলে না ওকূলে। মধু এইযে বিরক্ত হয়ে দত্তরূপ ধরে বেরিয়ে গেল, তার পর যখন এল তখন নিজের রূপ ধরে ঘরে ঢুকিল। আমি দেখিলাম মাথা হেঁট করিয়া ঢুকিয়া কপাটের উত্তরে মেজেতে বসিল। আমার মনের ভাব,— নিরাকারেরই যদি সাকার কল্পনা করা হয় তবে ওই সাহেবদের দাড়ীওয়ালা সিংহাসনস্থ ঈশ্বর মূর্ত্তি বা হবে না কেন? বর্ণ যখন একটা থাকবেই তখন নীল হওয়াই বা দোষ কি? নাম রূপের মধ্যে যতদিন, ততদিন ওনিয়ে মারামারি ক'রে ফল কি? আমার এই উদার বুদ্ধি। কিন্তু এ বিচারও আমার নিজের তা বোধ হয় না; বিচার করিলেও দাড়িওয়ালা ঈশ্বর আমি কখনও চিন্তা করি নাই।"

তার পর একটু তন্দ্রা আসিল। আমাদের বাসার উত্তরে একটা ডোবা আছে; তার জল পচা ও নীল রং। কতকগুলি মেয়ে যেন ঐ জলে নেয়ে গেল। আমার ছোট মেয়েটি ও, যেন ঐ জলে স্নান করিতে যাইতেছে। আমি নিষেধ করিলাম। সে বলিল—

ওরা যে নেয়ে গেল। আমি বলিলাম—ওরা পচা নীল জলে ডুব দিল ব'লে তুইও দিবি? চল পদ্মায়।

গল্পটা ঘুরাইয়া নিলেই বেশ অর্থ হয়। মধু আমার মা, আমি মেয়ে; আমি সিদ্ধপুরুষ মধুর মেয়ে হয়ে নীলবর্ণে ডুবিব কেন? পরমাত্মায় লীন হইব। শুদ্ধসলিলা গঙ্গায় স্নান করিব। তখন ঠিক করিলাম যে চরণ দেখিয়াছি ঐ চরণই ধ্যেয়। অন্য কোন রূপ নয়; তন্ত্রে আছে স্থুল রূপের পর জ্যোতি। এখন জ্যোতি রূপ ধ্যান করিতে হইবে, স্থুল নয়; আমার ধারণা ছিল ঐ স্থুলই। রাত্রে একটি স্বপ্ন দেখিলাম। একটী ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি; তার পা হতে শুভ্র নির্ম্মল অপূর্ব্ব জ্যোতি বাহির হইতেছে, আর উহার কপালে একটা শাদা কোঁটা; তাহা দিয়া দীর্ঘ বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল জ্যোতি রেখা বাহির হইতেছে। কিন্তু মূর্ত্তির কোন প্রভা নাই। তখন বুঝিলাম ঐ শিরস্থ জ্যোতি ও চরণস্থ জ্যোতি ঐ চরণযুগলে (গুরুর চরণে) আরোপ করিতে হইবে। মধু এই কথা অতি কৌশলে বিনা বাক্যব্যয়ে বুঝাইল।

৬। ৬। ০৮।

আমি ঐরূপ চিন্তা করিবামাত্র ঐ চরণযুগল জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল। উহার সঙ্গে একটি রেখার মাঝখানে এক জ্যোতির্বিন্দুও থাকিল। এটি বড়ই আশ্চর্য্য ঘটনা। এবিষয় পরে আরো বলিব। এখন দেখি মধু যাহা ইচ্ছা করে তাহার বিরুদ্ধ কিছু হৃদয়ে গড়িতে পারিনা। যা ইচ্ছা করে তাই মাত্র পারি। আমি যখন গুরুচরণযুগল কৃষ্ণমূর্ত্তির সহিত যুড়িয়া উহার তলায় লাল রং দিতেছিলাম; কিছুতেই সে রং লাগিল না। যখন কালমেঘ আনিয়া কৃষ্ণমূর্ত্তি গড়িতেছিলাম, তার পায়ের আঙ্গুলগুলি গলিয়া যাইতে লাগিল; রং

লাগা দূরে থাকুক, আঙ্গুলই ভাল হয় না। আমার মন মধুর মনের বিরুদ্ধ কোন কায কিছুতেই করিতে পারে না। কিন্তু যুগলচরণে রশ্মি হউক ভাবিলাম আর অমনি আশ্চর্য্য রশ্মি হইল।

আজ বড় ঘুম পাচ্ছিল। ভোর হয়ে গেছে। চোকের ভিতর কর্ কর্ করিতে লাগিল। কিছুতেই থাকা গেল না। বাড়ীর ভিতর গেলাম। একগাছা চুল বাহির হইল। কিন্তু তাহাতেও শান্তি হইল না। আবার ঐরূপ হইতে লাগিল। আমার ঘুম পাইলে মধু নানারূপ স্বপ্ন দেখাইয়া তাহা ভাঙ্গিয়া দেয়। একি তাই? যা হউক, আবার বাড়ীর ভিতর গেলাম। এবার দেখে বলে—কিছু নাই। একটা জায়গা ছুঁচের মত সরু হয়ে আছে, তারই খোঁচা লাগিতেছে। আমি বুঝিলাম মধুর কাণ্ড। আমি বাহিরের ঘরে আসিয়া আসনে বসিয়া বলিলাম—আমি ঘুমাইব না; তুমি আমার চোক ভাল করিয়া দাও। আবার যদি ঘুমাই তবে করিও। যেমন বলা অমনি কর্ করাণী সারিয়া গেল।

আবার ও ঘুমে ধরিল; তখন তন্দ্রায় দেখি আমার একটি মেয়ে পায়খানার তক্তা বাড়ুন দিয়া ঝাড় দিতেছে। আমি বলিলাম—আরে করিস্ কি? করিস্ কি? আর তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। এমন মধু প্রায়ই করে। কিন্তু মাংস উঁচু করা বুঝিনা। তা হলে মন ও দেহ উভয়ের উপরই ওদের যথেচ্ছ প্রভুত্ব। যারা মনোরূপী তাদের তা হওয়া অসম্ভব নয়। মধু নিত্যসিদ্ধ; উপকার বৈ অপকার করতে জানে না। ওদের কাছে কিন্তু সামান্য Spirit (ভূত প্রেত) এর আসিবার অধিকার নাই। ওদের হৃদ্‌পিণ্ডের উপর অধিকার। বাহিরের ঘরে সবুজ (নীল ঠিক নয়) Spirit (পরীর মত ভূত প্রেত) দেখি উড়িয়া বেড়াইতেছে; দেখিতে বেশ উজ্জ্বল

বর্ণ। চেহারা ভাল হলেই মন ভাল হয় না। এখন আমি যে ঘরে থাকি সেই ঘরেই দিনের বেলায়ও দল বাঁধিয়া যায়, গান করে ও নৃত্য করে। সে গান খুব মৃদু, মাছির ভন্ ভনের মত। কথা বলিতে পারে। যে দিন সব পণ্ড হয় সেই রাত্রিতে আমি ঐ ঘরেই শুয়ে আছি। এরা এল; এসে বলে "উঠাও কুঞ্জবাবুকে" মধু যখন থাকে তখন ওরা আসিতে পারে না। দেবতারা পারে। এরা খুব নীচু। শরীরের উপর ঈষৎ আঘাতও যেন টের পাই। আমি বলি—আমি ত ইচ্ছা করে ওপথে যাই নাই। আর ত তোমাদের অনিষ্টও করি নাই। তা কি শুনে? আমার বড় বকন গরুতেও ও বোধ হয় দেখে। কাল খুব লাফাইল। ১০টা হইতে ১২টাই এদের খুব আনন্দের সময়। কোন দিন সারা রাতই থাকে। আমি সিদ্ধ হইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম এই জন্য ওদের আমার উপর রাগ। Fallen enemy র (বিজিত বা পতিত শত্রু) উপর লাথি মারচ! মাই সব কল্লেন। বুদ্ধিও তিনি, ভ্রমও তিনি। প্রাতঃকাল হয়েচে, কিছু মেঘলা। মধু দিনে প্রায় থাকেনা। আজি আছে। গাইটা যেন দোয়া হইল। একজন কৃষ্ণকায় পুরুষ (যেন একটা চাকর) ঘটি কাত্ করিয়া আমাকে দেখাইল। আমি চৌকীর উপর বসিয়া নাম-জপ করিতেছি। দেখি দুধ দেখা গেলনা। অর্থ তুমি পায়েস খেতে চাও, আনন্দময় ঈশ্বর দেখিতে চাও; কিন্তু জপবড় কম। আমি বুঝিলাম কথা না বলিয়া মধু এইরূপে প্রায় বুঝায়। যেখানে কথা না কহিলে চলে সেখানে কথা বলেই না। শুনিতেছি কে যেন বল্‌চে একরাম মণ্ডলের একটা গাই আছে; সে দিন ৫।৬ ভাঁর করে দোয়ায়। খাওয়ালে দোয়ান যায়। জপ জজ্ঞ। জপে অপূর্ব্ব শক্তি হয়, চিত্তশুদ্ধি হয়, সত্ত্বগুণ প্রকাশ ধর্ম্ম বাড়ে।

৭।৬।০৮।

বপ্নেই দেখিলাম গর্ত্তের যে নীল পচা জলে স্নান করিলাম না, তাহা এখন আমার ঘরে ঢেউ খেলিতেছে। ইহার অর্থ বুঝিয়াছি। পরে নীল spirit (পরী) এরা দলে দলে আমার ঘরে নেচে বেড়াইয়াছে। আর দেখিলাম আমি মধ্যে, চারিদিকে জল। কিন্তু দূরে কূল দেখা যায়। তা হউক জল, কূল ত পাব; জল কষ্ট। এর মানে আছে; এতকাল কেবল—মূর্ত্তিতে দৃঢ় ছিলাম না। মৃত্যু নিকটে। এখন কাকে ডাকি? কাযেই আমি জলের মধ্যে, ও কূল দূরে। কালীর চার হাত বলিয়া Monstrous (অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর) বলিতাম। এখন সেই কালীই উপাস্য; কারণ তিনি আমাদের কুলদেবতা। সত্যই "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" আগে ভাবিতাম —দেবতা হাত গড়া। দেখিলাম—তা নয়; দেবতা সত্যই আছেন। যতদিন স্থূলধ্যান আছে, ততদিন যার যার কুল-দেবতার উপাসনা করাই উচিত। বাবা তা বলিতেন। এ কথা পরে আরো পরিষ্কার হইবে। আমি গীতাতেই ডুবে ছিলাম, তাতে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু কুলদেবতা পরিত্যাগ বড় পাপ হইয়াছে; আমাকে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। যাঁহারা বহু পুরুষ উপাসিত তাঁহাদের বড় দয়া। কায ভাল করি নাই। শেষ কালে বুঝিতেছি। নিরাকার লয়ে থাকা যার ধ্রুবজ্ঞান সে পারে। আমাদের স্থূলাশ্রয় চাই যতক্ষণ, ততক্ষণ কেন কুল ছাড়িব। রামপ্রসাদ বলেছেন "কুল ছেড় না নিদানকালে।"

মধুর ক্ষমতা আশ্চর্য্য কিন্তু আমার কপাল বড় মন্দ। কাল যখন কৃষ্ণমূর্ত্তির চরণপ্রভা ও ললাটের তিলকের জ্যোতিরেখা পদযুগলে আরোপ করিলাম তখন চরণযুগলে উজ্জ্বল আভা, প্রখর নয়, জ্বালা

নয়। কিন্তু বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বয়ের মধ্য হইতে একটি রেখা নির্গত হইয়াছে। তাহার মধ্যদেশের এক স্থান ঠিক তড়িৎ বর্ণ। ইঁহারই নাম তন্ত্রশাস্ত্র মতে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি। এখন মধুর গানটা মিলে—

এবার ঠিক রেখ মন গুরুর চরণ, নিরিখ ছেড় না।
ওরে মন এক নিরিখে ধর্‌লে পাড়ি, জলের বাড়ি লাগবে না।
নিরিখ ছাড়্‌লে পরে পড়্‌বে ফেরে, অধরচাঁদকে পাবে না॥

অধরচাঁদ=চিৎচন্দ্রকুণ্ডলী; তাঁকে ধরা যায় না এমন তড়িৎবৎ জ্যোতি। মন একাগ্র হলে তবে অধরচাঁদ জাগেন। বহু ভাগ্যে ইনি জাগরিতা হন।

ঘেরণ্ডসংহিতায় আজই পড়িলাম—

বহু ভাগ্যবশাৎ যস্য কুণ্ডলী জাগ্রতী ভবেৎ
আত্মনঃ সহযোগেন নেত্ররন্ধ্রাৎ বিনির্গতা
বিহরেৎ রাজমার্গে চ চঞ্চলত্বাৎ ন দৃশ্যতে।
শাম্ভবীমুদ্রয়া যোগী ধ্যানযোগেন সিধ্যতি॥

সব নখ হইতে ঐরূপ জ্যোতি বাহির হউক ভাবিলে তা হয়। কিন্তু তাহারা সমভাবে থাকে না; ঐ একটী মাত্র থাকে। ইহা অতি-চঞ্চল। ক্ষণমাত্রও স্থির থাকে না। ঐটী কুলকুণ্ডলিনী। ধ্যান করিবার জন্য মন সব ছেড়ে ঐ বিন্দুতে গিয়া সহজে লগ্ন হয়। ঐটী হিরণ্ময় পরকোষের দ্বার। আমি ধ্যানের চেষ্টা ক'রে দেখেছি; ও হৃদয়ের মধ্যে এমন একটী স্থান যাতে মনঃসংযোগ করিলে মন ক্রমে ভিতরে চলে যায়। বাহির সব ছেড়ে যায়। এদিকে থাক্‌তেই চায়না; ডুব্‌তেই চায়; পূর্ব্বে বলিয়াছি কুলকুণ্ডলিনী শক্তি বা চরণোপলব্ধি জ্যোতিতে আমার দৃষ্টি। আর সব তেজ যায়, ওটী থাকে। আর অমন উজ্জ্বল

ভাস্বর আলোক কখনও দেখি নাই। বৈকালে বেশ ধ্যানের ভাব হইতেছিল। শরীর আর নড়ে চড়ে না। আসন স্থির হইয়া গেল। আমার দৃষ্টি ঐ উজ্জ্বল বিন্দুর উপর। জানি মন অণু। অণু না হইলে অণুকে আটকান যায় না; মনেরও আনন্দ হইল। মনে করিলাম ওচরণধ্যানে আর দরকার কি? এই ত বেশ। তা মধু বাধা দিয়াছিল। মধু আমাকে ভয়ঙ্কর পথে লইয়া আসিয়াছে। বহু বিঘ্ন সমাকুল। আমি ভক্ত মানুষ।

যজ্ঞে বিঘ্ন।

আজ সন্ধ্যাকালে জপ করিতে বসিলাম। কুণ্ডলিনী আমার লক্ষ্য। কিন্তু মধু জপ করিতে দিল না। সে বুকের মধ্যে ঢুকিয়া গাঁজা খাইতে লাগিল। আর একটা বিকট রকম কে, মুখে ওষ্ঠ নাই, কেবলই দাঁতগুলি, তাকেও দেখিলাম। আমি অনুনয় বিনয় করিলাম; তখন তাহারা বাহির হইয়া গেল। আমি জপের চেষ্টা করিলাম। দেখি কেমন একটা অবশ ভাব আসিয়া পড়ে; মাথা ভার হয়; এ সব মধুর কাণ্ড। ওখানে ধ্যানে কেবল সুখের কথা। কেবল আনন্দ। ভাত হইল, খাইয়া আসিলাম। আবার ধ্যান আরম্ভ, আবার বাধা! কুণ্ডলিনীকে মলিন দেখাইতে লাগিল। আর কি গোলমাল, হৃদয়ে চরণের জায়গায় চরণ নাই। সে প্রভাপুঞ্জ আছে,—এলোমেলো, কেমন যেন বিশৃঙ্খল। আমি যেমন সাজাইয়া রাখিয়াছিলাম তা নাই। সব মধুর কাণ্ড।

এমন সময় দেখি কয়েকটী স্কুলের ছাত্র আমার চৌকীর উপর বসিয়া আছে। তাদের মধ্যে একজন বলিতেছে "পণ্ডিত মহাশয় টিকিট মিকিট বেশ করেছেন"। ঐ যে পূর্ব্বে বলেছিল বাবুরা ও

সাহেবেরা টিকিট লইতে দিতেছে না, তাই টিকিট লইলেই গাড়ীতে চড়া যায়। ঐ বিন্দু টিকেট্ বা গাড়ী যা বল। ওকে বলে ব্রহ্ম-দ্বার। আগে স্থূলধ্যান হইয়া গিয়াছে। এখন জ্যোতির্ধ্যান চলি-তেছে। পরে সূক্ষ্মধ্যান হইবে। আর সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, আত্মা পরেরটীতে ক্রমে লয় হয়ে পরমাত্মায় যাবে, তখন সমাধি। বাড়ী ব্রহ্মপুরী। হিরণ্ময় পরকোষ। বৃথা রাজনৈতিক বিষয় গল্প করিয়া যে রেলগাড়ীতে উঠিলে বাড়ী যাওয়া যায়, তাহার টিকিট মিলিতেছিল না। আমি জপ আরম্ভ হইতে খবরের কাগজ পড়ি না। গল্পকেও ভয় করি। ওতে মন বড় বিক্ষিপ্ত করে। তবে সমাজ উহাতে সিক্ত। কাছে গেলেও ভিজতে হয়। সমাজ ছেড়ে যাই বা কোথা। একমাস দুয়ার দিয়া আছি। প্রথম হতেই মন বড় খারাপ। যা ইচ্ছা তা পারি না। একটা অন্তরে অন্তরে নিজের উপরে রাগ।

মধু আমাকে মূর্খ ও বোকা বলিয়াছিল, দত্তের সহিত তুলনা করিয়াছিল, এখন ভাল বলিল। মধু বাস্তবিক ভাল বাসে। ভাল না বাসিলে আমাকে রাজসাহীতে আসিয়া খুঁজিয়া বাহির করে ও এ দিকে আনে? আমি ব্রহ্মপুরীর দ্বার দর্শন করিলাম। ইহাতে ধ্যান করিলে ইন্দ্রিয় মনে, মন বুদ্ধিতে, বুদ্ধি আত্মায় ও আত্মা পরমাত্মায় ডুবিয়া যায়—লয় হয়; পরমানন্দ স্ফূর্ত্তি। ইহাই সমাধি। ইহাই সিদ্ধি। শাক্তেরা ইহাকেই বলেন কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিতা করিয়া পরমশিবে যোগ করা ইত্যাদি। ইহাতে মন আপনি ডুবিতে চায় এবং সব অবশ হইয়া আসে, শরীরের মধ্যে শীব্ শীব্ করে দূরে যেন ঝড় আসিতেছে এইরূপ বোধ হয়; তাহা আমি অনুভব করিলাম।

৮।৬।০৮

কাল ভয়ানক কাণ্ড সব হলো। কাল স্বয়ং মধুকে দেখিলাম, রূপবান্। কাল আর জপ হইল না; করিতে গেলেই বাধা। ভোর রাত্রে দেখি একটা ঘোর কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রী, অতি কদাকার; ঠিক অমন একটী জেলে বাগ্দী মেয়ে মাছ বেচে। তার কাপড়ও তেমনি কাল, বয়স ৩০।৩৫ বৎসর, মাথায় কাপড় নাই। আমার কাছে খাটের উপর বসিয়া। সে কিছুতেই যাইবে না। বুঝিলাম মেয়েটা অবিদ্যা; মধু যাহাকে কুদিনারী বলে। অনেক ধ্বস্তা ধ্বস্তির পর মধু তাহাকে দূরে লইয়া গিয়া তাহার গলা ছুরি দিয়া কাটিয়া ফেলিল। তাহার কাটা গলা দিয়া পচা পূঁযের ন্যায় ভয়ানক দুর্গন্ধযুক্ত মল বাহির হইতে লাগিল। ইহাই তাহার শরীরের রক্ত। কিন্তু কাটার পরও সে মরিল না। আবার আসিল। ঘরের মধ্যে শূন্যেও কথা শুনিলাম। সে যেন শূন্যে বলিল "এ মেয়েটীর (অবিদ্যা, যাকে গুরু কাটিলেন) একজন সাক্ষী চাই"। গুরু আমাকে বলিলেন— আর "অৰ্দ্ধেক দুধ হবে"; আমার পূরা (পূর্ণ) চিত্তশুদ্ধি হয় নাই। সাধন অৰ্দ্ধেক বাকী আছে। আরো সত্ত্বগুণ চাই এই কথাটা মেয়েটীর পক্ষে ওটা দেবতা। খুব চটে কথা বলুচে। বাংলায় কথা বলুচে। এদিকে ধ্যান আসিতে চায়। শরীর ঝিম্ ঝিম্ করে। মাথা অবসন্ন হয়। আমারই ধ্যানের ভাব আসে। আমার অবিদ্যাসম্বন্ধ ঘুচে নাই সত্য কিন্তু ও সব কিছু নয়। এ পথে জোর ক'রে সিদ্ধি, তাই অবিদ্যাকে মেরে ফেলে। বেদান্তের গদাই লস্করি চাল। তন্ত্রমতে দু দিন ওদিগকে সময় দিতে হয়। এর মধ্যে দেখিলাম দরজার কাছে একটা টিকটিকীর ডিম পড়িয়া ভাঙ্গিয়া ছানাটাও গলিয়া গেল। আর ২।৪ দিন পরে পড়িলে খোলা ও টিকটিকী আলাদা হইয়া যাইত। কথাটা ভাল নয়।

আমি বিষ্ণুর স্তবে পড়েছিলাম—

অভ্যাস নিগৃহীতেন মনসা হৃদয়াশ্রয়ম্ ।
জ্যোতির্ম্ময়ং বিচিন্বন্তি যোগিনস্ত্বাং বিমুক্তয়ে ॥

আমি গৃহী হইয়াও যোগিধ্যেয় জ্যোতির্ম্ময়কে ধ্যানের আশা করিতেছি। আমার কি ভাগ্য! কাল মধু অবিদ্যার সঙ্গে যখন বড় ধ্বস্তা ধ্বস্তি করে তখন বলেছিল—"অন্যেও (গুরু) ক'রে দিতে পারে কিন্তু তাতে এমন সুখ হয় না।" তেমন গুরু নিজ শক্তিতে ধ্যান ব্যতীতও ব্রহ্মদর্শন করাইতে পারেন। কিন্তু তাহাতে তেমন আনন্দ হয় না। আমার মন ঐ ভাস্বর বিন্দুর নিকট ঘুরে, আর ধ্যানের চেষ্টা করিলে বুক গুড়্ গুড়্ করিতে থাকে। কানে শব্দ হয়। শরীরে ঘর্ম্ম হয়। কেমন একটা বায়ুর কায হয়।

ব্রহ্মজ্যোতির কথাই মনে পড়িতে লাগিল—

হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্ ।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতি স্তদ্‌যদাত্মবিদো বিদুঃ ॥ মুণ্ডক

নিষ্কল জ্যোতির জ্যোতি ব্রহ্ম ; আর এই জ্যোতির্ম্ময় দ্বার কুণ্ডলিনী। গুরু মাকে পাওয়াইয়া দেন, মা পিতার নিকট লইয়া যান। কিন্তু তিনিই এক। বৈষ্ণবের এই কথা, শাক্তেরও এই কথা। বুঝিলে সকলেরই এই কথা। আজ ভাবিলাম সংসারটা তবে কি ?

মা যে মূর্ত্তি গড়াইয়া পদে ও তিলকে জ্যোতি দেখাইলেন তাহা যেমন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, যে অবিদ্যা মূর্ত্তি দেখাইলেন তাহাও ঠিক ঐরূপ কাল। ইহাতে বুঝা গেল—মায়াংশ কাল। এই বিশাল জীবজড় সমন্বিত জগতের প্রত্যেক পদার্থে চিদংশে একটী চিৎকণা দেওয়া যাউক ; এবং মায়ার বিকার—দেহাংশ—ঐরূপ কাল করিয়া একটী মূর্ত্তি গড়িলে কি বিরাট্ অসংখ্য চিদ্বিন্দু সমন্বিত বিশাল কৃষ্ণমূর্ত্তি চক্ষুর

সম্মুখে উপস্থিত হয়। সূর্য্য চন্দ্র আকাশ ও রাত; ওতেও চিদ্বিন্দু আছে। যখন অবিদ্যাসম্বন্ধ দূর হয়, তখন ঐ কাল অংশ মিথ্যা জ্ঞান হয়, উঠিয়া যায়। আর ঐ চিদ্বিন্দুগুলি এক হইয়া একচিৎ দেখায়। মধু খায় আর থু থু থু কেন করে? পাঠক তাও গলাকাটা ব্যাপার হতে বুঝ।

বাবা উপনিষদে পড়িতেন "যচ্ছেৎ বাঙ্‌মনসী" ইত্যাদি। আমি তাঁর কাছেই ধ্যানের কথা প্রথম শুনি। ইন্দ্রিয় মনে, মন বুদ্ধিতে, বুদ্ধি আত্মাতে, আত্মা পরমাত্মায় ডুবিলেই সমাধি, সেই ব্রহ্মানন্দ। এ বেদান্তের কথা। এখন বুঝি মধু যে এখানে সেখানে পড়ে থাক্‌তো তা এই ব্রহ্মানন্দে ডুবে। শরীর মন বুদ্ধির সহিত কোন সম্বন্ধ থাকিত না। "ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।" আর চৈত্র মাসের রোদে তপ্ত বালির উপর পড়ে থাক্‌তো। লোকে বল্‌তো "হুঁঃ, পাগল রোদে ঘুমুচ্চে।" কে বুঝিবে যে এই সাড়ে তিন হাত মানুষের মধ্য-মানুষ অন্তর পুরুষ ব্রহ্ম। "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি।" মধু বলিত উত্তরে দক্ষিণে সব কির্‌মির্‌ গাদী। আর বলিত "ঐ ফানষ্‌টা আপনারাই রাখেন, আজ্ঞা আচ্ছা।" কি জ্ঞানই পেয়েছিল!

আজ বেলা ৩টার সময় দেখি ঘরের মধ্যে আমার স্ত্রী। কোলে একটী শিশু; ৩।৫ দিন হইল হইয়াছে। আমি ভাবিলাম সে কি? আমার আবার ছেলে? অনেক ভাবিয়া বুঝিলাম—মা বলিতেছেন যে এই স্ত্রীকে সূতিকা ঘরে মলিন বস্ত্রে এইরূপ শিশুকে যেরূপ যত্নে পালন করিতে স্বচক্ষে দেখিয়াছ, তুমি যাহা পাইয়াছ তাহাও সেইরূপ যত্নে চোখে চোখে রাখ। জপ আর হৃদয়ে দৃষ্টি,—নিরন্তর।

১০।৬।০৮।

কে যেন বলিল—"প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ"—গীতা। আবার একজন

বলিল "সূতিকা ঘরের দরজা আরো উঁচু হওয়া উচিত ছিল।" এটা অমঙ্গলের কথা! দ্বার ছোটই হয়; লোক সতত বাহির না হয়, মাথায় লাগে এজন্য। আমার কাচারী ঘর। আমার যজ্ঞে স্বপক্ষ বিপক্ষ দুই দলই উপস্থিত ছিল।

রাত্রি এখন ৪টা। প্রভাতের বিলম্ব আছে। মা বলেছিলেন পোয়াতির মত সতর্ক থোকো। বাস্তবিকই যেন এক কালরাত্রি গেল। আজ মা বড় গম্ভীর ও নিজে আমার শরীরে স্থানে স্থানে থেকে আমাকে রক্ষা করিতেছেন। খেয়ে এসে জপে বসিলাম; একটু পরেই ঘুম পাইল। ২।১ বার ঝিমাইলাম। মা তখন চক্ষে বসে Spirit (ভূত) রূপে বলিতেছেন—"একমাস দুমাস, বলেছি সাবধান থাক্‌তে; তা বাবুগিরি"। আমি ত আর তন্ত্র পড়ি নাই যে আমার কালই সিদ্ধি হইবে জানিব! আমি বলেছিলাম—মা, স্কুল আবার খোলে। যদি আর অর্দ্ধেক দুধ হতে ২।৩ মাস লাগে তবে তার একটা ব্যবস্থা কর। এখন সব রোমহর্ষণ ব্যাপার!

রাত্রি যখন ১১টা তখন বাসার দক্ষিণ হতে একটা বাগ্‌দী জেলেনী চেঁচিয়ে বল্‌ছে—রুই মাছ। সত্যই কি বাবু আমাকে মার্‌বেন? এ সেই অবিদ্যা। আর একটা কি পাখী (এই অবিদ্যাই ঐরূপে থাকে) আজ ৭।৮ দিন হতে—ঐ কুণ্ডলিনীর জাগরণ হতে—আমাদের টগরগাছ তলা দাঁড়কাকের ছানার মত সন্ধ্যার পর ও প্রভাতে আমাকে যতবার দেখে ততবার "ক্যাঁ" করে উটে। ঐ এক ডাক। জেলেনিও ঐ একবার মাত্র বলিল। এবার আমার ভয় হইল। একদিন রাত্রে লণ্ঠন নিয়ে গেলাম, কিছু দেখ্‌লাম না। ২।১ দিন ঢিলও মারিয়াছি। এখন বুঝি যে ঐ অবিদ্যা। আগে এ সব মান্‌তাম না। আমার কাছে অন্য লোক থাকলে ঐ পাখী ডাক্‌তো না।

তার পর ১১॥০টা—ঘরের মধ্যে শূন্যে আমার মাথার উপর কে বল্‌ছে—“আমাদের সম্পত্তি নিলি বৈ কি। তা নিলি বটে কিন্তু ভোগ করিতে পার্‌বি না।” এরা বোধ হয় দেবতা। মধু চারি বৎসর পূর্ব্বে বলেছিল “পূজার পর যেন মরে যান” ; তা এই পূজা। তার পর শুনি বারান্দার উপর খুব জোরে খালি পা ফেল্‌চে। মনে ভয় হলো। কিন্তু মা আজ বড় সজাগ। খাড়া পাহারা দিচ্ছেন। গা কাঁটা কাঁটা করে উঠ্‌লো। গায় একখানা কাপড় দিলাম।

মার কথা আজ বড় মধুর ; সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এখন তাঁর এ মূর্ত্তিতে (অদৃশ্য) কখন কথা হয় নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন—চরণযুগল যে ধ্যান করিতেছ উহার চোখ সওয়া জ্বালা ত ? অর্থাৎ উহার রশ্মিগুলি চোখে সহিতেছে ত ? আমি বলিলাম “হাঁ।” কখনও চক্ষুর অসহ্য জ্বালা ছিল না।

তার পর ২টা বাজিলে দক্ষিণদিকে একটা ঢোলের একটু বাদ্য হইল। এটা হয়ত আমার জয় বা মঙ্গল বাদ্য হইল ; আমি স্বকর্ণে শুনিলাম। আমি যে সিদ্ধ হইলাম দেবগণ তাহা স্বর্গে মর্ত্তে জানাইয়া দিলেন। ৩টার সময় একটী স্ত্রীলোকের কথার মত শুনিলাম। কিন্তু আর কিছু টের পাইলাম না। ১২টার সময় প্রস্রাব পায়, আমি এত ত জানি না। তা হলে জল খাইতামই না। ৪টা পর্য্যন্তও থাকিলাম; আর পারিলাম না। আসন ছাড়া নিষেধ। আসনে থাকিলে কেহ কিছু সহজে করিতে পারে না। কে আবার কি করিবে ? কেন, দেবতা প্রভৃতি যারা ঘরে আসিতে পারে—মন বিকৃত করিয়া দিতে পারে। মানুষের দেবোন্মাদ হয় ; তা হইলেই ত হৃদয়ের সেই ব্রহ্মদ্বার কুণ্ডলিনী গেল। সেইটী রক্ষার জন্য মার এত চেষ্টা। প্রতিপদে চরণ-যুগল পাই ; জ্যোতি সপ্তমীতে ; বোধ হয় সর্ব্বসিদ্ধি ত্রয়োদশীতে

ব্রহ্মদর্শন হইবে। মা একদিন দেখাইয়াছিলেন উপাসনা ঘরের মধ্যেই গাম্‌লা। আমার ঘি পাক করা একটা ছোট মাটীর খুলী ছিল; তাহাতে প্রস্রাব করি—ঠিকই হইল। সবই ত ঠিক হইতেছে। যে ঘরে স্ত্রীলোক থাকে সে ঘরে সিদ্ধেরা (মুমুক্ষুরা) প্রবেশ করেন না। সাধন হয় না। তাই বাহিরে যাই। বাবাও শেষ বয়সে বাহিরে থাকিতেন। এখন ঐ বন গমন। আর ঐ যে সব হলো এ অনাচার—এখন আর লোক শুচি হয় না। হিন্দুর আবার শৌচ শিখা উচিত।

দুদিন অনিদ্রায় শরীরে অত্যন্ত জ্বালা। মার "পোয়াতির কথা" ভুলে গেলাম। বেলা ৭ টার সময় আসিয়া কাপড় ছাড়িয়া ধোপা বাড়ীর কাপড় পরিলাম। নদীতে গেলাম না—কূয়ার জলে স্নান করিয়া আবার ঐ ধোয়া কাপড় পরিলাম। জপের আসনে যাইতেছি আর কাকটা আনন্দে কঁ্যা কঁ্যা কঁ্যা ক'রে টগর গাছতলা হতে পশ্চিমদিকে উড়ে গেল। আসনে গিয়ে বসে দেখি জ্যোতির্বিন্দু নাই। তন্ত্র ত কোন দিন পড়ি নাই; জানি না; মার কথাও প্রণিধান করি নাই। ওরা বাজে কথা বলে না। আমি একদিন জপকালে রাত্রি ৩ টার সময় দেখি যে বঙ্কর মা (ধোপানী) যাইতেছে আর আমার দিকে তাকাইয়া টিপি টিপি হাঁসিতেছে। আমি বলিলাম "হারামজাদী।" তবু মাগী গেল না। মাগী সর্ব্বনাশ করিল। ব্রহ্মদ্বার রুদ্ধ হয়ে গেল। মৃত্যুটাই ধ্রুব জানিলাম; আর "ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ" এ পর্য্যায় এই শেষ। আমার জীবনটা এমন, যে শেষটা যখনই সুখের আশা, তখনই ঘোর নৈরাশ্য। যেমন অযত্নে পেয়েছিলাম তেমনি হঠাৎ গেল। সাধনে বসিবার কিছু আগেকার একটা কথা হঠাৎ আমার মনে পড়িল। আমার দৈনন্দিন লিপি খুলিলাম। আমি

প্রত্যহ উপাসনার পর কিছু নূতন সত্য অনুভব করিতাম। তাহা তখনই লিখিয়া রাখিতাম। খুলিয়া দেখি—১৮।২।০৮ (বাংলা ১৩১৪ সন ৬ই ফাল্গুন) মঙ্গলবার—লেখা আছে "অতি উজ্জ্বল স্পষ্ট তড়িৎ বর্ণের কয়েকটী দেব নাগর অক্ষর—"ঈজ্যতে জায়তে"; কিছু বুঝিলাম না। মনে করিয়াছিলাম এ কখন হইতে পারে না; হয় ত মধ্যে "নচ" * আছে। আজ মার ইচ্ছা সব বুঝিলাম। এখন দেখি তাঁর ইচ্ছায় সব হয়। যা হতে পারে না তাও হয়। সে দিন "মা আমার অন্তরে আছ—কে বলে অন্তরে শ্যামা" গাইয়া কাঁদিয়া ঐ পাইয়াছিলাম। তুমি পূজিতও হইবে; তোমার জন্মও হইবে। তাঁর আজ্ঞা কে লঙ্ঘন করিবে। মা, ছেলে চিরদিনই বালকবুদ্ধি; সে কি ক্ষমার যোগ্য হইল না? আমার মনুষ্য জীবনটা ধন্য হইতে হইতে জঘন্য করিলে। তোমার ইচ্ছা—তোমার ইচ্ছা—জগন্ময়ী তোমার ইচ্ছা।

আমার ভেদবুদ্ধি ছিল না। তবে আর তোমার নামে অমন করিয়া কাঁদিতাম কেন মা? মা হয়েকি এমন করিতে হয়, মা? তুই পাষাণী! যদি বল—তোর যত পূজার কামনা, তত মুক্তির কামনা ছিল না; তা না হলে কি তুই আসনে বসে সব নোট লিখিস্; তোর গুরুর নিষেধ সত্ত্বেও তুই লেখাপড়া করিস্। সেটী কি আমার দোষ হইল মা। জগতে তোমার পূজার পথ প্রশস্ত হইবে। অজ্ঞাত লুপ্ত গূঢ়পথ ও নিত্যসত্য জগতে প্রকাশিত হইবে, সে ত তোমার মহিমা প্রচারের জন্য মা। তবে আমার মনে মনে একটা কামনা চিরদিনই জাগিত যে আমার পিতৃপিতামহ মহাপুরুষ; এক হাতে ব্রহ্ম, অন্য হাতে কর্ম্ম লইয়া সংসারে থাকিতেন ও জনকাদির ন্যায় জ্ঞানী। ইঁহাদিগকে কেহ জানে না। ইঁহাদের গৌরব হয়

* ঈজ্যতে (ন চ) জায়তে।

এটা আমার চির বাঞ্ছিত। লঘু পাপে গুরুদণ্ড করিলে মা! বুঝিয়াছি সিদ্ধি হইলে কি লোকে এই সব লইয়া থাকে? আমার দুঃখ কে বুঝিবে মা। পতিপুত্রের মৃত্যু কি, তা লোকে বুঝে; কারণ তা দেখে। রাজ্যনাশ, ধনসম্পত্তিনাশ কি তা লোকে বুঝে; কারণ লোকে দেখে। কত অশীতিপর বৃদ্ধ খাইতেছে দাইতেছে, বেশ আনন্দে আছে; বেশ নির্ভাবনা। কিন্তু মা আমার কোন দিনই ধন মান সুখের আকাঙ্ক্ষা ছিল না। যে এক আকাঙ্ক্ষা চিরদিন পোষণ করিয়া আসিয়াছিলাম জীবনের সহিত তাহা বিসর্জ্জন দিলাম। আমি কি হতভাগ্য ব্রহ্মদ্বার হতে আমাকে ফিরে আসিতে হইল! এ দুঃখ কোথায় রাখিব।

দয়াময়ী।

হইবার তা হইল। তোমার শাসন অলঙ্ঘ্য। এই যে লিখিতেছি ঘরের মধ্যে হরিতেরা আসিয়াছে। হৃদয় ব্যাকুল হইতেছে। শরীর কণ্টকিত হইতেছে। ওসব আমি গ্রাহ্য করি না। এ জীবন দ্বারা যদি তোমার কোন প্রিয়ানুষ্ঠান হয় তবেই যথেষ্ট হইল মনে করি। আর আমি জানি তুমি কখন আমাকে ফেলিবে না। কালই তাহার পরিচয় পাইয়াছি। এখন আমায় অবসর দাও।

৩।১১।০৬।

এক সপ্ন দেখিলাম। কি আশ্চর্য্য সেটা এখন ঠিক খাটে! কত আগে পরের কথা স্বপ্নে দেখেছিলাম। স্বপ্ন এই—

দেখিলাম একটী বড় জবা গাছ। তাতে ফুল নাই। সেই গাছের এক মূল হইতে একটী বুনো নেবুর চারা আওতাতেই (কুঁড়ে ঘর) বাড়িয়াছে। তার দুইটী পাতায় একটী টুনটুনী পাখীর বাসা। বাসা

যেন পরিত্যক্ত। দেখি দুইটী ডিম নীচেও পড়িয়া গিয়াছে। বাসার মধ্যে একটী মাত্র ডিম আছে; সেটাও ভাঙ্গা। একটী খুব লম্বা লাল পীঁপ্ড়া বাসায় ঢুকিয়া ডিম্‌টী খাইতেছে; তাহার পশ্চাৎটা দেখা যাইতেছে। লেবু গাছটী সাদা হইয়া গিয়াছে। মরিলে সব সাদা হয়।

আমার শাক্তকুলে জন্ম। জবা তার (রজোগুণের) চিহ্ন। বন লেবুর সাদা ফুল—সুগন্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম। উহা প্রচ্ছন্ন; তাই আওতায় (কুঁড়েতে) বাড়িয়াছিল। ডিম—ভক্তিবীজ ও ধর্ম্ম ত্যাগ হইল। লাল পীঁপ্ড়া-কুলকুণ্ডলিনী। এখন যা হইল, দেড় বৎসর পূর্ব্বে তা কে যেন বলিয়া গিয়াছিল। এখন আমার মনে হয় বাস্তবিক মানুষের কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই—

'অনীশ্বরং হীশ্বরদেশিতং জগৎ
কিমত্র শক্যং পুরুষেণ চেষ্টিতুম্।'

যে দিন সব ফুরাইল—সে দিন রাত্রিতেও আমি বাহিরের ঘরেই শুইলাম। একটু পরে মা শিয়রে বসে বলিলেন—"কি, নেমে গেল" আমি বলিলাম—হাঁ নেমে গেলেন। তাঁকে দেখিলাম না, তাঁর কথা শুনিলাম। তার পর হতে হরিৎ নীলেরা বড় দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। সারা ঘরে নাচে আর গান করে। গান শুনি কিন্তু দেখি না। হৃদয় কেমন করে। পরদিনও বাহিরে শুইলাম। দেখি একটা হরিৎ চালের কাছে, আর ঠিক নজর (দৃষ্টি) যেখানে পড়্‌বে সেখানে,—সুন্দর চোখ মুখ, তবে এমন কুস্বভাব কেন? ওদের দোষ কি—ওদের সব মায়ার কাজ। আমি শুয়ে আছি; একজন বলিল "উঠাও কুঞ্জ বাবুকে"। আমি আর সে রাত্রিতে বাহির বাড়ী শুইলাম না। দুই রাত্রি বাড়ীতে এত ভূত, যেন বোধ হইল নরকের দ্বার কে

খুলিয়া দিয়াছে। কেহ আমার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। কেহ বাজনা বাজাইতেছে। কেহ ভয়ানক ষাঁড়ের ন্যায় গর্জ্জন করিতেছে। আমি চুপ করে থাকি। পরদিন রাত্রিতে রান্নাঘরে ভাত খাইতেছি। সে ঘরে গিয়াও গান আরম্ভ করিল—সে গান আর কেহ শুনিতে পায় না। আমার স্ত্রী, ছোট ছেলে মেয়ে সবই সেখানে আছে। সেদিন ভাবিলাম—আমি নিজে ইচ্ছা করিয়া সাধন করি নাই। আমি জানিয়া শুনিয়া ইঁহাদিগকে উত্তেজিত করি নাই। ইহারা কাহাকেও অবিদ্যা লঙ্ঘন করিতে দিতে চায় না। যদি কেহ চেষ্টা করে, তবে তাহার যথাসাধ্য অনিষ্ট করে।

মনে করিলাম এই বিপদে ফেলে মা কি চ'লে যাবেন? না, অমন যার দয়া সে কখন আমাকে ত্যাগ করিতে পারে না।" দুঃখিত মনে শুয়ে আছি; রাত্রি শেষ; শক্তি জ্যোতিরূপে দেখা দিয়া বলিলেন—"তোমার জন্মান্তরে মুক্তি হইবে," "তুমি কাঁদিও না"। * তারপর দেখি মধু হৃদয়ে শুয়ে আছে। সেই কাল কাপড়। সেই অবধি মা হৃদয়েই আছেন। বলিলেন—অমুকের ঘরে তোমার জন্ম হবে। আমি বড় দুঃখিত হইলাম। জাতিতে তারা নীচ। মা সান্ত্বনা দিলেন। বলিলেন—ঐ জন্মেই তোমার মুক্তি হইবে। আমি মার আজ্ঞা মাথায় করিয়া লইলাম। ঈশ্বর শাসন অলঙ্ঘ্য। আরও ভাবিলাম —মার যদি কৃপা থাকে তবে যেখানে রাখিয়া তিনি ভালবাসেন

---

* এই গ্রন্থ ১লা ভাদ্র (সোমবার) পর্য্যন্ত পণ্ডিত মহাশয় কর্তৃক লিখিত। ইহার পর হইতে ৭ই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত তাঁহার সাধনার বিষয় তাঁহার ডায়েরী ও পত্রাদি হইতে জানা যায়:—

"আমার সাধন-জীবনের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে; এমন ডুব দিব আর পাইবে না।"

সেই বেশ। তাঁর দয়ায় ডুবে আছি। দয়াময়ীর দয়ার অন্ত নাই। তাঁর দয়ায় ডুবে থাকিব ইহা অপেক্ষা জীবের আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে। দিন কতক খুব কাঁদিয়াছিলাম; মা এই কর্‌লে, মা এই কর্‌লে বলে হাউ হাউ করে কাঁদিতাম,—পথে ঘাটে বাড়ীতে সব জায়গায়। যখন মনে হইত মা ব্রহ্মদ্বার হতে আমাকে ফিরিয়ে আন্‌লে তখন আর থাকিতে পারিতাম না। এখন সে ভাব গিয়াছে। একজন বন্ধুর কথায় বড় সান্ত্বনা পাইলাম। তিনি বলিলেন—সহস্র জন্ম হইলে ক্ষতি নাই, যদি তাঁর কৃপা থাকে। আর মনুষ্য জন্মই শ্রেষ্ঠ জন্ম। তন্ত্রের এই কথা।—উচ্চ নীচ কিছু নয়। মন স্থির হইল। প্রহ্লাদের "নাথ জন্ম সহস্রেষু" কথা মনে পড়িল; নারদের কথা মনে পড়িল। এখন বেশ আছি।

গীতার একটা কথা মোটেই বুঝিতাম না। স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ। এখন বুঝিলাম, বড় কষ্ট পেয়ে বুঝিলাম, কি ভয়ানক ভয়াবহ। আমরা বেদবিধির অধীন। আমাদের তা পরিত্যাগ করা পাপ। নিজে যেটা বুঝি সেইটাই ধর্ম্ম নয়। কালে কালে ধর্ম্মের যে পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হয়, বেদই তা বলিয়া দেন। কলিতে তন্ত্রমত; তন্ত্রাচার—ঈশ্বর মা। মাকে ডাক। তিনি করুণাময়ী, সুখের পথে লইয়া যাইবেন। ঈশ্বরেচ্ছায় রাজা যখন ধর্ম্মশিক্ষা দিবার অযোগ্য তখন সমাজকেই দিতে হয়। সমাজ-লোকগুরু। মধু বলেছিল—"ছোটকালের অভ্যাসটা ছাড়া যায় না।" তাই ধর্ম্মশিক্ষাটা ছোটকালেই দিতে হয়। বাবা ৮০ বৎসর বয়সেও জল না লইয়া প্রস্রাব করিতেন না। জ্বরে অজ্ঞান হয়ে আছেন—বলিলেন প্রস্রাব করিব; অমনি জল চাই। আমার সজ্ঞানেও জলের

দরকার হয় না। কতবার অভ্যাস করিয়াছি, কিন্তু থাকে না। ছোটকালের অভ্যাসটা ছাড়া যায় না। "শৌচাৎ স্বাঙ্গে জুগুপ্সা পরৈরসঙ্গঃ" জেনেও ছাড়িতে পারি নাই। বাবার দুটী কথা এখন আমার মনে হয়।

জন্ম হতে আমার গলায় একটী ছোট আব্ ছিল। সেটা ক্রমে বড় হয়। শেষে তাতে বেদনাও হয়। আমার বয়স যখন ১৪।১৫ বৎসর তখন একবার আবে বড় ব্যাথা হইল। দাদা আমাকে মেডি-কেল কলেজে নিয়ে গেলেন। তখন কট্‌ক্লিফ্ সাহেব প্রথম সার্জ্জন। তিনি দেখিয়া বলিলেন—এটা বড় হইলে ক্যারচি ও আর্ট্রিতে চাপ পড়িয়া ইহার মৃত্যু হইতে পারে। তখন কাটান স্থির হইল। মেডিকেল কলেজেই কাটান হবে। গ্যালারীতে ছেলেরা বসে আছে, দাদা তাদের মধ্যে বসে আছেন। অয়েল ক্লথ্ পাতা টেবিলে আমি শুইলাম। একজন ডাক্তার আমার ঘাড়ের চুল কামাইয়া দিলেন। একটা টুপীতে করিয়া ক্লোর্‌ফরম্ দিল। ভয়ানক তীব্রগন্ধ। ক্রমে অজ্ঞান হয়ে গেলাম। পরে শুনিলাম অর্দ্ধেক কাটা হইতেই আমার শ্বাস বন্ধ হইয়া গেল। ক্লোর্‌ফরম্ বেশী হইয়া গিয়াছিল। House Surgeonটী (কলেজস্থ গৃহডাক্তার) সদ্য বিলাত হইতে আগত। নাড়ীজ্ঞান ছিল না। তখন আমাদের বাসায় একটী মেডিকেল কলেজের 5th Year (পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণি) এর ছেলে ছিলেন। তিনি সেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন; তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। কট্‌ক্লিফ্ সাহেব বড় বিরক্ত হইলেন। কেহ তাঁহার মাথায় জল দিতে লাগিল। আমার সংজ্ঞাহীনতা সাহেব টের পাইয়া "ব্যাটারী" "ব্যাটারী" করিয়া চীৎকার করিলেন। ব্যাটারীর প্রয়োগ হইল। এদিকে ছেলেরা বলাবলি করিতেছে—

"ছেলেটী গেল ; সে দিন একটীকে মেরেচেন। আজ একে মারলেন।" দাদা কিছু বুঝিয়া উঠিতেছেন না। এদিক ওদিক তাকাইতেছেন। তারপর প্রায় আধ ঘণ্টা পর শ্বাস পড়িল—তারপর ক্রমে ক্রমে শ্বাস স্বাভাবিক অবস্থায় আসিল, তখন কাটাবাঁধা হইল। দাদা আমাকে পাল্কী করিয়া বাড়ী আনিলেন। কিছুদিন পর বেশ আরাম হইলাম।

তারপর বাড়ী আসিলাম। বাবা বলিলেন একজন গণক তোমাকে দেখিয়া গোয়ালপাড়ায় বলিয়াছিল এই বালক তিনটী ভাষা শিখিবে ; এবং একবার লোকে বলিবে মরিয়াছে কিন্তু মরিবে না। তা দেখিতেছি সত্যই হইল। সকলেই মনে করিলেন আমার পুনর্জ্জন্ম লাভ হইয়াছে।

আমার বোধ হয় ঐ গণক যখন এত জানিয়াছিল তখন ইহাও জানিয়াছিল যে "যখন লোকে মনে করিবে এ মরিবে না, তখন এ মরিবে।" হয় ত বাবার কাছে সে একথা বলে নাই। অকারণ অপ্রিয় কে বলে ; বিশেষতঃ যে অর্থ চায়।

শেষ বয়সে বাবা আমাকে বলিতেন—এক গণক বলিয়াছিল—তোমার অর্থ হইবে না ; ধর্ম্ম হইবে। আমি বলিতাম—কই, ধর্ম্মই বা হইল কৈ ? তাতে বলিতেন—নিরাশ হইতে নাই। ঈশ্বর কখন কাহাকে অনুগ্রহ করেন কে বলিতে পারেন ? এ কথাটী আমি অনেক সময় স্মরণ করিতাম। মনে করিতাম বাবার কথা কি মিথ্যা হইবে ?

রামপ্রসাদের একটী গান আমি বড় ভাল বাসিতাম। আমি যখন প্রাতঃস্নান করিতাম, গঙ্গার চরের উপরে গিয়া যখন দেখিতাম, সহর হইতে দূরে আসিয়াছি, আমি গাইতাম—

আমায় ছুয়োনারে শমন আমার জাত গিয়েছে
যে দিন কৃপাময়ী আমায় কৃপা করেছে ॥

মনে করিতাম মানুষের জীবনে কি এক দিনই উপস্থিত হয় যখন ব্রহ্ম হইতে পিপীলিকা পর্য্যন্ত যে মরণত্রাসে ব্যাকুল, সে কালভয় আর থাকে না। মানুষ মানুষ হতে খারিজ হইয়া যায়। "দেহাভিমানো হি মৃতিঃ"; দেহাভিমানই মরণ। দেহাভিমান গেলে আর মরণভয়ের দাঁড়াইবার জায়গা কোথায় ?

আমি ব্রহ্মপুরীতে প্রবেশ করিতে পারি নাই। কিন্তু মা আমার হৃদয়ে জাগিয়াছিলেন, আমি জ্যোতিরূপিনীকে দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিয়াছি। মার দর্শন বিফল হয় না। না চাহিলেও তাঁরা বর দেন। তাই মা বরাভয়দায়িনী। আব্রহ্ম পিপীলিকা মরণত্রাসে ব্যাকুল। মার কৃপায় আমি নির্ভয়।

আমাকে Fourth year (চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণি) এর একটী ছেলে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল—Sir (মাষ্টার মশায়) আপনার মনে এখন ভয় হয় না ? আশ্চর্য্য হইবার কথাই বটে ; আমি নিজেই আশ্চর্য্য হই ; সেবারে মরণভয়ে পাগলের মত হই। Brain power (মস্তিষ্কের শক্তি) হয়। মধু বলিয়াছিল (এখন মনে পড়ে) মন্ত্র "দিলিউ হয়, দিয়েও এবারে বড় ফল দেখি না। তয় একটু পরিশ্রম কর্‌লি ভয়ডা ঢুকুডা কম হতো"। মাতৃদর্শনের কত সুফল ! অবিদ্যা পার না হইলেও মৃত্যু ভয় থাকে না।

৮।৮।০৮

এখন আর দেবীমূর্ত্তি স্বপ্নে দেখি না। এখন জ্যোতিই দেখি। সেদিন ভোরে দেখি কতকগুলি ইট বিশৃঙ্খলায় সাজান ; তার মধ্যদিয়া

এক অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ উজ্জ্বল জ্যোতি বাহির হইতেছে। চোক মেলিয়া দেখি ভোর হইয়াছে।

এ মারই রূপ। ইটগুলি এ দগ্ধদেহ। আর তার মধ্যে অধিষ্ঠিত ঐ দিব্য জ্যোতি। আজ অগ্নিরূপে মাকে স্বপ্নে দেখিলাম। এখন ঐ রূপ ধ্যেয়। এবং "মা" নামই আমার মন্ত্র। এ জীবনে এইটুকু অগ্রসর হইলাম। তা মন্দ কি? মা যেটুকু অনুগ্রহ করেন সেই জীবের বহুভাগ্য, বহুলাভ। কমলাকান্ত বলেছেন,—

জান নারে মন, পরম কারণ
শ্যামা কভু মেয়ে নয়।
সে যে মেঘের বরণ করিয়া ধারণ
কখন কখন পুরুষ হয়॥
যেরূপে যে জন করয়ে ভজন
সেরূপে তাহার হৃদয়ে রয়।
কমলা কান্তের হৃদি সরোরুহে
কমল মাঝে কমল উদয় হয়॥

সকলের বুঝি তা হয় না। আমি ত স্থূলরূপ মুরলীধর মূর্ত্তি ভজিতাম কিন্তু এখন জ্যোতিরূপ দেখি। যাই ভাবি না কেন, যাই বলি না কেন, মা প্রাণের পিপাসা বুঝেন। বশিষ্ঠের এ গান আমার মনে যেমন জাগিত তেমন আর কিছুই নয়—

গূঢ়ং জ্যোতিঃ পিতরো অন্ববিন্দন্
সত্যমন্ত্রাঃ অজনয়ন্ উষাসম্॥

পিতৃগণ গূঢ় জ্যোতি লাভ করিয়াছিলেন। সত্য প্রার্থনা করিয়া তাঁহারা উষা জন্মাইয়াছিলেন। বৃহদারণ্যকের যাজ্ঞবল্ক্যের কথাও সততই মনে জাগিত — অন্তর্জ্যোতিরেষ পুরুষঃ। এই পুরুষ

অন্তর্জ্যোতি। আত্মা জ্ঞানজ্যোতি। তাই যেখানে যা রাখিয়াছে অন্ধকারেও তাহা হাত দিয়া পায়। এ দীপ জীবের অন্তরেই জ্বলিতেছে। যার সোপাধিক জ্যোতি এমন, নিরুপাধিক না জানি কতই প্রাণতর্পণ।

১ লা ভাদ্র, সোমবার।

কাল স্বপ্ন দেখিলাম একটা রেলওয়ে ট্রেন খুব বেগে যাইতেছে। একখানা গাড়ীর ছাদের উপর একটা লম্বা বাঁশ বাহির করা আছে। বাঁশটী গাড়ীর সঙ্গে বেশ আঁটা আছে। বাঁশের আগায় একখানা লোহার পাত ও তার উপর একখানা চামড়া (Strap)। বাহির পীঠে চামড়া, ভিতর পীঠে লোহার পাত—পাতে কাপড়ের গাঁইট বাঁধা থাকে। আমি ঐ লোহার পাতের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছি। চামড়াটা যেন ছিঁড়ে গেল। আমি ডান হাত দিয়া ছেঁড়াস্থান মুঠার মধ্যে ধরিয়া রহিলাম। মনে মনে ভাবিতেছি—এরূপে আর কতক্ষণ থাকিব। পড়িতেই হইবে। লোহার পাতটীও মরিচাধরা—জীর্ণ। দূরে তাকাইলাম—ষ্টেসন নিকটে দেখিলাম না। "থাকি যতক্ষণ পারি" এইভাবে ধ'রে আছি। গাড়ী খুব বেগে চলিতেছে। এমন সময় জাগিলাম।

এর অর্থ—এখন কায ছাড়। কোথা তুমি এখন সর্ব্বদা আমাকে স্মরণ করিবে, তা না তুমি নানা কায করিতেছ। মরিচাধরা লোহার পাত—কখন ভাঙ্‌বে টেরও পাবে না। এইবেলা কায কর, যাতে শেষে স্মরণ হয়। আর একটা দেখ্‌চি, সেটা বলিব না। বোধ হয় নরক আছে। জিজ্ঞাস্ (যীশু) যেমন বলে—জগতের জন্য নিজের প্রাণ দিয়াছিলেন. এও সেই রকম আমার নরক কাটিয়া যাইতেছে। মা মা দয়াময়ী, জীবের জন্য মা কি না করেন! মা ত কৃপা।

যে তাঁর কৃপায় ডুবে থাকে সেই তাঁকে মা বলে। ঈশ্বরের গায় মা বাপ কি প্রভু লেখা থাকে না।

আমি অনেক দিন হতে ছাড়্‌তে প্রস্তুত। তুমিই ঘটাইতেছ না। এখন সাধকদের কোন অবস্থার সঙ্গেই আমার অবস্থা মিলে না। তাঁদের গান আর গাই না; একটী গান গাই—

মন আমার সচেতনে থেক, মা মা বলে ডেক
এ দেহ ত্যজিবে যবে।
মায়ের নাম লইতে অবশ হয়োনা ও মন রসনা।
যা হবার তাই হবে॥

আমি তোমার দয়ায় ডুবে আছি। আমি জানি যে আমি পড়িয়া মরিব না। তুমি আমাকে কোলে করিয়া আছ, আমি কোথায় পড়িব?

"আমি দুবাহু পশারি,
চরণ তলে পড়ি,
মা মা বলি প্রাণ ত্যজিব।"

দেহত্যাগ *

বিগত ৭ই কার্ত্তিক পণ্ডিত মহাশয় আনন্দের সহিত আনন্দময় মহাধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। তাঁহার দেহত্যাগের সংবাদ যাত্রাপুর গ্রামের প্রতিষ্ঠাবান্ মুসলমান্ ও হিন্দু-গণের পত্রে † জানিতে পারিয়াছিলাম। গ্রামান্তর হইতেও সংবাদ আসিয়াছিল। তন্মধ্যে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের পত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"৬ই কার্ত্তিক, ত্রয়োদশী। দাদা অতি প্রত্যূষে আমার ঘরে আসিয়া ডাকিলেন—'তোমরা উঠ; আমি এই ঘরে বসিব। এ ঘরের জিনিস পত্র বাহির কর।' আমরা তৎক্ষণাৎ খাট, চৌকি ও জিনিসপত্র বাহির করিয়া দিলাম। দাদা স্নান করিয়া তিন হাত মাত্র একখানি কাপড় পরিয়া, তাঁহার গায়ের এণ্ডিখানা ভাঁজ করিয়া তাহার উপর ঐ ঘরে উত্তরমুখ হইয়া আসন করিয়া বসিলেন। সাম্‌নে একখানি কালীমূর্ত্তি ও পিতৃদেবের ফটো। তাঁহার নিকট গোলমাল করিতে নিষেধ করিলেন।

বেলা ১২ টার সময় আমাকে একখানা কাগজে লিখিলেন—'অহং-কার মেথর; অবিদ্যা মেথরাণী; বিষয় গু। * * * * এ এক সিদ্ধ গুরু ভিন্ন বুঝে বা বুঝায় কাহার সাধ্য!' আজ সারাদিন দাদা অনাহারে ছিলেন; বেলা তিনটার সময় বাহির হইলেন; বলিলেন—"স্পিরিট্‌রা (অবিদ্যারূপ ভূতগণ) অতি মিহিসুরে সুন্দর বাজায় ও

---

* গ্রন্থের এই অংশ পণ্ডিত মহাশয়ের লিখিত নয়; জীবন-যজ্ঞ সমাপ্তিহেতু ইহা সংযোজিত হইল।

† শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায়, বি, এ, মহাশয়ের নামে এই সকল পত্র আসিয়াছিল।

গান করে।' সন্ধ্যার সময় আলো জালিয়া দেওয়া হয়। তার পর কান টুকুরী পোকার উপদ্রবে মশারি টানাইয়া দেওয়া হয়; কিন্তু তাহাতেও অসুবিধা হওয়ায় বাহিরের ঘরে যান। * * * * পরদিন (৭ই কার্ত্তিক) বেলা ৯টার পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখিতে নিষেধ করেন।

৬টা ১ মিনিটে মৃত্যু। *

৯টার পর গিয়া দেখি তাহার দেহে প্রাণ নাই। তৎপর তাঁহার পূর্ব্বাভিমত অনুসারে সমাধি দিবার জন্য গর্ত্ত করাইলাম; কিন্তু কয়েকটী ভদ্রলোকের তীব্র প্রতিবাদের জন্য সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইল। শেষে তাঁহার কাগজ পত্র খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিতে পাইলাম—একস্থানে লেখা আছে—'দাহন করিতে হইবে।'

অতঃপর তাঁহার দেবদেহ পদ্মার তীরে লইয়া গিয়া অনন্তের ধূলিকণায় মিশাইয়া রাখিয়া আসিলাম; অগ্নিসংযোগ করিবার সময় দেখি তাঁহার মস্তকে (যাহাকে ব্রহ্মরন্ধ্র বলে) একটী সাদা প্রশস্ত দাগ ও সেই স্থানে হাড় ফাটা। অগ্নিসংযোগের পর তাহা দিয়া রক্ত নির্গত হইতে থাকিল।"

জীবনযজ্ঞ সমাপ্ত হইল। পার্থিব জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হইল; কিন্তু সে দেবদেহস্থ অন্তর্শক্তির বিমলপ্রতিভা কে বিস্মৃত হইবেন? মহাপুরুষগণ যেখানেই থাকুন, তাঁহাদের শক্তি আশীর্ব্বাদার্থী প্রিয়-জনকে সর্ব্বাবস্থায় সঞ্জীবিত রাখিবে।

* এক টুকরা কাগজে লেখা ছিল।

এই গ্রন্থ হইতে যে অর্থাগম হইবে, তাহা লোকহিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইবে।

(বাঁধান) প্রায় তিনশত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

মূল্য—একটাকা বার আনা।

প্রাপ্তি স্থান ঃ—চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি এণ্ড্ কোং
১৫ কলেজস্কয়ার, কলিকাতা।

সরকার ব্রাদার্স, জন্‌সন্ রোড্, ঢাকা।

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রসুন্দর মজুমদার, জমিদার,
ঘোড়ামারা পোঃ, রাজসাহী।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গোস্বামী, কবিরাজ,
পাবনা বাজার, পাবনা।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মৈত্র বি, এল,
পোঃ, ইংরেজবাজার, মালদহ।

মধুকৃপার জন্য কলিকাতা, পাবনা, রাজসাহী, রংপুর প্রভৃতি স্থান হইতে বহু পত্র পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে দুই একটী কথা উদ্ধৃত করি ঃ—

রংপুর জেলা হইতে কোন সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলা লিখিয়াছেন—"মধু-কৃপার" জন্য পথের দিকে তাকাইয়া আছি ; কবে শেষ হবে? শেষ হলেই আমার জন্য তিন খানা পাঠানের কথা যেন মনে থাকে।"

দেবীযুদ্ধ ও অন্যান্য গ্রন্থপ্রণেতা, সুপণ্ডিত স্বদেশ প্রেমিক, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বি,এ মহাশয় লিখিয়াছেন—"স্বর্গীয় কুঞ্জবাবুর গ্রন্থের ভূমিকা লিখিবার অধিকার পাইয়া আপনাকে সৌভাগ্যশালী মনে করিলাম।"

A Bengalee graduate of position writes from Madras—"I am anxiously watching for the day when "Madhu-kripa" will reach me."